# গীতার রহস্য

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# গীতার রহস্য

শ্রীরূপানুগবর জগদ্গুরু কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

**শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ**

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

**ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট**

মায়াপুর, কলিকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লন্ডন, লস এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৭৭ ৫,০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৭৮ ৩৫,০০০ কপি
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৮৩ ১০,০০০ কপি
চতুর্থ সংস্করণ ঃ ১৯৮৪ ২০,০০০ কপি
পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯৯২ ১৫,০০০ কপি
ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ ২০০০ ৫,০০০ কপি
সপ্তম সংস্করণ ঃ ২০০১ ৫,০০০ কপি
অষ্টম সংস্করণ ঃ ২০০৩ ৫,০০০ কপি
নবম সংস্করণ ঃ ২০০৪ ৫,০০০ কপি



মুদ্রণ ঃ
শ্রীমায়াপুর চন্দ্র প্রেস
বৃহৎমৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
© (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫
E-mail: shyamrup@vsnl.net
Web: www.krishna.com

# সূচীপত্র

জ্ঞান কথা



মুনিগণের মতিভ্রম





# প্রস্তাবনা

মানুষ হচ্ছে ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব। তাই, মানবজীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে—কর্তব্য আছে, সেটি হচ্ছে *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা;* অর্থাৎ আমি কে? আমি কোথা থেকে এলাম? আমি কেন এখানে কষ্ট পাচ্ছি? মানবমনে যতক্ষণ না এই *ব্রহ্মজিজ্ঞাসার* উদয় হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে মানুষ বলে গণ্য করা চলে না।

মানবজীবন সুদুর্লভ এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই, এই জীবন পেয়েও যদি আমরা এর যথাযথ সদ্ব্যবহার না করি, এই জীবন পেয়েও যদি আমরা *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা* না করি, তা হলে এই সুদুর্লভ জীবনের বৃথা অপচয় করা হয়। এই সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—

*এমন দুর্লভ মানব-দেহ,*
*পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ,*
*এবে না ভজিলে যশোদা-সুত,*
*চরমে পড়িবে লাজে।*

এই দুর্লভ মানবজীবন যখন আমরা পেয়েছি, তখন আমাদের আর ভাবনা কি? কারণ, এই জীবনে আমাদের *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা* করা সম্ভব। এই *ব্রহ্মজিজ্ঞাসার* যথাযথ উত্তর লাভ করে আমরা যদি যশোদা- নন্দনের সেবা করি, তা হলে আমরা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি—ভব-মহাদাবাগ্নি নির্বাপণ করতে পারি এবং আমাদের পরমার্থ সাধন করতে পারি। কিন্তু তা যদি না করি, তবে আমাদের চরম লজ্জায় পড়তে হবে। মৃত্যুকালে যখন এই দেহটি ছেড়ে চলে যাবার সময় আসবে, তখন এই দুর্লভ মানবজীবনকে অবহেলায় অপচয় করার জন্য লজ্জায় ও দুঃখে আমাদের অন্তর ব্যথাতুর হয়ে উঠবে। কিন্তু তখন আর আমরা সেই হারিয়ে যাওয়া সম্পদ ফিরে পাব না। তাই যে বুদ্ধিমান, সে সময় থাকতে এই সম্পদের সদ্ব্যবহার করে নেয়। সে বুঝতে পারে যে, *ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই* হচ্ছে জীবনের

একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এই *ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার* যথাযথ উত্তর লাভের আশায় সে সদ্‌গুরুর শরণাগত হয় এবং গুরুদেব তখন তাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাগত হওয়ার জন্য *গীতার রহস্য* শিক্ষা দান করেন।

*গীতার* চরম উপদেশ হচ্ছে—

*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।*
*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥*

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" (*গীতা* ১৮/৬৬)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই *গীতার রহস্য* শিক্ষা দেবার জন্য এই জড় জগতে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে অবতরণ করেছিলেন। এই *গীতার রহস্য* কি? এই *গীতার রহস্য হচ্ছে* লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগতি। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে যখন কেউ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগত হন, তখন তিনি জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে প্রেমভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হন। এই প্রেমভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আমরা সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করতে পারি এবং আমরা আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারি। তখন আমাদের পরমার্থ সাধিত হয়—ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয়।

এই *গীতার রহস্য* শিক্ষা দেবার জন্যই শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালে নন্দোৎসবের দিন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব শ্রীগৌরমোহন দের সন্তানরূপে তাঁর জন্ম হয়। শৈশব অবস্থাতেই তাঁর মধ্যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির লক্ষণ দেখা যায় এবং ক্রমে ক্রমে তা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩ সালে তিনি মহাভাগবত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁরই আদেশ অনুসারে তিনি পাশ্চাত্য জগতে ভগবানের বাণী প্রচারের আয়োজন শুরু করেন এবং ইংরেজী ভাষায় বৈদিক শাস্ত্রের অনুবাদ, ইংরেজী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশাদি কার্য শুরু করেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেবের



মনোভিলাষ তাঁকে পূর্ণ করতেই হবে—পাশ্চাত্য জগতে ভগবানের বাণীর অমৃত বিতরণ করতে হবে—উদ্ধার করতে হবে লক্ষ-কোটি অধঃপতিত মানুষকে। তারপর ১৯৬৫ সালে তিনি আমেরিকায় গিয়ে কেবলমাত্র দশ বছরের মধ্যে সমস্ত বিশ্বকে ভগবৎ-প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করেন।

আপাতদৃষ্টিতে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর বিশ্বব্যাপী প্রচার শুরু করেছিলেন ১৯৬৫ সালে, ৭০ বছর বয়সে, কিন্তু তাঁর অতীত জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় যে, শৈশব থেকেই তিনি এই প্রচারের প্রস্তুতি করছিলেন। আমেরিকার এক সাংবাদিক তাঁকে এক সময় প্রশ্ন করেন, "আপনাকে তো আপনার গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পাশ্চাত্য দেশে ভগবানের বাণী প্রচার করার আদেশ দেন ১৯৩৩ সালে। আপনি এত দেরিতে সেই প্রচারকার্য শুরু করলেন কেন?" তার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, "সময় দিয়ে কি আসে যায়, আসল কথা হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে কাজটি সম্পন্ন করা।"

সুষ্ঠুভাবে যে তিনি তাঁর কাজ সম্পন্ন করেছেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই। দশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে, পৃথিবীর যত নগরাদি-গ্রামে তিনি যেভাবে ভগবানের বাণী প্রচার করলেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে কেবল বিরলই নয়, তা মানুষের কল্পনারও অতীত। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ১২৫ টি মন্দির গড়ে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে হাজার হাজার মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। ভগবানের বাণী সমন্বিত লক্ষ লক্ষ বই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে, বিতরণ হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে ভক্তিলতার বীজ রোপিত হচ্ছে। ভগবদ্ভক্তির যে বন্যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত প্লাবিত করেছিলেন, সেই বন্যা আজ সারা জগৎকে প্লাবিত করছে। হাজার হাজার মানুষ শ্রীল প্রভুপাদের অভয়চরণারবিন্দে অভয় আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তারাই হচ্ছে তাঁর সুযোগ্য শিষ্যবর্গ। যারা একদিন ছিল ব্যভিচারী, উচ্ছৃঙ্খল, ভগবৎ-বিদ্বেষী নাস্তিক, তারাই আজ সব রকম মাদকদ্রব্য বর্জন করে, আমিষ আহার পরিত্যাগ করে, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করে, কায়মনোবাক্যে ভগবানের ঐকান্তিক সেবা করে চলেছে। পরশমণির ছোঁয়ায় যেমন লোহা সোনা হয়ে যায়, পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদের ছোঁয়ায় তেমনই পৃথিবীর সমস্ত অধঃপতিত

মানুষেরা মহাত্মাতে পরিণত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগাই আর মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন তাদের পাপপঙ্কিল জীবন থেকে আর শ্রীল প্রভুপাদ উদ্ধার করলেন সারা পৃথিবীর অসংখ্য জগাই-মাধাইকে। একলব্যের মতো নিষ্ঠার সঙ্গে আজ তারা সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের—শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা করে চলেছে।

শ্রীল প্রভুপাদের বিরচিত *ভগবানের কথা, ভক্তি কথা, জ্ঞান কথা, মুনিগণের মতিভ্রম* ও *বুদ্ধিযোগ* নিয়ে *গীতার রহস্য* পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। এই প্রবন্ধগুলি ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫ সালের গৌড়ীয় পত্রিকাতে বিভিন্ন সময়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। *ভগবানের কথা, জ্ঞান কথা* ও *ভক্তি কথা* পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ ও ৭৮ সালে। *বুদ্ধিযোগ* প্রবন্ধটি শ্রীল প্রভুপাদ লেখেন ১৯৪৭ সালে, কিন্তু এই প্রবন্ধটি তিনি প্রকাশ করেননি। কিছুদিন আগে শ্রীবৃন্দাবন ধামে এটি আমাদের হস্তগত হয়।

*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* আর এক নাম *গীতোপনিষদ্*। বৈদিক শাস্ত্রের সারমর্ম সমন্বিত এই *গীতোপনিষদই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপনিষদ্*। *গীতার* তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, গীতা যেন একটি গাভী, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন গোপবালক, যিনি সেই গাভীকে দোহন করছেন; তার দুধ হচ্ছে *বেদের* সারকথা, আর অর্জুন হচ্ছেন গোবৎস। মহাত্মারা সেই দুগ্ধ পান করেন। *গীতার* অন্তর্নিহিত তত্ত্বকেই সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে আমাদের বোধগম্য করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ *ভগবানের কথা, ভক্তি কথা, জ্ঞান কথা,* আর *বুদ্ধিযোগের* মাধ্যমে গীতারূপ গাভীর দুগ্ধ বিতরণ করেছেন। এই অমৃতের স্বাদ লাভ করলে অচিরেই জড় বিষয়-বাসনার অনর্থ নিবৃত্তি হবে এবং অন্তরে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হবে। আর, এই অমৃতের স্বাদ লাভ করার ফলেই আজ সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গোলোক বৃন্দাবনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

—ভক্তিচারু স্বামী
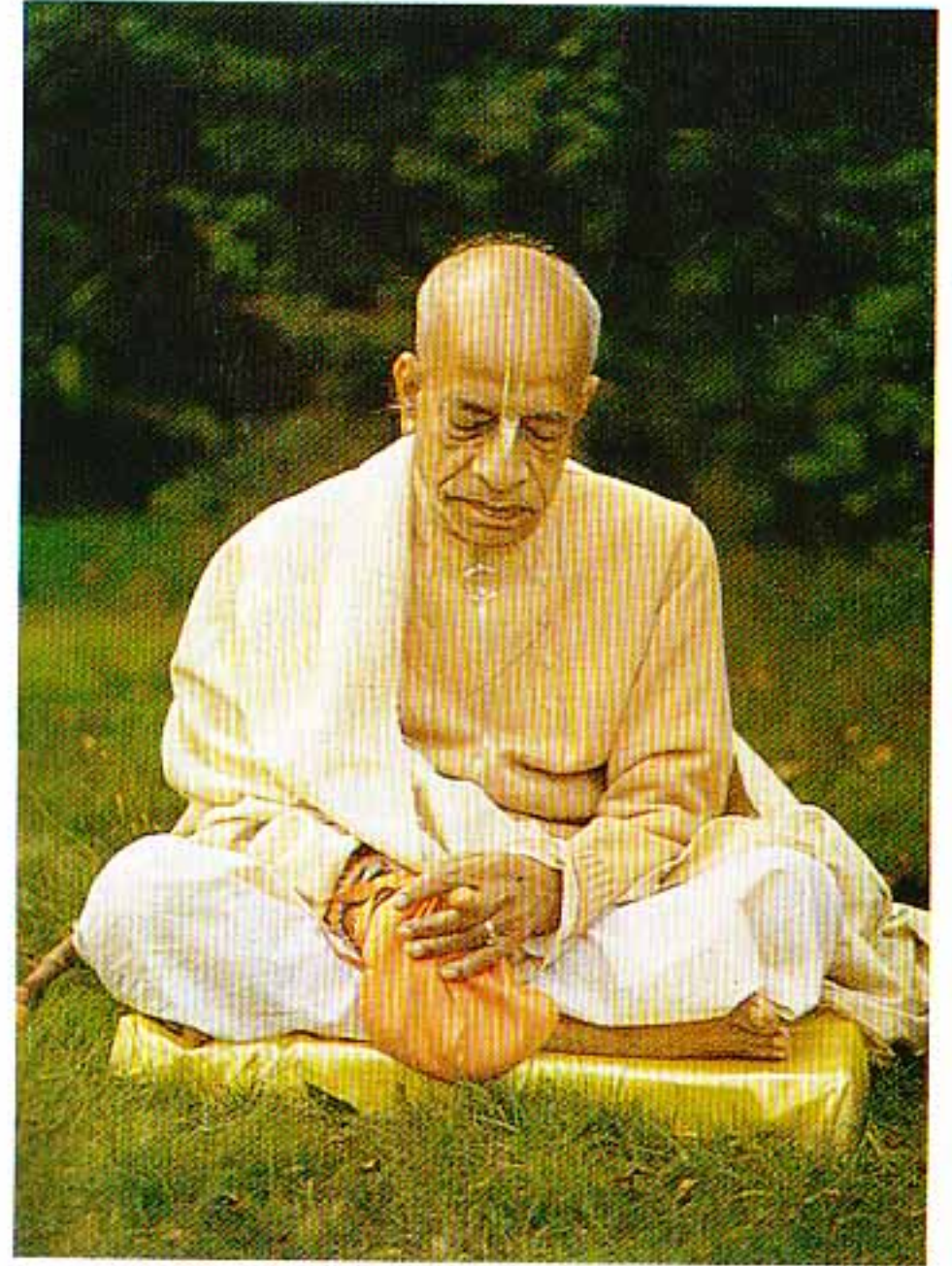
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

প্রতিনিয়ত দেহের পরিবর্তন হলেও আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না,
অবশেষে দেহের মৃত্যু হলেও আত্মা আরেকটি নতুন দেহ ধারণ করে।

অর্জুন হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের সখ্য রসের ভক্ত, তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের
সারথিরূপে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন।

ব্রহ্মার দিবা অবসানে ভগবানের শেষশয্যারূপী সঙ্কর্ষণের অসংখ্য মুখ থেকে এক মহা অগ্নির উদ্‌গীরণের ফলে ত্রিজগতের প্রলয় সাধিত হয়।

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব
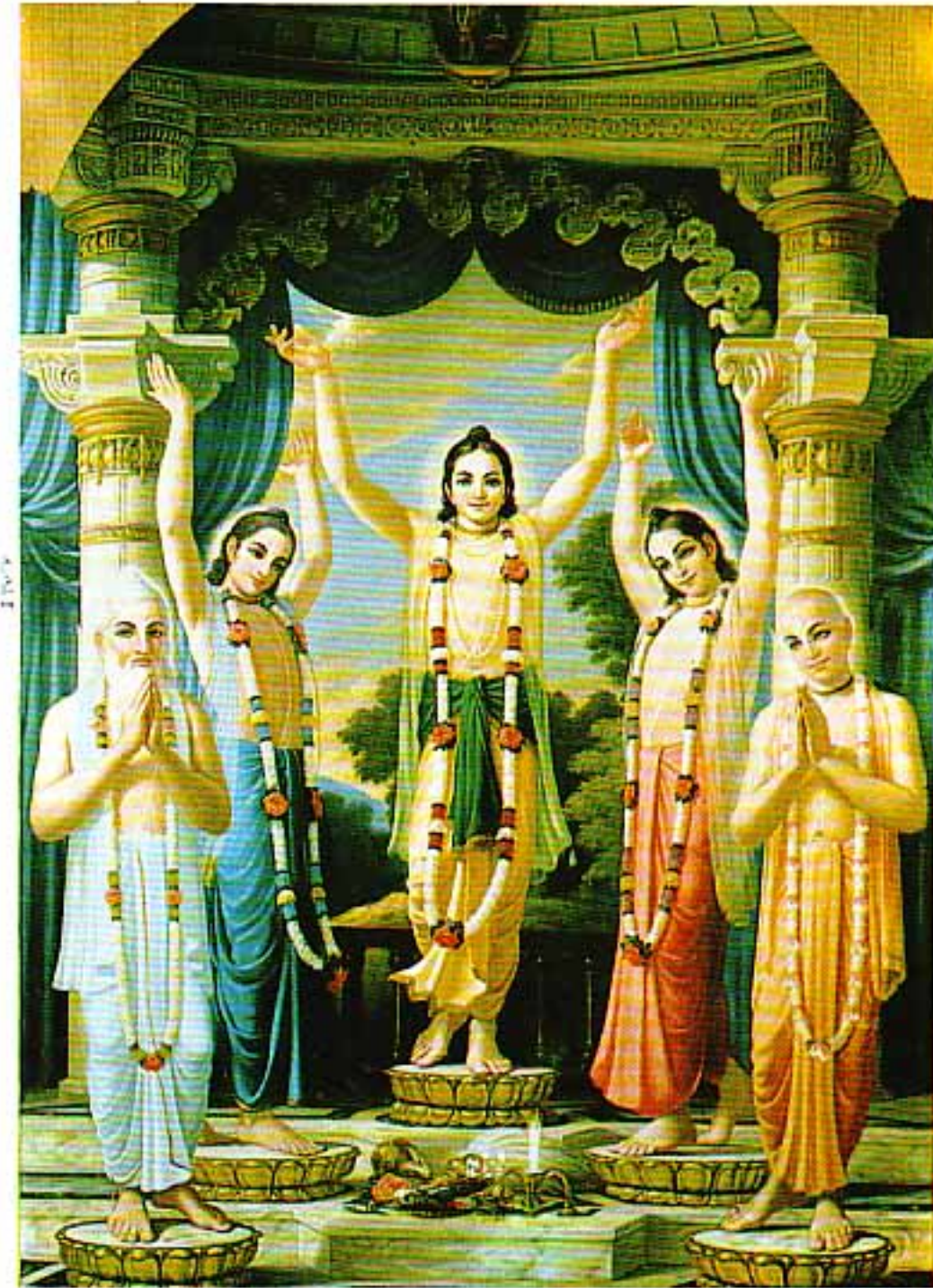
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।

ইস্‌কন শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের শ্রীশ্রীরাধামাধব শ্রীবিগ্রহ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ষড়্‌ভুজরূপে দেখালেন, তিনিই ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ এবং কলিতে শ্রীগৌরহরি।

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন ।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ॥

# ভগবানের কথা

# এই জগৎ দুঃখময়

সেদিন এলাহাবাদ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় বড়ই দুঃখ করিয়া তাঁহার সম্পাদকীয়ের প্রধান শীর্ষে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, যথা—"The national week has begun. The memories of 'Jallianwallah-Bagh' and political serfdom no longer trouble us. But our trouble is far from being at end. In the dispensation of providence mankind cannot have any rest. If one kind of trouble goes, another quickly follows. India, politically free, is faced with difficulties which are no less serious than those troubled under a foreign rule......"

কথাগুলির ভাবার্থ এই যে, "জাতীয় সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের সেই জালিয়ানওয়ালা-বাগের স্মৃতি, পরাধীনতার কথা আর কষ্ট দেয় না। কিন্তু আমাদের কষ্টের কিছুই লাঘব হয় নাই। ভগবানের বিধিতে এমনই নিয়ম যে মানুষ কোনদিনই শান্তিতে থাকিবে না। যদি এক প্রকার দুঃখ অপগত হয় তাহা হইলে অন্য প্রকার দুঃখ হাজির হয়। ভারতবর্ষ যদিও রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে স্বাধীন হইয়াছে, তত্রাচ অন্যপ্রকার বহু দুঃখের সহিত মুখোমুখি হইয়াছে এবং সেই দুঃখগুলি তাহার পরাধীন থাকাকাল অবস্থার দুঃখ অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।"

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর পরাধীনতার খতিয়ান খুলিয়া দেখিলে আমরা শাস্ত্রচক্ষুদ্বারা ইহাই দেখিতে পাই যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও





কলি এই চারি যুগের মোট বয়স ৪৩,২০,০০০ সৌর বৎসর। তাহার মধ্যে কলি যুগের বয়স ৪,৩২,০০০ বৎসর। কলি যুগ আরম্ভ হইয়াছে মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্য সময় হইতে অর্থাৎ কিছু বেশী ৫০০০ বৎসর। সেই ৫০০০ বৎসরের মধ্যেই প্রায় ১০০০ বৎসর পরিমাণ অর্থাৎ মহম্মদ ঘোরীর (১০৫০ খৃঃ) সময় হইতেই ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়াছে ধরিয়া লইলেও শাস্ত্রীয় হিসাবে ভারতবর্ষের রাজাই মহারাজ পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৭,৭২,০০০ বৎসর ধরিয়া সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়া আসিয়াছেন। সে তুলনায় ভারতবর্ষ যে মাত্র ১০০০ বৎসর তথাকথিত পরাধীন ছিল বলিয়া বিশেষ দুঃখ করিবার আছে তাহা আমাদের মনীষীগণ চিন্তা করিতেন না বা করেন না। রাজনৈতিক স্বাধীনতার বা পরাধীনতার কতটুকু মূল্য তাহা ভারতবর্ষের মনীষীগণ জানিতেন এবং ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ মহারাজ পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত কি কারণে সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাহা ২০০ বা ৫০০ বৎসরের জন্য নহে, পরন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া, তাহারও কারণ রাজনৈতিক নহে।

ভারতবর্ষের মনীষীগণ জানিতেন আমরা যে ত্রিতাপ যন্ত্রণার মধ্যে আছি তাহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা পরাধীনতার দ্বারা অপনোদন করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরাধীনতা লইয়া যে মহাভারতের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা তাৎকালিক এবং সেই যুদ্ধ আঠার দিনেই শেষ হইয়াছিল। এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবিক মানুষের সুখ দুঃখ কি এবং তাহা অপনোদন কি ভাবে সম্ভবপর হইতে পারে তাহাও যুদ্ধক্ষেত্রে *ভগবদ্গীতার* আলোচনায় সমাধান করা হইয়াছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় দুঃখ করিয়া যে লিখিয়াছেন—একটি দুঃখের পর অপর একটি দুঃখ আসিয়া হাজির হয়—তাহা ঐ *গীতা* শাস্ত্রে বহুদিন পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। যথা *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।* ভগবানের যে দৈবী মায়া

# মুনিগণের মতিভ্রম

তাহা সত্ত্ব-রজ-তম-রূপা ত্রিগুণময়ী এবং তাহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর ব্যাপার। এই দৈবী মায়াকে আধুনিক ভাষায় nature's law (প্রকৃতির নিয়ম) বলা যাইতে পারে। এবং সেই nature's law (প্রকৃতির নিয়ম) এতই দুরূহ যে তাহা আমরা খবরের কাগজে লেখালেখি করিয়া বড় বড় সভাসমিতিতে প্রস্তাবসমূহ পাশ করিয়া কোন দিনই অতিক্রম করিতে পারিব না। সেই দৈবী মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য (বা nature's law overcome করিবার জন্য) আমরা যতই বৈজ্ঞানিক গবেষণা করি না কেন সেগুলি সবই ঐ দৈবী মায়ার অধীন তত্ত্ব। এবং সেই জন্যই আমরা জড় বিজ্ঞান বলে দৈবী মায়াকে বশ করিতে গিয়া শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া ফেলি। আমরা বিজ্ঞানবলে জগতের দুঃখ তাড়াইয়া সুখ আনিবার পরিকল্পনায় এখন আণবিক যুগে (Atomic Age) উপস্থিত হইয়াছি। আণবিক প্রক্রিয়ায় জগতের যে সর্বনাশ হইতে পারে তাহার ভবিষ্যৎ দেখিয়া পাশ্চাত্য-দেশীয় মনীষীগণ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ স্তোক বাক্য দিয়া বলিতেছেন যে, আমরা আণবিক শক্তিকে জগতের সুখের জন্য ব্যবহার করিব। কিন্তু ইহাও আর একটি দৈবী মায়ার প্রহেলিকা। দৈবী মায়ার আবরণাত্মিকা এবং বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিদ্বয়কে অতিক্রম করা আমাদের সাধ্য নহে। যতই আমরা দৈবী মায়াকে নিজের কবলিত করিব বলিয়া মহিষাসুরের বিক্রম দেখাইতেছি, ততই সেই দৈবী মায়া আমাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া রজ গুণের দ্বারা বিচলিত এবং ত্রিতাপ যন্ত্রণাবিদ্ধ করিয়া কালসর্পের অধীন করিয়া ফেলিতেছেন। এই প্রকার মহিষাসুরের সহিত দৈবী মায়ার যুদ্ধ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাই বুঝিতে না পারিয়া আমরা দুঃখ করিতেছি যে 'In the dispensation of providence, mankind cannot have any rest.' অর্থাৎ ভগবানের বিধিতে এমনই নিয়ম যে মানব কোনও প্রকারে শান্তি পাইতে পারে না।



মহিষাসুরের গণ-সকল দৈবী মায়া কর্ত্তৃক বহুপ্রকারে বিপর্য্যস্ত হইয়াও বুঝিতে পারে না যে কিভাবে mankind cannot have any rest—(মনুষ্য জাতি শান্তি লাভ করিতে পারে না।) *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া* এই কথা বলিয়া মহিষাসুরগণকে সাবধান করিয়া তাহার পরের পঙক্তিতেই কিভাবে ঐ দৈবী মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহাও বলা আছে। যথা—*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*। অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানের পাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকার করেন তাঁহারাই এই প্রকার দৈবী মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ পান।

# দুঃখের কারণ

মহিষাসুর বিদ্যা, বুদ্ধি, তপস্যা, ধন, জন, জন্ম প্রভৃতি সকল বিষয়েই যেমন পারঙ্গম ছিলেন, সেই প্রকার তাঁহার আধুনিক বংশধরগণও বিদ্যা, বুদ্ধি, তপস্যা, ধন, জন ইত্যাদি বিষয়ে অধিকারী বড় কম নহে। তাঁহাদের দৈবী মায়াকে ভোগ করিবার উপায়-উদ্ভাবনী-শক্তি বিদ্যা, বুদ্ধি ও তপস্যা বড় কম নহে। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া বহু বুদ্ধি, তপস্যা এবং ধন-জনের অপব্যবহার করেন কিন্তু ফলে যাহা আবিষ্কার করেন তাহাতে জগতে সুখের নামে দুঃখের সৃষ্টি করে। ইহাই দৈবীমায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির প্রভাব এবং কালসর্পের বিষোদ্গার। এই সকল দুষ্কার্য্যের দ্বারা জগতে যে মহা অনিষ্ট সাধিত হয় তদ্দ্বারা ঐ সকল দৈবীমায়া-বিমোহিত বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় যে মহাপাপ করে তাহার ফলে তাহারা চিরদিনই মূঢ় থাকিয়া যায় এবং সেই মূঢ়তা নিবন্ধন আর ভগবানে প্রপত্তি করিতে পারে না।

*ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।*
*মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥*

(গীতা ৭/১৫)

অর্থাৎ—দুষ্কার্য্যপরায়ণ নরাধম বোকা লোকগুলি দৈবীমায়া কর্ত্তৃক হৃতজ্ঞান হইয়া আসুরী ভাবকে আশ্রয় করিয়া ভগবানে কখনই প্রপত্তি করে না। এই আসুরী ভাবান্বিত লোকগুলি কিরূপ তাহা শ্রীভগবদ্গীতায় এইভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। যথা—

*প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।*
*ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥*





*অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।*
*অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥*
*এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।*
*প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥*
*কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ ।*
*মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥*
*চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ।*
*কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥*
*আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ।*
*ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥*
*ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।*
*ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥*
*অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।*
*ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥*
*আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।*
*যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥*
*অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।*
*প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥*
*আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।*
*যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥*
*অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।*
*মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥*
*তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।*
*ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥*
*আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনিজন্মনি ।*
*মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥*

(গীতা ১৬/৭-২০)

গীতায় উক্ত শ্লোকসমূহে (*গীতা* ১৬/৭-২০) আসুরিক বৃত্তির প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত। দুই প্রকারের লোক চিরকালই জগতে আছে। এক প্রকারের লোক দেবতা আর এক প্রকারের লোক তদ্বিপরীত অর্থাৎ অসুর। পূর্ব্বে রাবণের মত ২/১ টি অসুর ছিল যাহারা সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাকে হরণ করিয়া ধ্বংস হইত। এখন সেই রাবণের গোষ্ঠী লক্ষ-কোটি গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সকলেই সীতাহরণ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা লাগাইয়া দিয়াছে। ফলে অসুরগণের মধ্যে বহুমুখী আদর্শ আসিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের শত্রু করিয়া তুলিয়াছে। সকলেই ভাবিতেছে আমি চালাকি করিয়া সীতাকে ভোগ করিয়া লইব। কিন্তু ফলে সকলেই রাবণের ন্যায় সবংশে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। জগতে কত বড় বড় হিটলারাদি মহা-মহাবলীয়ানেরই জন্ম হইল, কিন্তু ভগবানের লক্ষ্মী সীতাকে ভোগ করিবার আশায় প্রলুব্ধ হইয়া সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। এই প্রকার অন্যায় ভোগ প্রবৃত্তিই 'In the dispensation of providence, mankind cannot have any rest'-এর মূলীভূত কারণ।

অসুরগণ কোন্ বিষয়ে প্রবৃত্তি করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারে না এবং কোন্ বিষয়ে নিবৃত্তি করিতে হয় তাহাও জানে না। রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিচার করিতে হয়। সুতরাং আসুরিক ভাবাপন্ন mankind-এর রাবণ-প্রণোদিত সন্ন্যাস-রোগ নিবৃত্তি করিতে হইলে তাহার প্রবৃত্তিটি ফিরাইবার চেষ্টা করা আবশ্যক। রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে যেমন তাহার পারিপার্শ্বিক শুচি ও আচার প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিতে হয়, সেই প্রকার আসুরিক স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে হইলে মনুষ্য জাতিকে শুচি, আচার ও সত্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। "যত মত তত পথ" বলিয়া লোক-বঞ্চনা করিয়া শুচি, অশুচি, আচারবান্ ও দুরাচার অথবা সত্যাশ্রয়ী, মিথ্যাশ্রয়ী প্রভৃতি সকলকেই এক করিয়া ফেলিলে কোনদিনই রোগের চিকিৎসা সম্ভব হইবে না।

# ভগবান-বিমুখ অসুর

অসত্যাশ্রয়ী অসুরগণ এতই হতজ্ঞান যে তাহারা প্রতিমুহূর্ত্তেই শরীরের অসত্যত্ব উপলব্ধি করিয়াও সেই শরীরকেই সকল কার্য্যের কেন্দ্র করিয়াছে। তাহারা বুঝে না যে 'শরীরী'ই সত্য বস্তু আর 'শরীর'ই অসত্য বস্তু। তাহারা বিবর্ত্তবাদে মোহিত হইয়া স্থির করিয়াছে যে, এই জগতের বৃহত্তম শরীরেরও কোন 'শরীরী' নাই। তাহারা নিজ শরীরে বিবর্ত্ত করিয়া যেমন শরীরী-রূপ আত্মার বা চেতনের কোনো সন্ধান রাখে না, সেই প্রকার মহৎ শরীর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরও যে কোন শরীরী আছে তাহা বুঝিতে পারে না। তাহারা নিজেকেও যেমন শরীর-সর্ব্বস্ব মনে করে সেই প্রকার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মহৎ শরীর দেখিয়াই প্রকৃতি-সর্ব্বস্ব মনে করে। কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে তাহারা nature বলিয়া সহজেই সমাধান করিতে চাহে। তাহাদের মধ্যে আর একটু উচ্চ স্তরের বুদ্ধিমান ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত অব্যক্ত বলিয়াই মামলা ডিস্‌মিস্ করিয়া দেন। কিন্তু এই সকল অব্যক্ত-ব্যক্ত প্রভৃতির সৃষ্টি হইতে বহুদূরে যে সনাতন ভাব বর্ত্তমান আছে তাহার সন্ধান করিতে অসুরগণ স্বাভাবিক ভাবেই অপারগ।

অসুরগণ এইভাবে নষ্টবুদ্ধি হইয়া দূরদৃষ্টির অভাবে বহু প্রকার জগতের অহিতকর উগ্রকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে। সেই সকল উগ্রকর্ম্মের ফলস্বরূপই আণবিক বিস্ফোরকের আবির্ভাব হইয়াছে। অসুরগণের বহুপ্রকার উগ্রকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা plan কোনদিনই জগতের হিত করিতে পারিবে না। পূর্ব্বকালে রাবণ মহাশয় যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে

বঞ্চনা করিয়া জনসাধারণের উপকারের জন্য স্বর্গের পাকা সিঁড়ি বাঁধিবার পরিকল্পনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন, সেইপ্রকার রাবণ-বংশধরগণও জনসাধারণের উপকার করিবার জন্য বহু প্রকার plan করিয়াছেন। একটি অসুরের plan কিন্তু অপর অসুরের plan-এর সহিত খাপ খায় না। কেহ বলেন আমার plan টি বড় চমৎকার সুতরাং আমাকেই তোমরা ভোট দাও। আবার বিপক্ষ কেহ বলেন যে তাঁহার planটি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল অতএব তাঁহাকেই ভোট দেওয়া উচিত। এই ভোটের যুগে কে কাহাকে ভোট দিবে এই বিষয়ে পরস্পর বিরোধ করায় সকল স্বর্গের সিঁড়িই অকালে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে দূরদৃষ্টিহীন নষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণের এই প্রকার বহু plan উদ্ভাবিত হইলেও কোনদিনই জগতের শান্তি আনিতে পারে না। সকল অসুরগণ কিন্তু ভগবানকে ফাঁকি দিয়া তাঁহার লক্ষ্মীকে ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বতঃ একমত।

প্রত্যেক অসুরেরই দম্ভ আছে যে তাঁহার চেয়ে বুদ্ধিমান ও মানী ব্যক্তি আর কেহই নাই। সুতরাং তিনি যে-সকল কামনাদি দ্বারা চালিত হইতেছেন তাহা সমস্তই লোকহিতকর। কিন্তু ফলে দেখা যায় যে, তাঁহার সমস্ত কামনাই মোহগ্রস্ত এবং অসৎ। কিন্তু সেই প্রকার অসদাগ্রহ করিয়াও অসুরগণ বহুপ্রকার ছলনা-চাতুর্য্য বিস্তার করিয়া প্রভাব বিস্তার করেন।

অশুচি-ব্রত অসত্যাশ্রয়ী অসুরগণের চিন্তার ধারা অপরিমেয়। তাহারা স্বকপোলকল্পিত নেতা সাজিয়া দেশের ও দশের কিভাবে উপকার হইবে তাহা চিন্তা করিতে করিতে বিব্রত হইয়া পড়েন। 'হাটের এত লোক কোথায় শয়ন করিবে' এই প্রকার চিন্তাধারা কালান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়। আমার ভোগ, আমার পুত্রের ভোগ, আমার পৌত্রের ভোগ, তস্য সন্তানের ভোগ, তস্য সন্তানস্য সন্তানের ভোগ, ইত্যাকার



ভোগের চিন্তা করিতে করিতে পৃথিবীর প্রলয়কাল পর্য্যন্ত কিভাবে ভোগের ব্যাপারটা সুদৃঢ় হইতে পারে তাহারই পর্য্যায়ক্রমে বহুমুখী 'ভোগ' বা 'বাদ' সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ভোগের পরিবর্ত্তে যখন দুঃখের অবতারণা হয় তখন সেই সকল অসুরগণ কাম-ভোগের জন্য জীবহিংসা প্রভৃতি সাধন করিয়া অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয় করে। অসীম কাম ভোগের জন্য কোটি কোটি টাকাও সঞ্চয় করিয়া তাহাদের আশা পরিতৃপ্ত হয় না। অন্যায়ভাবে যে যত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারঙ্গম সে তত বড় প্রধান হইয়া উঠে। শত শত আশাপাশের দ্বারা বদ্ধ কাম-ক্রোধপরায়ণ অসুরগণ সামান্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-মূলক শরীর-সর্ব্বস্ব কামোপভোগাদির জন্য অন্যায়ভাবে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া যেমন ক্ষান্ত নহে, অপরপক্ষে বিপক্ষ অসুরগণও সেই প্রকার আশাপাশের দ্বারা চালিত হইয়া ঐ সকল অন্যায়ভাবে সঞ্চিত অর্থগুলি পুনঃ অন্যায়ভাবে অপহরণ করিবার চেষ্টায়ও বড় কম দক্ষ নহে। সুতরাং এই প্রকার অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয়ের ব্যাপারে আসুরিক প্রতিযোগিতা কিভাবে মনুষ্য জাতির মঙ্গল আনয়ন করিতে পারিবে? অতএব 'In the dispensation of providence mankind cannot have any rest.'—এই কথার সমাধান অসুরগণ কর্ত্তৃক কখনই হইতে পারিবে না।

অসুরগণের সর্ব্বদাই চিন্তা—অদ্য ব্যাঙ্কে কত টাকা জমা বাড়াইতে পারিলাম। "অদ্য বাজারে ফট্‌কাবাজী করিয়া এত লাভ করিলাম, আগামী-কল্য এই এই জিনিসগুলির দর বাড়িলেই আবার এত লাভ হইবে। সুতরাং আমার Bank Balance এত ছিল এইবার এত হইল। এইভাবে অদূর ভবিষ্যতে আরও জমা বাড়িবে।"

আমার অমুক শত্রুটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপর শত্রুটি শীঘ্রই হত হইবে। সুতরাং শীঘ্রই আমি নিশ্চিন্ত হইব। এইভাবে শত্রু-হনন-কার্য্যে আমি বিশেষ পারদর্শী বলিয়া আমিই ভগবান্। ভগবানকে

আবার কোথায় খুঁজিতে হইবে? 'শত শত ভগবান্ ঘুরিছে সম্মুখে তোমার'। এই প্রকার আসুরিক বিচার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাহারা ভগবানের অমৃত কথা শুনিতে মোটেই রাজী নহে। তাহারা বলে ভগবান্ আবার কে? আমিই ত' ভগবান্। আমি যখন অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয় করিয়া জগৎকে ভোগ করিতে পারি তখন আমিই ত' ভগবান্ এবং আমিই ত' ভোগী, সুখী, বলবান্ এবং সিদ্ধ। যাহাদের বল নাই, অর্থ নাই, তাহারাই ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া আমাদের সম্মান করিবে। অন্য ভগবান্‌কে ডাকিবার আর কি প্রয়োজন আছে?

অসুরগণের ধারণা যে তাহাদের অপেক্ষা ধন-জনবান আর অন্য কেহ নাই। যক্ষাদির কাছে তাহার ধন সঞ্চিত থাকিবে এই প্রকার অজ্ঞান-বিমোহিত অসুরগণ অনেক প্রকারের চিত্ত-বিভ্রান্ত হইয়া মোহজালের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া যায়। সেইপ্রকার মোহজাল দ্বারা বদ্ধ হইয়া কাম-ভোগরূপ অশুচি নরকে পতিত হইয়া যায়।

অসুরগণের যে যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান তাহাও ধন-মান মদান্বিত আত্মতৃপ্তিকর ও হিংসাপরায়ণ। তাহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নামমাত্র যজ্ঞ দম্ভের সহিত অনুষ্ঠান করে। অহঙ্কার, বল, দর্প, ক্রোধ, কামাদি প্রভৃতির মিশ্রিত বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া এটি আমার দেহ এবং ঐটি অপরের দেহ, আমি হিন্দু, এ ব্যক্তি মুসলমান, আমি বাঙ্গালী, অমুক অবাঙ্গালী, আমি জার্ম্মান, তিনি ইংরাজ ইত্যাদি বিচার করিয়া জীবহিংসা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া যায়। সেই প্রকার হিংসাপরায়ণ ক্রুর নরাধমগণকে ভগবান্ তাঁহার দৈবী মায়ার ত্রিশূল বিদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ নানাপ্রকার অশুভ, অশুচি, অসুরযোনিতে নিক্ষেপ করেন। এবং পুনঃ পুনঃ অসুর-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সেই নরাধম মূঢ় অসুর জন্ম-জন্মান্তরেও শ্রীভগবান্ এবং নাম-রূপ-লীলা পরিকর বৈশিষ্ট্যের কথা বুঝিতে না পারিয়া নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানরূপ অধমগতি লাভ করে।

# আসুরিক প্রবৃত্তির কারণ

আসুরিক বৃত্তির বহু কারণ থাকিলেও মোটামুটি তিনটি কারণ সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি। যথা—কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনটি বৃত্তিকেই আত্মনাশক বা নরকের দ্বার স্বরূপ বলা হইয়াছে। ভগবানই জগতের একমাত্র মালিক ও ভোক্তা এই কথা যখন আমরা ভুলিয়া যাই, তখনই আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে ভোগ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ভোগের অতৃপ্তিতে ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং সেই প্রকার ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা "আঙ্গুর ফল টক" বলিয়া ব্যর্থচেষ্ট শৃগালের ন্যায় ত্যাগের অভিনয় করি। এই প্রকার ত্যাগের ছলনার মূলে থাকে বৃহত্তর লোভ ও ভোগ, এবং তাহাও বাসনা ভূমিকার আর একটি স্তরমাত্র। অতএব এই প্রকার ভোগ ও ত্যাগের ভূমিকা অতিক্রম করিয়া যে আত্মভূমিকা আছে, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে আমরা ভগবানের কথা বুঝিতে পারিব না। সুতরাং আসুরিক ভাবাশ্রিত থাকিয়া যাইব।

সেই প্রকার আসুরিক ভূমিকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আত্মকল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইলে শাস্ত্র বিধি-অনুযায়ী কার্য্য করাই একমাত্র উপায়। উচ্ছৃঙ্খল, অশাস্ত্রীয় ও বিধিবহির্ভূত কার্য্যগুলি সবই কামাচার। সুতরাং সেই প্রকার কামাচারের দ্বারা ক্রোধ এবং লোভ কোনদিনই অতিক্রম করা যাইবে না এবং তদ্দ্বারা কোনদিনই সুখলাভ ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইবে না। অতএব 'In the dispensation of providence mankind' কিভাবে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে অথবা কিভাবে শান্তিলাভ করিতে পারে তাহার পথ প্রদর্শন করিবে কে?

শাস্ত্রই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। শাস্ত্র বিধানোক্ত কার্য্য করিলেই আমরা কামাচার বা যথেচ্ছাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি।

কিন্তু যে যুগে আমরা উপস্থিত বাস করিতেছি তাহা ঘোরতর কলিযুগ। এই যুগের লোকগুলি সকলেই প্রায় অল্পায়ু, মন্দমতি, মন্দভাগ্য এবং সর্ব্বদাই রোগ শোক দ্বারা উৎপীড়িত। সুতরাং সহজেই তাহাদের শাস্ত্র-প্রীতি নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া বাস করিতেছে। এই সকল ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত' পালনই করে না, উপরন্তু শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া ক্রমেই কামার্থ ভোগরূপ আসুরিক বৃত্তিতে অতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই সকল কলিহত জীবগণের পরিত্রাণের জন্য ভগবান্ এবং ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদাই চিন্তিত। ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ কৃপাসিন্ধু এবং বাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁহারা কলিহত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য যে যাহা প্রার্থনা করে, তৎসমুদায় তাহাদের দিয়াও ভগবৎ সম্বন্ধ যোজনা করিয়া দেন। পতিতপাবন গৌরসুন্দর শ্রীচৈতন্যদেব এই কলিহত জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া যে উপায় ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন তাহাই সর্ব্বসাধারণের শাস্ত্রবিধি। বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ পড়িয়া অন্যান্য যুগে যে প্রকার চিত্ত-শুদ্ধির সম্ভাবনা ছিল, তাহার আর এখন সম্ভাবনা নাই; যেহেতু পূর্ব্ব প্রণালী অনুসারে ব্রহ্মচর্য্যাদি সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়া শাস্ত্রানুশীলন করিবার সাধারণের ক্ষমতাই নাই। বহু দোষ-দুষ্ট ব্যক্তিগণ বেদ-বেদান্ত পড়িয়া কিছুই করিতে পারিবে না। এই প্রকার সংস্কার বর্জ্জিত অনধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট বেদান্ত ব্যাখ্যা করা—কেবলমাত্র সময় নষ্ট করা মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেবই এই প্রকার কলিহত জীবকে কৃপা করিয়াছেন। সুতরাং যাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তাহারা যে চিরবঞ্চিত হইয়া থাকিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?



যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের দয়ার কথা বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের আর 'in the dispensation of providence' অর্থাৎ মায়ার দ্বারা শাসিত হইতে হয় না। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অনাদি কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়া মায়ার দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছেন, তাঁহাদিগের জন্য ভগবান্ কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পণ্ডিতগণ বলেন যে, চৌরাশী লক্ষ যোনির পর অর্থাৎ জৈব জগতে নব-লক্ষ প্রকারের জলজন্তু যোনি, বিংশ লক্ষ বৃক্ষ পর্ব্বতাদি স্থাবর যোনি, একাদশ লক্ষ ক্রিমিকীট যোনি, দশ লক্ষ পক্ষী যোনি, ত্রিশ লক্ষ পশু যোনি এবং চারি লক্ষ মনুষ্য যোনির মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে চেতনের 'জড়াবস্থার ক্রমবিকাশ পদ্ধতিতে' ভারত-ভূমিতে মনুষ্য সমাজে জন্ম হয়। উপরোক্ত একটি একটি যোনির মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কত কোটি বৎসর যে চলিয়া যায় তাহার গণনা হয় না, সুতরাং ভারত ভূমিতে জন্ম লাভ করিবার পরও যদি আমরা মায়ার বশে ভাসিয়া ভাসিয়া "in the dispensation of providence"-এই হাবুডুবু খাই, তাহা হইলে আর আমাদের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাই বলিয়াছেন,

*ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।*
*জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥*

ভারত ভূমিতে যে মহাজনগণের পথ-নির্দ্দেশ আছে, তাহাই অনুসরণ করিলে মনুষ্য জীবনের সার্থকতা হয়। কারণ মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের রেণু হইবার জন্য ভারতবর্ষের মনীষীগণ যেভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, এমনটি পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ পাশ্চাত্য প্রভৃতি দেশে মায়া-সৃষ্ট শরীর ও মনকেই কেন্দ্র করিয়া জড়বিজ্ঞান-সম্মত বহু গবেষণা

ও উন্নতি হইয়াছে দেখা যায়। সেইজন্য তাঁহারা 'in the dispensation of providence'-এর দ্বারা কোন প্রকার rest পাইতেছেন না। ভারতবাসীও তাঁহাদের অনুকরণ-প্রিয় হইয়া ধ্বংসের পথে চলিতেছেন। এখন ভারতবাসী নিজের জিনিস জলাঞ্জলি দিয়া পরের দুয়ারে ভিক্ষার্থী হইয়াছেন এবং এই প্রকার মায়ার 'dispensation'-এ আসিয়াই তাঁহারা স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইতেছেন। তাঁহাতে কোন সুবিধা হইবে না। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে অনুচেতন জীব ও পূর্ণচেতন ভগবানের মধ্যে যে নিত্যকালীন সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-সিদ্ধির কথা আছে, সে বিষয়ে কিছুই আলোচনা করা হয় নাই। সেইজন্য তাহারা জড়ের বহুমুখী উন্নতি সাধন করিয়াও বিষয়-বিষের জ্বালায় ছটফট্ করিতেছে এবং ভারতবাসীও সেইপ্রকার জ্বালায় আসামী হইয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি এখন শান্তির জন্য ভারতবর্ষের দিকেই চাহিয়া আছেন। শান্তির কথা এই ভারতবর্ষ হইতে তাহাদের কানে পৌঁছিবে—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আমরা করিতে পারি।

# শান্তি লাভের উপায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের দুর্দ্দশা ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই বিষয়-বিষানলে শান্তিবারিস্বরূপ তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ হইতেই গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। সাধারণ কর্ম্ম এবং শ্রীগীতোক্ত কর্ম্মযোগ— এই দুইটিতে বহু পার্থক্য আছে, তাহা জানা প্রয়োজন। আজ তথাকথিত বহু কর্ম্মি-সম্প্রদায় কর্ম্মযোগী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেও তাঁহাদের নিজ কর্ম্মের ফল যথাযথ ভোগ করিতেছেন দেখা যায়। গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিযোগ কথাটি বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। এই বুদ্ধিযোগের অর্থ—ভগবদ্ভক্তি। কারণ তিনি বলিয়াছেন—*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে*। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, *'ভক্ত্যা মামভিজানাতি', 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ'* ইত্যাদি। সুতরাং যে বুদ্ধিযোগ দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বুদ্ধিযোগ ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভক্তি দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় একথা চির-প্রসিদ্ধ এবং সেই জন্য ভগবানের একটি নাম ভক্ত-বৎসল।

সেই বুদ্ধিযোগ দ্বারা যে কর্ম্মকৌশল অবলম্বন করা যায়, সেই কর্ম্মকৌশল দ্বারাই মানুষের শান্তি হইতে পারে। সেইপ্রকার কর্ম্মকৌশল দ্বারাই মানুষ 'in the dispensation of providence'-এ rest পাইতে পারে; সেই বুদ্ধিযোগের কথা গীতাশাস্ত্রে আমরা এইভাবে দর্শন করি। যথা—

*এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।*
*বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥*

*নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।*
*স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥*
(*গীঃ* ২/৩৯-৪০)

সাংখ্য-যোগ বিশ্লেষণ করিয়া যে শান্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা আধুনিক জগতের লোকের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু বুদ্ধিযোগ দ্বারা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির দ্বারা যে শান্তি লাভ হয়, তাহা সর্ব্বোচ্চ সুলভ এবং ব্রহ্মানন্দরূপ শান্তিকেও তুচ্ছকারী। কারণ ভক্তি বিষয়িণী কর্ম্মের প্রগতির কখনই নাশ হয় না অর্থাৎ যতটা সম্ভব করা যায় ততটাই লাভের বিষয় এবং তাহা কোনদিনই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত বা নাশপ্রাপ্ত হয় না। তাহার স্বল্পানুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতার সংসার বন্ধনরূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ।

শুদ্ধ ভক্তিযোগ একটিই মাত্র। কিন্তু বুদ্ধিযোগ কৌশলে কর্ম্ম ও জ্ঞানে নিয়োজিত করিবার উপায়—এই গীতাশাস্ত্রেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বুদ্ধিযোগ যখন কর্ম্মের সীমাকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মমিশ্রা হয়, তখনই তাহাকে 'কর্ম্মযোগ' আখ্যা দেওয়া হয়। আবার জ্ঞানের সীমাকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানমিশ্রা হইলে তাহা 'জ্ঞানযোগ' নামে অভিহিত হয়। কিন্তু তদুভয় সীমাকে অতিক্রম করিয়া যখন কেবলা-ভক্তি জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত হয়, তখনই তাহা বিশুদ্ধ 'ভক্তিযোগ' নামে অভিহিত হয়।

ইহজগতে লৌকিক বা বৈদিক যে সকল কর্ম্মের আমরা অনুষ্ঠান করি তাহা সবই পৃথক পৃথক ফল প্রসব করে। সেই সকল বহুধা ফল ভোগ করিবার সময়ে আবার নূতন নূতন কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের সৃষ্টি হয়; সেগুলিও আবার পৃথক পৃথক ফল প্রসব করে বলিয়া সেই সমস্ত কর্ম্মগুলি কর্ম্মযোগ আখ্যা পাইতে পারে না। সুতরাং কর্ম্ম ও কর্ম্মফলরূপ একটি বৃহৎ বৃক্ষ বিরাট শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে।



কর্ম্মফলভোগী সেই বৃহৎ বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে করিতে কি মঙ্গল আনয়ন করিতে পারিবে? অতএব 'in the dispensation of providence mankind cannot have any rest.' এই জন্মান্তরেও সেই সংসার-বৃক্ষ আরোহণ করিয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়া যায়। ফলে চৌরাশী লক্ষ নানা যোনিতে উপর্যধো ভ্রমণ করিতে করিতে ত্রিতাপ যন্ত্রণায় দগ্ধীভূত হইয়া কোনমতেই rest বা শান্তি পায় না। অথচ সেই প্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিবারও আমাদের উপায় নাই। সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করিবার অভিনয় করিয়া তথাকথিত সন্ন্যাসীর বেশ লইয়াও উদরপূর্ত্তির জন্য বহু প্রকার কর্ম্ম করিতে হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অধস্তন সন্ন্যাসীবর্গের অবস্থা চিন্তা করিয়াই বলিয়াছেন, *উদর নিমিত্তং বহুকৃতবেশম্*। সুতরাং কর্ম্মত্যাগ করিবার উপায় মোটেই নাই। সেইজন্য অর্জ্জুন মহাশয় তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম যুদ্ধ ত্যাগ করিবার অভিনয় করিলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই উপদেশ করিয়াছিলেন, যথা—

*নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ ।*
*শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥*
(*গীঃ* ৩/৮)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন মহাশয়কে উপদেশ করিলেন, তুমি সর্ব্বদাই শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে থাক। কর্ম্ম ত্যাগ করিলে তোমার শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না। অনধিকারী ব্যক্তি নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিলে জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয়। শরীর যাত্রা যখন কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত সাধিত হয় না, তখন কর্ম্মত্যাগও সম্ভব নহে। অথচ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলরূপ যে সংসার-বৃক্ষ গড়িয়া উঠে, তদ্দ্বারা জীবের কোন প্রকারই শান্তির আশা নাই। সেই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম কিভাবে করিতে হইবে তাহার উপদেশ করিলেন, যথা—

*যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।*
*তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥*
*(গীঃ ৩/৯)*

কর্ম্ম করিয়াও যে কর্ম্মফল বন্ধন না করিয়া মুক্ত করিয়া দেয়, তাহা providence-এর আর একপ্রকার 'dispensation'। সমস্ত কর্ম্মই যজ্ঞার্থে অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে করাই মুক্তসঙ্গ-কর্ম্ম পদ্ধতি বা কর্ম্ম-যোগ কৌশল। এই প্রকার কর্ম্মযোগ কৌশল দ্বারা কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইয়া জীবের নিত্য-সিদ্ধ ভগবদ্-ভক্তি ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য এই কর্ম্মযোগকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগও বলা যায়। নিষ্কাম বলিতে—যে কর্ম্মে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক কোন কামনা নাই। অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মফলই নিজে ভোগ না করিয়া ভগবানকে সেই ফল প্রদান করা।

আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে সকলকেই সামর্থ্যানুযায়ী অর্থাদি সংগ্রহ করিতে হয়। অর্থাদির বিনিময়ে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হয় এবং সেই দ্রব্যাদিই ভোজ্যরূপে পরিণত হইলে আমাদের শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। যথাযথ ভোজন না করিলে শরীর রক্ষা হয় না এবং শরীর রক্ষা না হইলে আবার ভোজ্য বস্তু সংগ্রহ হয় না। কোন্‌টি কারণ এবং কোন্‌টি কার্য্য তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং উভয়ের কার্য্য কারণ বলিয়া ইহাকে এককথায় কর্ম্মচক্র বলা যাইতে পারে। এই প্রকার কর্ম্মচক্রে জন্ম-জন্মান্তর ঘুরপাক খাওয়াই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ। সেই প্রকার ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণশীল কোন ভাগ্যবান্ জীব ভগবানের এবং সাধুগুরুর কৃপায় নিজের দুরবস্থার কথা বুঝিতে পারে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিয়া মুক্তসঙ্গ হইবার চেষ্টা করে।

# মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য

জড়জগতের যে একটা তাৎকালিক সুখ-শান্তি আছে তাহাই আমাদের প্রাপ্য বস্তু নহে। যেহেতু আমরা সকলেই নিত্য শাশ্বত বস্তু, সেহেতু আমাদের নিত্য সুখের জন্য আবহমানকাল চেষ্টা। কিন্তু আমরা আলেয়ার সুখ-শান্তির আশায় জন্মজন্মান্তর কেবল শরীর পাল্টাইয়া চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিতেছি। ইহার কোন হিসাবই আমরা করি না। অথচ ১০/২০ বৎসরের সুখ-শান্তির জন্য আমরা কি ভাবেই রক্তপাত করিতেছি। আমরা আসুরিক বৃত্তিতে যে সুখ বা রসের অন্বেষণ করি, তদ্দ্বারা আমাদের শান্তি লাভ হয় না; কারণ আমরা জানি না যে সুখ শান্তি কোথায়। প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদের বলিয়াছেন, *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুঃ*।

আমরা কিন্তু স্বার্থান্বেষণ করিতে করিতে উদ্দেশ্যহীন হইয়া জড় শরীর ও মনরূপ জাহাজে বসিয়া সংসার সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন কূল না পাইয়া কেবল ধাক্কাই খাইতে থাকি ও মনে করি 'in the dispensation of providence, man cannot have any rest.' আমরা যদি জানিতাম যে আমাদের ভবসিন্ধুর কূল বা আমাদের চরম-স্বার্থ "বিষ্ণু" তাহা হইলে আর আমাদের দুঃখ থাকিত না। সেই কথা আমাদের জানা নাই বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জানাইলেন যে যজ্ঞার্থে বা বিষ্ণু প্রীত্যর্থেই কর্ম্ম করা আবশ্যক। ঋক্-মন্ত্রেও আমাদের এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যথা—*তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ* ইত্যাদি। অতএব যাঁহারা সূরয়ঃ অর্থাৎ দেবতাপর্য্যায়ভুক্ত তাঁহারা সর্ব্বদাই বিষ্ণুপাদপদ্মকেই স্বার্থগতি বলিয়া

জানেন। সুতরাং তদর্থে অর্থাৎ সেই বিষ্ণুরই প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করাই তাহাদের মুক্তসঙ্গের সমাচরণ। যদি কর্ম্মচক্র হইতে পরিত্রাণ পাইতে হয় তাহা হইলে মনুষ্যজাতিকে বিষ্ণুর পাদপদ্ম লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। তাহা না করিলে অসুর হইয়া যাইতে হইবে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বিগণ বা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ যাঁহারা হিন্দু নামে অভিহিত হইতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ করিয়া যাঁহারা উচ্চবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুকেই কেন্দ্র করিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সকল আশ্রমেই বিশেষ করিয়া গৃহস্থাশ্রমিগণ প্রত্যেকেই গৃহে বিষ্ণুসেবারূপ নিত্য যজ্ঞ করিতেন বা এখনও বহু নিষ্ঠাবান গৃহস্থ তাহা করেন।

সেই বিষ্ণুসেবার জন্যই অর্থ সংগ্রহ করা, অর্থের বিনিময়ে ভোজ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করা এবং সেই সকল ভোজ্যদ্রব্য বিষ্ণুরই ভোগের জন্য রন্ধন করা এবং পরে সেই বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রসাদরূপে সম্মান করা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যের ভিতর বিষ্ণুপ্রীতি বা যজ্ঞ সাধিত হইত। তাহা পূর্ব্বে সম্ভব ছিল বা এখনও কোথাও কোথাও প্রকটিত আছে। সেই পদ্ধতি সার্ব্বজনীনভাবে সর্ব্বত্র এবং সকল বিষয়েই প্রযোজ্য হইতে পারে। অতএব সেই স্বার্থগতি বিষ্ণু যিনি সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ তাঁহারই প্রীত্যর্থে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই আমরা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইব। প্রগতিশীল কর্ম্মের প্রতিরোধ না করিয়া সমস্ত কর্ম্মই 'প্রীত্যর্থে' কর্ম্ম, অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে সম্পাদন করাই বিধেয়। পণ্ডিতগণ বলেন, বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভই মুক্তি, *মুক্তিঃ বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভঃ* বিষ্ণুর স্বার্থেই নিজের স্বার্থ পরিপূর্ণ হয়, ইহাই কর্ম্মযোগের ক্রমপন্থা। এবং সেই কর্ম্মের ফল কি, সে-বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—যজ্ঞ বা ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কার্য্য না করিলে সমস্ত কার্য্যেই গরল বা পাপ উৎপত্তি হইয়া জগদ্‌বিপ্লব উপস্থিত হয়।



*যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।*
*ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥*

(*গীঃ ৩/১৩*)

শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য উল্লিখিত যে বিষ্ণুসেবার পদ্ধতি কথিত হইল, তদ্দ্বারা কোনপ্রকার আপাতদৃষ্টিতে পাপ কার্য্যের উদ্ভব হইলেও, তাহা হইতে যজ্ঞাবশিষ্ট ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণ করিলে সকলপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। আমরা অত্যন্ত সাবধানে থাকিলেও এবং খুব দৃঢ়ভাবে অহিংস-নীতি অবলম্বন করিলেও আমরা যে কর্ম্মচক্রের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি, তাহাতে অজ্ঞাতসারে বহুপ্রকার পাপ সাধিত হইয়া যাইতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, সাধারণ লোকাচার এবং ব্যবহারিক কার্য্যে, বিশেষ করিয়া রাজনীতি কার্য্যে প্রায়ই পাপ করিতে হয়। মুখে অহিংসার কথা বলিয়া কার্য্যে হিংসা করা ব্যতীত বাঁচিবারই উপায় নাই। সর্ব্বপ্রকার পাপকার্য্য হইতে বিরত হইলেও অন্ততঃ 'পঞ্চসূনা' নামক পাপকার্য্য হইতে কিছুতেই বাঁচিবার উপায় নাই। রাস্তায় চলিবার সময় অনিচ্ছায় বহু পিপীলিকার প্রাণ নাশ করিতে বাধ্য হই। গৃহাদি মার্জনকালে বহু ক্ষুদ্র প্রাণীর হিংসা হইয়া যায়। পেষণী কার্য্যে, জলকুম্ভের নিকট' অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার সময়ও বহু প্রাণীর হিংসা হইয়া যায়। এই প্রকার আহার-বিহার কার্য্যে অনেক সময় বাধ্য হইয়া অন্যায় অনাচার করিয়া কিল্বিষ বা পাপ, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় হইয়া যায়। মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যে অহিংস-নীতি অবলম্বন করি তদ্দ্বারা একজনের সুবিধা, অন্যের অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী।

সেই প্রকার মনোধর্ম্মোত্থিত অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আদৌ সুবিধা নাই। মানুষের মনোধর্ম্মগত আইন অনুসারে মনুষ্য-হত্যা করিলে প্রাণদণ্ডের বিধি আছে, কিন্তু মনুষ্যেতর জীবহত্যা করিলে সেরূপ বিধি নাই, কিন্তু providence-এর বিধান অন্যরূপ। ভগবানের বিধানে

মানুষ হত্যা করিলে যেমন দণ্ডের বিধান আছে, মনুষ্যেতর জীবহত্যা করিলেও তেমন দণ্ডের বিধান আছে। উভয় ব্যাপারেই হত্যাকারী দণ্ডনীয়। নাস্তিক সম্প্রদায় অবাধে পাপকার্য্যাদি চালাইবে বলিয়া ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চায় না। স্মৃতি শাস্ত্রাদিতে কথিত হইয়াছে যে, গৃহস্থের বহু প্রকার প্রাণীহিংসারূপ পাপ, ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হইয়া থাকে। যথা কণ্ডনীদ্বারা, পেষণীদ্বারা, চুল্লীদ্বারা, উদকুম্ভদ্বারা, মার্জ্জনীদ্বারা প্রতি গৃহস্থেরই অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাণী হত্যাজনিত পাপ অর্জ্জন হয়। সেই প্রকার পাপকার্য্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পঞ্চসূনা যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। সেইজন্য সেই যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে নিবেদিত যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্যাদি, অর্থাৎ প্রসাদাদি ভোজন করাই একমাত্র বিধি। কিন্তু যাহারা স্বার্থপর হইয়া কেবলমাত্র নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য অর্থাৎ বিষ্ণুসেবার অনুষ্ঠান না করিয়া জিহ্বালাম্পট্যের জন্য রন্ধনাদি করে, সমস্ত পাপকার্য্যের যে ক্লেশ, তাহা তাহারা ভোগ করে। ইহাই providence-এর বিধি। সেই প্রকার পাপকার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেক গৃহস্থের আশ্রমে বিষ্ণুসেবার পদ্ধতি এখনও দৃষ্ট হয়।

অতএব যাঁহারা দেশ বা সমাজের নেতৃত্ব করেন তাঁহারা যেন নিজের মঙ্গলের জন্য বা তাঁহারা যাহাদের নিয়ন্ত্রিত করেন, তাহাদের মঙ্গলের জন্য যজ্ঞার্থে অর্থাৎ বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে সমস্ত কার্য্য করেন। তাঁহাদের আদর্শ সকলেই অনুসরণ করে বলিয়া, তাঁহাদের অত্যন্ত সাবধানে যজ্ঞার্থে কার্য্য করিবার উপায়গুলি শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। সমাজের মঙ্গলের জন্য এই যজ্ঞার্থে কর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য পারমার্থিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। সেই প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন মহাশয়কে বলিলেন,—

*যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।*
*স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥* (গীঃ ৩/২১)



"শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, সাধারণ ব্যক্তিগণ তাহার অনুসরণ করেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।"

কিন্তু হায়, এমন সময় আসিয়াছে যে, যাহারা সমাজের মধ্যে, দেশের মধ্যে বড় এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, তাঁহারাই অধিকতর বিষ্ণু-বিদ্বেষী। সুতরাং যজ্ঞার্থে বা বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে তাঁহারা কি কার্য্য করিবেন? আর যদি যজ্ঞার্থে, বা ভগবানের প্রীত্যর্থে কার্য্য না করেন, তাহা হইলে কি করিয়াই বা নিজের পাপকার্য্যাদির ফল হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন? শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই যদি ইহা প্রমাণ না করেন যে, বিষ্ণুই সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ববস্তু এবং তিনিই সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ বিচারে জগতের সর্ব্বত্রই ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান, তাহা হইলে ইতর লোক আর কি বুঝিবে? সমস্ত বিষয়ের তিনিই একমাত্র মালিক হৃষীকেশ। আমরা জগতের ভোক্তা বা মালিক হইতে পারি না। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের যাহা প্রসাদরূপে প্রদান করেন মাত্র তাহাই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। অন্যের দ্রব্য কদাচিৎ গ্রহণযোগ্য নহে।

*ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।*
*তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥*
(*ঈশোপনিষৎ*—১)

ভগবানকেই অর্থাৎ বিষ্ণু-তত্ত্বকেই কেন্দ্র করিয়া যদি জননেতাগণ তাঁহাদের কার্য্য যথাযথ নির্ব্বাহ করেন, তবেই তাঁহাদের এবং তাঁহাদের অনুগত ব্যক্তিগণের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। আর যদি তাহা না করিয়া নিজেই বিষ্ণু সাজিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের অনুগতদের ভোগা দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই প্রকার ফল্গুত্যাগের আদর্শ দেখিয়া কতকগুলি হতভাগ্য লোক দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা ছাড়া আর কোন লাভ হয় না।

জননেতাগণ তাঁহাদের নিরীহ স্তাবকগুলিকে বৃথা উত্তেজিত করিয়া বহু প্রকার পাপকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। এইভাবে তাহাদের উচ্ছেদসাধন করিয়া নিজের কিছু অধিক লাভ, অধিক পূজা এবং অধিক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া লন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, সেই সকল ক্ষণিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি তাঁহাদের শরীর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু যে সমস্ত পাপকার্য্য সাধন করিয়া ঐ সকল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অর্জ্জিত হয়, সেইগুলির ফল, মন বুদ্ধি অহঙ্কারের সহিত সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত থাকিয়া জীবকে প্রারব্ধ বীজরূপে জন্মজন্মান্তরে কর্ম্মচক্রে পতিত করিয়া নানা যোনি ভ্রমণ করাইতে বাধ্য করিবে।

# ভবরোগ নিরাময়ের উপায়

তত্ত্বজ্ঞান-বর্জ্জিত নেতাগণ যা প্রমাণ করিতেছেন তাহাই সাধারণ লোক অনুসরণ করিতেছে। সুতরাং জননেতাগণ তাঁহাদের আচরণ খুব সতর্কতার সহিত করিলেই ভাল হয়। যজ্ঞার্থে কিভাবে কর্ম্ম সম্ভব হয়, তাহার কৌশল জানিয়া পরে জননেতার কার্য্যে ব্রতী হইলেই মঙ্গল হয়। নিজে বিচক্ষণ চিকিৎসক না হইয়া অন্যান্য রোগীর চিকিৎসা বিধান করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

জনসাধারণের রোগ কোথায় এবং তাহাদের ঔষধ ও পথ্যাদির কিরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা না বুঝিয়া বা না জানিয়া সেই রোগীগণের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিরূপ চিকিৎসা দ্বারা কোনদিনই জনসাধারণের উপকার করা যাইবে না। বরং রোগ বৃদ্ধি পাইয়া বিকারগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসকেরই প্রাণনাশ করিবে।

বিষ্ণু সম্বন্ধে উদাসীনতাই জনসাধারণের মূল-রোগ। সে বিষয়ে তাহাদের কোনরূপ চিকিৎসা না করিয়া উপর উপর সহানুভূতি দেখাইলে ঐ সকল রোগী-সম্প্রদায়ের তাৎকালিক কিছু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা কোন বাস্তব মঙ্গল সাধিত হয় না। রোগীকে ঔষধ এবং পথ্যাদি না দিয়া কেবল মাত্র কুপথ্যাদি ব্যবস্থা করিলে, রোগী ক্রমশই মৃত্যুমুখে ধাবিত হয়।

যজ্ঞাবশিষ্ট ভগবৎ-প্রসাদই তাহাদের বহু ভব রোগের পথ্য। ভগবানের কথাপ্রসঙ্গে তাঁর মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তন মূলে ভগবদ্বিগ্রহের দর্শন, অর্চ্চন, দাস্য এবং আত্মনিবেদন রূপ শরণাগতিই উক্ত রোগের মহৌষধ। এই প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই জগতের মঙ্গল সাধিত

হইবে, অন্যথায় অমঙ্গল। এই প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা মানব সমাজের কোন প্রকার অসুবিধার অবসর নাই। পরন্তু সমস্ত সুবিধার কথা আছে। যাঁহারা সুবিধাবাদী অর্থনৈতিক, তাঁহারা এ বিষয় বিচার-বিবেচনা করিতে পারেন।

জগতে কিভাবে শান্তি আসে সেজন্য মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ জননেতাগণ বহু চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু যেহেতু সেই সকল চেষ্টায় মহাজন প্রবর্ত্তিত উৎসাহের অভাব দেখা যায়, সেই হেতু সেই সকল চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না, বা হইবে না। নির্ব্বিশেষবাদীর ভগবান্ খাইতে পারেন না, দেখিতে পারেন না, শুনিতে পারেন না। সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদীর কল্পিত ভগবান্ কখনও জগতে শান্তি আনিতে পারিবেন না। যিনি ইন্দ্রিয়াদি-বর্জ্জিত (?) তিনি কি প্রকারে জগতের দুর্দ্দশা দেখিবেন বা প্রার্থনা শুনিবেন? সেইপ্রকার ভগবচ্চর্চ্চার দ্বারা জগতে অমঙ্গলই হইবে—মঙ্গল হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষে শুদ্ধজ্ঞান-চর্চ্চার অতন্নিরসনপূর্ব্বক তত্ত্ববস্তুর যেটুকু সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে ভগবানের পূর্ণ সবিশেষত্ব উপলব্ধি হয় না। কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞানালোচনায় ক্লেশই লাভ হইবে, কিন্তু তত্ত্ববস্তুর পূর্ণ সন্ধান পাওয়া যাইবে না। অতএব, সবিশেষ ভগবানে চেষ্টাপরায়ণ হইলে গান্ধীজী-প্রমুখ নেতাগণ সাধারণের যথার্থ উপকার করিতে পারিবেন।

অপর সাধারণ ব্যক্তিগণ সকলেই শরীর ও মন সম্বন্ধে কর্ম্মপ্রবীণ। সেই প্রকার জড় কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর অত্যন্ত নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণ ইহজগৎ ব্যতীত আরও কোন বৈকুণ্ঠজগৎ থাকিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। জড়শরীর-সর্ব্বস্ব সাধারণ মনুষ্য পশুর ন্যায় আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি কার্য্যে এতই মুগ্ধ যে, তাহারা পাপ-পুণ্যের কোনপ্রকার বিচার না করিয়া কেবল শরীর সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মোঘাশা, মোঘকর্ম্মা নামে অভিহিত। সেই সকল জগতের অহিতজনক ধ্বংসোন্মুখ কার্য্যের পুরোহিত বহু জড়



বৈজ্ঞানিক—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বকের তৃপ্তিকর বহুপ্রকার দ্রব্য-সম্ভার প্রস্তুত করিয়া ভোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর জগজ্জঞ্জাল প্রসবকারী ঘোর প্রতিযোগিতা লাগাইয়া দেয়। সেইপ্রকার কার্য্যদ্বারা তাহারা যতই স্বাধীন বলিয়া প্রচারিত হয়; ততই পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। যতই ধনরাশির সঞ্চয় হয়, ততই অশান্তিরাশির উদ্ভব হয়। ভগবানের ভোগ্যা লক্ষ্মীকে যতই কবলিত করিবার চেষ্টা হয়, ততই রাবণগোষ্ঠী সবংশে ধ্বংসোন্মুখ হয়। ঐ সকল কার্য্যের ফলে শরীর রক্ষার্থে যে অতি সাধারণ ব্যাপার অর্থাৎ কিছু আহার করিয়া জীবন ধারণ করা—তাহাও অতিশয় দুঃসাধ্য হইয়া যায়।

এই প্রকার নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণ হইতে কিছু উন্নত পরজন্ম বিশ্বাসী কর্ম্মাশ্রয়ি-সম্প্রদায়ের পরজন্মেও কিভাবে শরীর-ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য দান-পুণ্যাদি কার্য্যে ব্রতী হন। উভয় প্রকার কর্ম্মিগণই জানে না যে, পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মই বন্ধনের হেতু। তাহারা জানে না যে, নিষ্কাম কর্ম্মযোগই কর্ম্মের কৌশল। এইজন্য কৌশলী কর্ম্মিগণ বা কর্ম্মযোগিগণ, পূর্ব্বোক্ত মূর্খ কর্ম্মি-সম্প্রদায়েরই মত, অত্যন্ত আসক্তের অভিনয়ে কর্ম্মযোগ কৌশল তাহাদের হিতের জন্য জগৎকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সেইপ্রকার কর্ম্মযোগ কৌশল দ্বারা নিজের এবং জগতের মঙ্গল সাধিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা গীতায় উপদেশ দিয়েছেন, যথা—

*সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত ।*
*কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥*

*(গীঃ ৩/২৫)*

"অবিদ্বানগণ যেমন অত্যন্ত আসক্তির সহিত কর্ম্ম করিয়া শরীর-ধর্ম্ম পালন করে, তুমিও বিদ্বান্ হইয়া লোক সংগ্রহের জন্য সেইপ্রকার আসক্তির সহিত কর্ম্মযোগ সাধন কর।" যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন

বিদ্বান্, তাঁহারা সাধারণের মতই শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে কর্ম্ম করেন তাহা সমস্তই যজ্ঞার্থে বা বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে করিয়া থাকেন। সাধারণে সেই সকল বিদ্বানকে নিজেদের মত কর্ম্মি-সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করিলেও তাঁহারা মূর্খ কর্ম্মি-সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, পরন্তু বিদ্বান কর্ম্মযোগী।

অধুনা জড়-বিজ্ঞানের প্রসার কর্ম্মজগতের বৈভবরূপ বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। কর্ম্ম-বন্ধন ফাঁসরূপ বহু প্রকার কলকারখানা, জড় বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি বহু কিছু উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাচীন যুগে জড় কর্ম্মের এত প্রসার ছিল না। অসৎসঙ্গ দ্বারা এখন কর্ম্মের বহুপ্রকার বন্ধনী ও বেষ্টনী আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা বিদ্বান্ কর্ম্মযোগী, তাঁহারা এই সমস্ত ব্যাপারই যজ্ঞার্থে নিযুক্ত করিয়া কর্ম্মকৌশলী হইতে পারিবেন।

যেমন সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে বিষ্ণুসেবার ব্যবস্থা করিয়া অর্চ্চনাবিধি প্রবর্ত্তন দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন সকলেই কর্ম্মযোগী হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই প্রকারেই প্রত্যেক বড় বড় কলকারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বা বড় বড় হাসপাতাল ও পার্থিব প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিষ্ণুসেবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ইহা দ্বারা যথার্থ পারমার্থিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে। নারায়ণকে দরিদ্র সাজাইবার চেষ্টা না করিয়া সর্ব্বেশ্বর নারায়ণের সেবা প্রতিষ্ঠার দ্বারা দরিদ্রগণকে কৃপা করাই শাস্ত্রবিধি। সেই নারায়ণই বিষ্ণুতত্ত্ব। বিষ্ণুতত্ত্ব বহু প্রকারে প্রকাশ হইলেও মহাজনগণ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীশ্রীসীতারাম এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহগণের সেবা-পদ্ধতি প্রকট করিয়াছেন। এই তিন প্রকার বিষ্ণুতত্ত্বের বহুল সেবা-প্রচার ভারতের সর্ব্বত্র প্রকাশিত আছে। সুতরাং যাঁহারা বড় বড় মিল বা কলকারখানার মালিক, তাঁহাদিগকে আমরা উক্ত তিন প্রকার বিষ্ণু-বিগ্রহগণের মধ্যে যে-কোন সশক্তি ভগবানের সেবা প্রকট করিয়া প্রসাদ বিতরণ করিতে অনুরোধ করি।



তাহা হইলে আর ধনিক শ্রমিকের বিবাদ থাকিবে না। কারণ সেই প্রকার সেবার দ্বারা ধনিক ও শ্রমিক উভয়েই কর্ম্মযোগী হইয়া যাইবেন।

বড় বড় কলকারখানার শ্রমিকগণ প্রায়ই স্বভাবের নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ সমাজের নিম্নস্তরে চলিয়া যায়। সেই প্রকার তমোগুণসম্পন্ন লোকের আধিক্য হইলে জগতের কোনই মঙ্গলের সম্ভাবনা হয় না। সুতরাং সেই সকল শ্রমিকগণকে তদীয় মালিকগণ যদি যজ্ঞাবশিষ্ট ভগবৎ প্রসাদ দান করেন, তাহা হইলে সেইপ্রকার প্রসাদদাতা ধনিক এবং সেই প্রকার প্রসাদসেবী শ্রমিক উভয়েরই ক্রমশঃ ভগবদ্ভাব উদিত হইয়া সকলেই সমাজের স্বজাতীয় স্নিগ্ধাচার হইয়া যায়। কিন্তু অপস্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া যে স্বজাতীয়তার ভাব দেখা যায়, তাহা ক্ষণভঙ্গুর ও বিপজ্জনক। এই সকল স্বভাবভ্রষ্ট শ্রমিকগণকে যাহারা কেবল অপস্বার্থ পরিপূরণের জন্য বৃথা উত্তেজিত করে, তাহারা নিজের বা ঐসকল শ্রমিকগণের কোনই উপকার করিতে পারে না। ধনিকগণের ত' স্বভাবতই তাহারা শত্রু হইয়া যায়। তাহাদের ত' কোন কথাই নাই।

এই প্রকার বিষ্ণু-বিদ্বেষী চেষ্টার ফলে শ্রমিক সঙ্ঘ ও মালিক সঙ্ঘ উভয়েই কলিযুগোচিত বৃথা তর্কপরায়ণ হইয়া, পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইয়া জগতে বহু প্রকার জঞ্জালের সৃষ্টি করে। সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিকগণ যে সাম্যবাদ প্রচার করিবার জন্য জগতে বহু অর্থ, বুদ্ধি ও প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছেন, বলশেভিক্‌গণ যে বৃহৎ গৃহস্থালীর সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন, শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছেন, সেই সমস্ত জটিল সমস্যাগুলির একমাত্র সহজ সমাধান কর্ম্মযোগ বা যজ্ঞার্থে কর্ম্ম।

মানব সমাজের আত্মীয়তা বিকাশের সূচনা-স্বরূপ যে ইউনেস্কোর (Unesco) কল্পনা হইয়াছে, তাহার মূল-ভিত্তি গৃহস্থালী। গৃহস্থালী

হইতে সমাজ, সমাজ হইতে সম্প্রদায়, সম্প্রদায় হইতে গ্রাম, গ্রাম হইতে দেশ, দেশ হইতে মহাদেশ, প্রভৃতির প্রসার লাভ করে। সেই প্রকার প্রসারণ ক্রিয়ার দ্বারাই ইউনেস্কোর (Unesco) সূচনা হইয়াছে। কিন্তু এইপ্রকার প্রসারণ ক্রিয়ার মধ্যে যে কেন্দ্রীয় আকর্ষণ আছে, তাহাই আমাদের লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। এই প্রসারণ ক্রিয়াকে সঙ্কোচ করিয়া আনিলে আমরা নিজ শরীরের দিকে লক্ষ্য করি। শরীরের মধ্যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিই প্রধান, ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা মনই প্রধান, মন হইতে বুদ্ধি প্রধান এবং বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার প্রধান। সেই অহঙ্কার হইতেও যাহা প্রধান, তাহাই আমি স্বয়ং এবং আমার সেই শুদ্ধ চেতন স্বরূপই বিষ্ণুতত্ত্বের অংশ। অতএব সমস্ত জগতের যে মূল আকর্ষণ কেন্দ্রীয়তত্ত্ব তাহাই বিষ্ণুতত্ত্ব। সেইজন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং, দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ* ইত্যাদি। যাঁহারা কেন্দ্রবিচ্যুত হইয়া বহির্জগতের প্রসার দর্শন করেন, তাঁহারা বহিরর্থমানী দুরাশয়বিশিষ্ট। সেই প্রকার দুরাশয় ব্যক্তিগণ অন্ধ, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা জগতের কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। সেই অন্ধগণ যতই অন্যান্য অন্ধগণের উপকারের ছলনা করুন না কেন, মূলতঃ তাঁহারা ভগবানের আইন দ্বারা (by the will of providence) বিশেষভাবে বদ্ধ। সুতরাং আমাদের বুঝা দরকার যে, আমাদের দৃশ্য-জগতের মূলীভূত কেন্দ্র—বিষ্ণুতত্ত্বঃ, এবং সেই বিষ্ণুতত্ত্বের শেষ আলোক—"শ্রীকৃষ্ণ"।

*মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।*

সুতরাং সেই অদ্বয়জ্ঞান মূল কেন্দ্রের নাম 'কৃষ্ণ' ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ তিনিই সমস্ত চরাচর বস্তুর মূল আকর্ষণ। এ বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষী ও পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের মূল পুরুষই শ্রীকৃষ্ণ—*এতে চাংশ*



*কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।* সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বই স্বরূপতঃ এক হইলেও সিদ্ধান্তগত কেহ বা অংশ, কেহ বা অংশের অংশ, কলা ইত্যাদি। এই সকল বিষ্ণুতত্ত্বের আলোচনা আমরা পরে পৃথক্‌ভাবে করিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু উপস্থিত আমাদের জানিয়া রাখা দরকার যে শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর।

*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।*
*অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥*

(*ব্রহ্মসংহিতা ৫/১*)

সুতরাং সেই আদি পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যদি আমরা পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত হই, তাহা হইলেই আমরা মায়ার সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার পরিচয় দিতে পারি। কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধেই আমরা ইংরাজি ভাষায় কথিত, Fraternity Equality প্রভৃতির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি।

# জীবের স্বরূপ

ভগ্নীকে কেন্দ্র করিয়াই ভগ্নীর স্বামী, যাহার সহিত আমার পূর্বে কোন সম্পর্ক ছিল না এমন ব্যক্তি ভগ্নীপতি নামে অভিহিত হয়, এবং তাহাদের পুত্রকন্যাও ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী ইত্যাকারে সম্পর্কিত হইয়া থাকে। সেইপ্রকার দেশকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি মানুষ বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ইত্যাকার জাতিগত পরিচয়ে পরিচিত হইয়া থাকে। আবার ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেইপ্রকার খণ্ড পরিচয়ে যতই পরিচিত হই না কেন এবং সেইপ্রকারে নিজেকে আমরা যতই প্রসার করিতে চেষ্টা করি না কেন, সে-সমস্ত চেষ্টা আমাদের ক্ষুদ্র অংশরূপে আমাদের ক্ষুদ্র এবং খণ্ডই থাকিয়া যাইবে। সেই বিরাট পুরুষের অংশরূপে আমাদের সেবাচেষ্টা না থাকিলে আমরা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হই; যেমন আমাদের শরীরের কোন অংশ যদি তাহার নির্দ্দিষ্ট সেবা কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে সেই অংশের আর কোন মূল্য থাকে না। অতএব আমাদের সমস্ত কার্য্যের মধ্যে সেই মূল পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্রীভূত না থাকিলে সমস্ত কার্য্যই বৃথা হইয়া যায়। কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া আমরা সকলেই স্বভাবতঃ নিত্যকালই কার্ষ্ণ বা কৃষ্ণদাস আছি। কিন্তু সেইপ্রকার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যের অভাবেই আমাদের বহুপ্রকার ক্লেশ এবং অধঃপতন। সুতরাং সেই কেন্দ্রীভূত স্ব-স্বভাবকে পুনরায় উন্মোচন করাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য-কর্ম্মে আগুয়ান হইতে হইলে কর্ম্মযোগই প্রথম সোপান।





*কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।*
*এই দোষে মায়া তারে গলায় বান্ধিল ॥*

(*চৈঃ চঃ মঃ ২২/২৪*)

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ—এই নিত্য সত্য বিষয়টি প্রকাশ করিতে হইলে কর্ম্মযোগী কৌশলে মূর্খ কর্ম্ম-সঙ্গীদের বুদ্ধিভেদ না করিয়াও তাহাদের পরম উপকার করিতে পারেন।

*ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।*
*জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥*

(*গীতা* ৩/২৬)

যাহারা কর্ম্মসঙ্গী তাহাদিগকে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কারণ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই মূঢ়, অধম ও দুষ্কৃতিসম্পন্ন। সুতরাং তাহাদের অসংযত স্বেচ্ছাচার-প্রভাবিত আসুরিক কার্য্যগুলির দ্বারা তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই ভগবদ্বিদ্বেষ কার্য্যেই নিযুক্ত হয়। তাহারা নিজেই মায়া কবলিত হইয়া এক একজন স্বকপোল-কল্পিত কৃষ্ণ বা শিশুপালের আনুগত্যে কৃষ্ণের প্রতিযোগী হইয়া জগৎকে ভোগ করিবার বহু প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের ঐ মিথ্যা ভোগাশা মায়া-কল্পিত; ঐ সকল ভোগ কল্পনা তাহাদিগকে যথেষ্ট প্রতারণা করে। কিন্তু তত্রাচ সেই অপহৃত জ্ঞান মূঢ় কর্ম্মিগণ ভোগের আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহাদের নিজ কর্ম্মের ব্যর্থতায় যে ত্যাগের ছলনা, তাহাও এক মায়া-কল্পিত বৃহৎ ভোগের পরিকল্পনা মাত্র।

ফলভোগাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মি-সম্প্রদায় বহু কষ্টসাধ্য কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানকালে, মায়াকল্পিত বলীবর্দ্দের ন্যায় ভ্রমণ করে, কিন্তু মনে মনে ঠিক করিয়া রাখে যে, সে-ই ভোক্তা। এই প্রকার বিকারগ্রস্ত মতিভ্রান্ত কর্ম্ম সঙ্গীদিগের বুদ্ধি বিপর্য্যয় না ঘটাইয়া তাহারা যে যে কর্ম্মে অত্যন্ত

প্রবীণ, তাহাদিগকে সেই সেই কর্ম্মে কেন্দ্রীভূত কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নিযুক্ত করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সেইপ্রকার কার্য্যের দ্বারা তাহাদের নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ ক্রমবিকাশ লাভ করিবে, তাহাই বিদ্বানগণের কর্ম্ম কৌশল। সেইজন্য কর্ম্মবন্ধনমুক্ত কৃষ্ণদাসগণ লোক-শিক্ষার জন্য, লোকের পরম মঙ্গল বিধানার্থে নিজেই সাধারণ আসক্তিসম্পন্ন কর্ম্মীর ন্যায় অবস্থান করিয়া কর্ম্মযোগ আচরণ করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় ভক্ত অর্জ্জুন যদি কৃপা করিয়া এই প্রকার কর্ম্মযোগ শিক্ষা না দিতেন, তাহা হইলে বিভ্রান্ত জীব সমুচ্চয় অনন্তকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মচক্রে পতিত হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিত। মায়ার দ্বারা গলায় বাঁধা দীন কর্ম্মসঙ্গিগণ যে পরিমাণে অনন্ত প্রকার ক্লেশ পায়, তাহা তাহারা মায়া-প্রভাবে হৃতজ্ঞান হইয়া বুঝিতে পারে না। তাহারা যতই কর্ত্তৃত্বের অভিনয় করুক না কেন, সর্ব্ব সময়েই তাহারা যে মায়ার দ্বারা বিতাড়িত, এ-বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—

*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্বশঃ।*
*অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥*

(*গীতা* ৩/২৭)

অবিদ্বান কর্ম্মসঙ্গী বুঝিতে পারে না যে, যেহেতু সে কৃষ্ণকে ভুলিয়া নিজেই মায়াকল্পিত কৃষ্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছে, সেইহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই গুণময়ী মহামায়া (দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া) তাহাকে (কর্ম্মীকে) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি গুণরূপ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া বহুপ্রকার কর্ম্মের ফাঁদ পাতিয়া, তাহাকে হাবুডুবু খাওয়াইতেছেন। সমস্ত কর্ম্মই কর্ম্মীর গুণগত ভোগাকাঙ্ক্ষার অনুরূপ মায়াপ্রকটিত হইলেও, মূঢ় কর্ম্মসঙ্গিগণ নিজেকে কর্ত্তা মনে করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখদুঃখ ভোগাগার গুছাইয়া বসে।



ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জানাইয়াছেন যে, জীবমাত্রই তাঁহার বিভিন্ন অংশ স্বরূপ। অংশের কাজ পূর্ণের সেবা। পূর্ণ শরীরের অংশ—হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি। হস্ত পদ পরিশ্রম করিয়া উদরে খাদ্য দ্রব্যাদি না দিয়া নিজেই কখনও ভোগ করিতে চাহে না, বা তাহা কোন দিনই সম্ভব হয় না। বরং হস্তপদাদি যদি সেইপ্রকার অপচেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই কার্য্যের পরিণাম বিকৃত অবস্থায় পরিণত হয়। ফলে হস্তপদাদির ত' কোন প্রকার ভোগের সুবিধাই হয় না, বরং উদর পূর্ত্তির অভাবে হস্তপদাদি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়।

হিতোপদেশে *'উদরেন্দ্রিয়াণাম্'* গল্পে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগৎ-রূপ বিরাট শরীরের প্রাণ-স্বরূপ। 'তিনি জগৎ-বৃক্ষের মূল স্বরূপ'—একথা গীতায় বিভিন্ন প্রকারে বার বার বলা হইয়াছে। বিশেষভাবে বলা আছে যে—*'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়', 'অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ,' 'ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ'* ইত্যাদি। সুতরাং 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র পরমেশ্বর,' এবং 'জীবমাত্রই তাঁহার নিত্য সেবক'—এ বিষয়ে আর তর্ক করিবার কি থাকিতে পারে? আমরা এই সাধারণ কথাটি ভুলিয়া গিয়া আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া নিজে-নিজেই ছোটখাটো জগন্নাথ সাজিয়া জগৎকে ভোগ করিবার আশায় মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাই মায়া বা ভ্রম। জগন্নাথকে বাদ দিয়া জগতের যে সেবা, তাহা বাতুলতা মাত্র।

আজকাল রামরাজ্য-পরিষদের কিছু কিছু কার্য্যকলাপ দেখা যায়। কিন্তু রামরাজ্যে রামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। রাবণের গোষ্ঠী রামকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। সেইপ্রকার অপচেষ্টার মধ্যে রামরাজ্য কিভাবে স্থাপিত হইবে তাহা আমরা বুঝি না।

রামরাজ্য স্থাপিত করিতে হইলে জগতের সমস্ত বস্তু শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় লাগাইতে হইবে। রামকে বা রামের বিলাসকে খর্ব্ব করিবার

চেষ্টা—রাবণের রাজ্যের কথা। সেইপ্রকার ভুল হইলে রাবণগোষ্ঠী, রাম-সেবক বজ্রাঙ্গজীর দ্বারা বিপর্যস্ত হয়। সেইপ্রকার ভুল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-উপদিষ্ট কর্ম্মযোগের আশ্রয় গ্রহণীয়।

মূঢ় কর্ম্মসঙ্গিগণ যেমন অবিদ্বান, তত্ত্ববিদ্গণ ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ তাঁহারা বিদ্বান সম্প্রদায়। সেই তত্ত্ববিদ্গণ জানেন যে, প্রকৃতিগত গুণ-কর্ম্ম আত্মতত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সেইজন্য তাঁহারা অবিদ্বানগণের মত গুণ-কর্ম্মের সঙ্গ না করিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই দেহাভিনিবেশ হইতে পৃথক থাকিয়া আত্মধর্ম্ম উন্মিষিত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা বুঝেন যে, ঘটনা বশতঃ জীবের জড় প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ, সুতরাং চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদি জড়েন্দ্রিয়গুলি জড় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তত্ত্ববিদ্গণ সর্ব্বদাই সেইসকল কার্য্য হইতে পৃথক অবস্থান করেন।

*তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণ-কর্ম-বিভাগয়োঃ ।*
*গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥*

(*গীতা* ৩/২৮)

এই প্রকার মুক্ত অবস্থা লাভ করিবার যে উপায়, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে উপদেশ করিয়াছেন।

যথা—

*ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।*
*নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥*
*যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।*
*শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥*

(*গীতা* ৩/৩০-৩১)



'আমি শরীর বা মন', বা 'আমি প্রাকৃত বস্তু' এবং 'আমার শরীর সম্পর্কিত সমস্ত জিনিসই আমার'—এই প্রকার তত্ত্ব-জ্ঞানহীন বিচারই আমাদের বিদ্বান্ হইতে দেয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্য আমাদের অধ্যাত্ম-চেতা আত্মস্থ হইতে পরামর্শ দিলেন। অধ্যাত্ম-চেতা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, আমি প্রাকৃত শরীর বা মন নহি; পরন্তু আমি—পরা প্রকৃতি-সম্ভূত চিদ্বস্তু। চিত্তত্ত্বের উপলব্ধিতেই জড়তত্ত্বে সহজেই নির্ম্মলতা উপস্থিত হয়। এবং ক্রমশঃ চিত্তত্ত্বের নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলে আমরা প্রাকৃত মাত্রাস্পর্শ সংঘটিত সুখ দুঃখ হইতে বিগতজ্বর হইতে পারি। প্রাকৃত অহঙ্কার তখন সহজেই প্রশমিত হয় এবং সেই অহঙ্কারাবসানেই সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আমরা তৎপর অর্থাৎ সেই পরমতত্ত্ব বস্তুর সম্বন্ধে জড়মুক্ত হইয়া এবং স্বচ্ছ-নির্ম্মল হইয়া ভবমহাদাবাগ্নির জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে সেই পরতত্ত্ব, এ-বিষয়ে সকল শাস্ত্রেই প্রমাণ আছে। এমন কি, ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশে যে বাইবেল ও কোরাণাদি শাস্ত্র আছে, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব বলিয়া ঘোষিত আছেন। ভগবদ্গীতার ত' কথাই নাই, কারণ সেখানে পরতত্ত্বের নিজের উক্তিই আছে *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়* ইত্যাদি। অতএব তাঁহার সহিত সম্পর্কিত হইতে পারিলেই আমাদের চিত্তসূর্য্যের দর্শন লাভ ঘটে। সূর্য্য উদিত হইলে সূর্য্যের কিরণেই সমস্ত জিনিস সঠিক প্রকাশিত হয়। শুদ্ধসত্ত্ব আকাশে কৃষ্ণ-সূর্য্য উদিত হইলেই মায়ান্ধকার স্বতঃই দূরীভূত হইয়া যায় এবং মায়ান্ধকার অপসারণেই তৎপরত্বে নির্ম্মল হওয়া যায়। এই সমস্ত কথা দুষ্কৃতি মূঢ়গণের নিকট 'অর্থবাদে' পরিণত হইলেও ইহা কোন আজগুবী ছেলেখেলার কথা নহে, পরন্তু বাস্তব সত্য। যাঁহারা কৃষ্ণের বা কৃষ্ণদাসের আনুগত্য করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল বিষয় উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু

যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হিংসা করিয়া নিজেই কৃষ্ণ হইবার ছলনা করেন, সেইপ্রকার বিকৃতমস্তিষ্ক বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ এই মতে মত দেন না। সেই সকল অবজ্ঞাকারী ব্যক্তিগণ অত্যন্ত মূঢ়—*অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।* ইহারাই কৃষ্ণকে হিংসা করেন। ইহাদের মায়াবাদ-বিপর্য্যস্ত মস্তিষ্কে কৃষ্ণতত্ত্ব সহজে প্রবেশ করিতে চাহে না।

# ভগবদ্ভক্তের মহিমা

শ্রদ্ধাবান সুকৃতিসম্পন্ন সরল বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যাহা লেখা আছে তাহাই বুঝেন। সেই সকল সরল কথাগুলি সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশিত। তাহা মায়াবাদ অন্ধকারে লুকায়িত হয় না। সেই সকল কথার গৌণ অর্থ করিয়া তথাকথিত 'আধ্যাত্মিক'-অর্থ টানিয়া আনিবার অপচেষ্টা হয় না। কৃষ্ণদাসগণই এই প্রকার মত বা কর্ম্মযোগ—*ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য* ইত্যাদি বিচার সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়া এবং আচরণ করিয়া কর্ম্মবন্ধন-রূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

সেই প্রকার শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ কোন দেশ বিশেষে, জাতি-বিশেষে বা সমাজ-বিশেষে আবদ্ধ নহেন। ভগবদ্ভক্ত কার্ষ্ণগণ জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ বা দেশ-নির্বিশেষেই সম্ভাবিত হন। ভগবান্ কোনও মনুষ্য নির্ম্মিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহেন। অতএব গীতার কথা জগতে সকল প্রকার মনুষ্য—জাতিই গ্রহণ করিতে পারিবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা শাস্ত্রেই নির্ব্বিকল্প বলিয়াছেন—

*মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।*
*স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥*

(*গীতা* ৯/৩২)

অর্থাৎ "হে পার্থ! অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি-নীচ বর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্যভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।" কৃষ্ণ সম্বন্ধে অপস্বার্থ-পরায়ণ আসুরিক মতে জাতিবর্ণাদি সম্বন্ধে যে ব্যভিচার চলিতেছে, তাহা কখনই প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

শাস্ত্রসম্মত জাতিবর্ণ সম্বন্ধেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।*
*তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥*

(*গীতা* ৪/১৩)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি চারি বর্ণ কোন জন্মগত ব্যাপার নহে। পরন্তু গুণ এবং কর্ম্মানুসারে বিভক্ত। যেমন কোন 'ডাক্তার' বা চিকিৎসক হওয়া কোন জন্মগত ব্যাপার নহে। পরন্তু গুণ এবং কর্ম্মগত ব্যাপার। ত্রিগুণময়ী জগতে গুণগত, কর্ম্মগত জাতিভেদ সর্ব্বত্রই অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি পর্য্যায়ভুক্ত হওয়া কোন দিনই জন্মগত ব্যাপার ছিল না। গুণ ও কর্ম্ম বিভাগেই চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি।

চিকিৎসক যেমন সকল দেশে সকল সময়েই বর্ত্তমান থাকে, সেই প্রকার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ সকল দেশে এবং সকল সময়েই বর্ত্তমান। চিকিৎসকের পুত্র হওয়া যেমন চিকিৎসকের কারণ নহে, সেইপ্রকার ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের পুত্র হওয়া তত্তৎ বর্ণের অভিব্যঞ্জক নহে। বর্ণাভিব্যঞ্জক লক্ষণ সমস্ত শাস্ত্রেই কথিত আছে। অতএব আমরা যে চক্ষে ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে কোন দেশ বা জাতি হিসাবে দর্শন করি, তাহা যে ভুল দর্শন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? শৌক্রগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ভারতের সভ্যতা কূপমণ্ডূকের ন্যায় না রাখিয়া যদি ব্রাহ্মণ্যের উদারতায় ভারতে ঋষিগণের বাণী সমস্ত জগতে প্রচার করা হইত, তাহা হইলে জগতে আজ সুখ শান্তির অভাব থাকিত না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিস্তারে জগতে সুখ শান্তির অভাব থাকিত না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিস্তারে জগতে সুখ ও শান্তিলাভ ঘটে। কিন্তু তাহা না করিয়া চিকিৎসকের পুত্রই চিকিৎসক হইবে (গুণ ও কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়াও)—



এই প্রকার ভুল, শৌক্র-বিচারের অধীন করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে ভারতে খর্ব্ব করিয়া জগতের বহু অমঙ্গল করা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে জৈব ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়া জগতের প্রচুর সুখ-শান্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ভাগ্যবান ব্যক্তি সেই দৈব-বর্ণাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারিবেন।

আসুরিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, আর ভগবৎ-প্রণীত দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। শাস্ত্রোক্ত বর্ণবিভাগ সকল দেশে এবং সকল সময়েই এক। শাস্ত্র-চক্ষু দ্বারা দর্শন করিলে জগতের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারিবর্ণ দৃষ্ট হইবে। গুণ-কর্ম্ম-বিভাগে ব্রাহ্মণের লক্ষণযুক্ত মনুষ্য অল্পবিস্তর সকল দেশেই দৃষ্ট হইবে। সকল দেশেই সেই প্রকার গুণ-কর্ম্ম-বিভাগে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-বর্ণও দৃষ্ট হইবে। সুতরাং সকল দেশে সকল সময়েই এইভাবে গুণকর্ম্ম বিভাগীয় চাতুর্ব্বর্ণ চিরদিন আছে, চিরদিনই পূর্ব্বে ছিল এবং পরেও থাকিবে।

যাঁহারা মনে করেন যে, কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণের অস্তিত্ব আছে, তাঁহারা সকলেই ভ্রান্ত। কলির প্রভাবে সকলেই শূদ্র এবং শূদ্রাধম হইয়া যাইবে—এইরূপ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত থাকিলেও ভারতবর্ষে যেমন কিছু কিছু ব্রাহ্মণাদি গুণগত উচ্চবর্ণের মনুষ্য দেখা যায়, সেই প্রকার সর্ব্বদেশেই আছে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সকল দেশেই গুণ-কর্ম্ম বিচারে এই চারিবর্ণের অস্তিত্ব আছে। গুণ-কর্ম্ম হিসাবে শূদ্রাধম চণ্ডালেরও ভগবদ্ভক্তির অধিকার আছে। ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ চণ্ডাল-বংশজাত ব্যক্তিও যে, গুণপ্রভাবে সকলের পূজা হয়, এ বিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে—*ন মেহভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ* ইত্যাদি। ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ ব্রাহ্মণও যে-গতি লাভ করেন, ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালও সেই সব প্রাপ্ত হন। *চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ*। চণ্ডাল-বংশজাত হরিভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। তিনি

যে, ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারেন ইহার প্রমাণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যবর্গ আমাদের দর্শন করাইয়াছেন। গুণ-কর্ম্মবিভাগে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-বিভাগ। কিন্তু যিনি হরিভক্তি-পরায়ণ, তিনি নির্গুণ বস্তু, অর্থাৎ জড় গুণাতীত। গুণাতীত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিলেও যথেষ্ট হয় না। অতএব ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিলেই সকলে সকল দেশে সকল সময়েই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের অধিকারী হইতে পারেন। ভগবদ্গীতা হইতে আমরা এই শিক্ষা প্রচুরভাবে প্রাপ্ত হই।

অতএব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে যেখানে অবস্থান করুন না কেন, তাঁহারা যদি ভগবানের কথা অনুযায়ী গীতা-শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সমস্ত কর্ম্মেই ব্রহ্ম-সমাধি বা চিন্ময়ত্ব লাভ করেন এবং তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়া যান। যথা,—

*ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।*
*ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥"*

(*গীতা* ৪/২৪)

বিষ্ণু প্রীত্যর্থে যজ্ঞরূপী কর্ম্মদ্বারা কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ কল্পনায় *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—বাক্যের দ্বারা জগতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অবতারণা করিয়া যে বিচার-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন, তাহারই সম্যক্ অন্বয় এই সূত্রে বিচারিত হইয়াছে। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম কিভাবে হইতে পারে, তাহার বিচার করা আবশ্যক এবং জনকাদি মহাজনগণ কিভাবে কর্ম্ম-যোজনা করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সর্ব্বযজ্ঞের মূল-তত্ত্ব বিষ্ণু-প্রীতি বা কৃষ্ণসেবা। আমাদের বদ্ধাবস্থায় শরীর-যাত্রা-নির্ব্বাহাদি সমস্ত কার্য্যেই বা সমস্ত বস্তুতেই জড় সম্বন্ধ অনিবার্য্য। কিন্তু সেই সকল কার্য্যে যদি ব্রহ্মভাব *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যই ব্রহ্মের জন্য বা ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয়—এই প্রকার চিদালোচনা সম্বলিত হয় এবং



উপযুক্ত আচারবান্ ব্যক্তিদ্বারা সেই সকল কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সংশোধিত হইয়া পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত কার্য্যই 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মভাব, চিদ্ভাব বা ভগবদ্ভাব আবির্ভূত হইলেই জড়ের জড়ত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং তখনই *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* বিচারের সার্থকতা ঘটায়। সেবানুকূল সমস্ত বিষয়ই 'মাধব'—বৈষ্ণবগণ এই বিচার গ্রহণ করিয়া থাকেন। লৌহ যেরূপ অগ্নিসংযোগে অগ্নিময় হইয়া যায় এবং তখন লৌহের লৌহত্ব স্তব্ধ হইয়া অগ্নির কার্য্য করে, সেইপ্রকার বিষ্ণু-সম্বন্ধে বা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে বা যজ্ঞার্থে যাহা কিছু সম্পন্ন হয়, তৎ সমস্তই ব্রহ্মতত্ত্ব বা চিত্তত্ত্ব জানিতে হইবে।

*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।*
*শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥*

(*গীতা* ১৪/২৭)

ইত্যাদি বিচারে ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতি স্বরূপ। ব্রহ্মতত্ত্ব তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যেখানে কৃষ্ণসেবা বর্ত্তমান, সেখানে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* বিচারের উৎকর্ষই সাধিত হয়। অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা এবং ফল এই পাঁচটি যাজ্ঞিক তত্ত্বই যখন কৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্রহ্মাধিষ্ঠান প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা প্রকৃত 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়। যজ্ঞই বিষ্ণুপ্রীতি বলিয়া বিষ্ণু-প্রীতিই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ এবং তাহাই যথার্থ ব্রহ্ম-সমাধি বলিয়া পরিগণিত।

সেইপ্রকার যাঁহারা সকল কার্য্যই 'নির্ব্বন্ধ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে' করেন, তাঁহারা ব্রহ্মসমাধি লাভ করিবার অর্থাৎ 'চিত্ত-দর্পণ-মার্জ্জন' ও 'ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ' করিয়া বিশুদ্ধাত্মা হইয়া যান। তাঁহারা 'অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি' 'বিমুক্তমানী' মায়াবাদী অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থিত। তাঁহাদের আর অধঃপতনের সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা বিজিতাত্মা এবং জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী। তাঁহারাই পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন এবং তাঁহারাই

জগতের প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারেন। *ঈশ-তন্ত্রে* বলা হইয়াছে, বদ্ধ জীবগণ জগতের কোনই উপকার করিতে পারেন না। সেই প্রকার কর্ম্মযোগারূঢ় ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই মুক্তাবস্থায় অবস্থান করেন। যথা—

*যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।*
*সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥*

(*গীতা* ৫/৭)

বিশুদ্ধাত্মা কর্ম্মযোগীর বিরুদ্ধাচারিগণ অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানের সহিত যোগযুক্ত নহেন এবং তজ্জন্য চিত্তের বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারেন নাই, এরূপ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর যথেচ্ছাচার সাধন করিয়া সমস্তই "ভগবান্ করাইতেছেন"—এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন। সেইপ্রকার মায়াবাদদুষ্ট ও নাস্তিক জৈনগণের ছলনা সমস্তই ভগবানের কার্য্য বলিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারকে সমর্থন করেন। তাঁহারা 'সবই ভগবানের কার্য্য' এই লেবেল দিয়া নিজ দুষ্কার্য্যগুলির সমর্থন দ্বারা জগতের প্রভূত অহিতসাধন করেন। যাঁহারা বিশুদ্ধাত্মা, তাঁহাদের মন, প্রাণ সর্ব্বদাই কৃষ্ণপাদপদ্মে নিযুক্ত থাকে। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ* ইত্যাদি বিচারে তাঁহারা উপরোক্ত প্রাকৃত অপসম্প্রদায়কে দূর হইতে নমস্কার করেন। বিশুদ্ধাত্মাগণ জানেন যে, জীব অণুচৈতন্য হইলেও তাহার 'অণু-স্বাতন্ত্র্য' সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। ভগবান্ স্বরাট্, পূর্ণস্বতন্ত্র এবং পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী হইলেও জীবের সহজাত 'অণু-স্বাতন্ত্র্য'কে নষ্ট করিয়া দেন না। জীব নিজেই সেই ভগবৎ-প্রদত্ত অণু-স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মের অপব্যবহার করিয়াই অবিদ্যারূপ মায়াকে আশ্রয় করে এবং মায়ার আশ্রয়েই জীবের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি প্রাকৃত স্বভাব, জড়গুণ উৎপন্ন হয়। সেই সকল প্রাকৃত গুণসমূহের অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব প্রকৃতির গুণ-বিতাড়িত হইয়া নূতন স্বভাব লাভ করে এবং তদ্ভাবানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে



জগতে সমস্ত কার্য্যেই জড় বৈচিত্র্য লক্ষিত হইত না। এই সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকৃতিগত নিয়ম বা বিচার না জানিয়া "পরমেশ্বর হইতে সমস্ত কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে" অথবা "লোকের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম-যোজনা পরমেশ্বর দ্বারা হয়"—এই সমস্ত বিচার অবতারণা করিলে পরমেশ্বরের বৈষম্য এবং নৈর্ঘৃণ্য স্বীকার করিতে হয়। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় একজন এক কাজ করিয়া দুঃখ পায়, আর একজন সেই কাজ করিয়া বা অন্য কাজ করিয়া সুখ ভোগ করে—এরূপ বৈষম্য তাঁহাতে কদাচিৎ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। তিনি বরং সকলকেই জড় বৈষম্যযুক্ত সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিতেই উপদেশ দিয়া থাকেন। ভগবদ্বিস্মৃতির ফলে জীবের অনাদি-বহির্ম্মুখতা-প্রযুক্ত অবিদ্যার স্বভাবজাত কর্ম্ম উদ্ভূত হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতায়—

*ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।*
*ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥*

(*গীতা* ৫/১৪)

অতএব যজ্ঞার্থে যে সকল কর্ম্ম করা হয়, সে-সমস্ত ব্যতীত সমস্ত কর্ম্মই জীবের স্ব-স্বভাবজ স্ব-কপোল-কল্পিত স্বেচ্ছাচার। সেইপ্রকার স্বেচ্ছাচার যে কর্ম্ম, তাহাতে ভগবানের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মফল-সংযোগ কিছুই নাই। সে-সকল কর্ম্ম প্রকৃতির গুণজাত, সুতরাং তাহা প্রকৃতিরই অনুগত। ভগবান্ সেইসকল কর্ম্মের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র!

কর্ম্মযোগীর সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্মসমাধিযুক্ত বলিয়া কর্ম্মযোগী সর্ব্বদাই গুণাতীত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত। গুণাতীত অবস্থায় জগদ্দর্শন হয় না, পরন্তু তাহা জগন্নাথ সম্বন্ধেই দর্শন হইয়া থাকে। সেই জগন্নাথ সম্বন্ধীয় দর্শনে সত্ত্ব-রজোস্তমঃ প্রভৃতি গুণসমষ্টি কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটায় না। কর্ম্মযোগীর কৃষ্ণসম্বন্ধে দর্শনই গুণাতীত সাম্য দর্শন। যথা—

*বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।*
*শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥*
*(গীতা ৫/১৮)*

বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ শরীর—তাহা সত্ত্বগুণ প্রধান। পশুদিগের মধ্যে যে গো-শরীর—তাহাও সত্ত্বগুণ প্রধান; হস্তি, সিংহ প্রভৃতি শরীর—রজোগুণ প্রধান; আবার কুক্কুরাদি এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে চণ্ডালাদির শরীর—তমোগুণ প্রধান। যাঁহারা ভগবদ্ভাবে বিভাবিত কর্ম্মযোগী—তাঁহারা এই সকল গুণগত শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া শুদ্ধ শরীরকেই দর্শন করেন। —ইহাই কৃষ্ণসম্বন্ধে সমদর্শন। তাঁহারা দেখেন, জগতের সমস্ত বস্তুই ভগবৎসেবার উপকরণ এবং প্রত্যেক জীবমাত্রই নিত্য কৃষ্ণদাস। সেই কৃষ্ণদাসত্বকে জড়শরীরাবরণে ব্যাঘাত প্রাপ্ত না করাইয়া সমস্ত দ্রব্যসম্ভার, সমস্ত জীবনিচয়কে যজ্ঞার্থে বা বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে নিয়োজিত করাই—সমদর্শনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কর্ম্মযোগী জানেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত দ্রব্য সম্ভারের একমাত্র ভোক্তা এবং সমস্ত জীবনিচয়ের একমাত্র প্রভু। জীবনিচয় এই কৃষ্ণসম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়াই মায়ার প্রভাবে নিজে যে বৃথা ভোগী বা ত্যাগী সাজিবার অভিনয় করে, তাহার মূলে ভিত্তিহীন ভ্রম মাত্র। এই প্রকার ভোগ বা ত্যাগের অভিনয় করাই ভবরোগ। সমস্ত প্রকার শুভকর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, বৈরাগ্য প্রভৃতি যাহা কিছু জগতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা যদি ভগবানের কথায় রতি উৎপাদন না করে তবে তাহা কেবল পণ্ডশ্রমেই পর্য্যবসিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।*
*সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥*
*(গীতা ৫/২৯)*



যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিবার উপদেশ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সকল যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা যে মূল পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তাহা এখন সুস্পষ্ট হইল। কর্ম্মীদিগের কৃত যজ্ঞ এবং জ্ঞানীদিগের কৃত তপস্যাসমূহের ভোক্তা বা পালয়িতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জানিতে হইবে। যোগীদিগের উপাস্য যে অন্তর্য্যামী পরমাত্মা, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা কলা। এ সমস্ত বিষয় পরে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। শ্রীকৃষ্ণই কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত সর্ব্বভূতেরই একমাত্র সুহৃদ্। তিনি সকলেরই সুহৃদ্ বলিয়া তাঁহার নিজ জন দ্বারা ভগবদ্ভক্তি দেশ-কাল-পাত্রাদির উপযোগী করিয়া, যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। তিনিই সর্ব্বলোক-মহেশ্বর আদিপুরুষ, সর্ব্বকারণের কারণ শ্রীগোবিন্দ। সেই শ্রীগোবিন্দকেই বিশুদ্ধ কর্ম্মযোগদ্বারা ক্রমপন্থায় জানিতে পারিলে জীবনিচয় পরম শান্তি লাভ করিবে।

যাঁহারা যজ্ঞার্থে বা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পৃথকভাবে আর কৃষ্ণেতর অন্যাভিলাষময়ী যজ্ঞ তপস্যা বা ধ্যান ধারণা ইত্যাদি করিতে হয় না। পূর্ব্বে আমরা যেমন বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগিগণের ব্রাহ্মণত্ব, সন্ন্যাসীত্ব, যোগীত্ব ইত্যাদি সমস্তই একাধারে অনুস্যূত থাকে, সেইপ্রকার তাঁহাদের ভিতর কর্ম্মীর যজ্ঞ-দক্ষতা বা কর্ম্ম-নৈপুণ্য, জ্ঞানীর সন্ন্যাসগ্রহণ, যোগীর নিষ্ক্রিয়তা বা দৈহিক ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টাশূন্যতা ইত্যাদি একাধারে বর্ত্তমান থাকে। সমস্ত কর্ম্মযজ্ঞ তপস্যার ফলে নিষ্কাম হইয়া, যিনি ভগবৎ-প্রেমী হইয়া অখিল রসের ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন, তিনি একাধারে সমস্ত গুণের গুণী। যথা—

*অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ ।*
*স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥*
*(গীতা ৬/১)*

যেহেতু কৃষ্ণই তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মফলের ভোক্তা হইয়া যান, সেইহেতু নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর কোনপ্রকার কর্ম্মফলের আশ্রয় নাই। তিনি 'কৃষ্ণের জন্য এই কার্য্য করিতে হইবে'—এইপ্রকার অনুজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। সেই প্রকার নিষ্কাম কর্ম্মযোগী কৃষ্ণার্থে কোন কর্ম্মই ভোগ বা ত্যাগের যোগ্য বলিয়া মনে করেন না। সন্ন্যাসীগণ ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার জন্য বা তৎপ্রীতির জন্য সমস্ত শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন। যোগিগণ সমস্ত কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সেই পরমাত্মার দর্শনলাভার্থ অর্দ্ধ নিমীলিত অবস্থায় জীবন ধারণ করেন। নিরগ্নি বা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয় এবং অক্রিয় বা দৈহিক চেষ্টাশূন্য হইয়া যোগী হয়। কিন্তু যাঁহারা যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিজ দেহ-সম্বন্ধে কোন চেষ্টাই বর্ত্তমান থাকে না। ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত থাকেন বলিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রোক্ত কোনপ্রকার কার্য্যকর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং অনাশ্রিত কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগীই শ্রেষ্ঠ। অক্রিয় সন্ন্যাসীর ব্রহ্মজ্ঞান এবং যোগীর অষ্টসিদ্ধি সর্ব্বদাই তাঁহার করতলগত হইয়া থাকে।

প্রকৃত কর্ম্মযোগিগণ ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন কিছুই নহে। সেইপ্রকার কর্ম্মযোগিগণ সর্ব্বতোভাবে নির্ভুল লাভবান বলিয়া জয়, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার আদৌ ভিখারী নহেন। যে লাভের দ্বারা অন্বয়-ব্যতিরেকে সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বজ্ঞান এবং সর্ব্বসিদ্ধি পরিপূর্ণভাবে অনায়াসে করতলগত হয়, যাঁহারা সেই প্রকার লাভের উপযোগী তাঁহাদের আর অন্যলাভে প্রয়োজন কি?

অক্রিয় যোগিগণ যাঁহারা পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্রানুসারে ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়ামাদি করতলগত করিয়া পরিশেষে সমাধিলাভের চেষ্টা করেন, তাঁহারাও সেই প্রকার ধ্যানধারণাবস্থিত হইয়া সেই পরমাত্মা দর্শন করিবার নিমিত্তই সকল প্রকার দুঃখ সহ্য করিয়াও অবিচলিত থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা এমন একটি বস্তু লাভ করেন বা লাভ



করিবার চেষ্টা করেন যাহা জগতের আর কোন বস্তুরই তুল্য হয় না। ব্যতিরেকভাবে সেইপ্রকার লভ্যাংশের ভাগী হইবার জন্য জগতের কোন দুঃখই এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও গুরুতর বলিয়া মনে হয় না। সেইপ্রকার যোগিগণ-সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন—

*যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।*
*যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥*
*(গীতা* ৬/২২)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত শ্লোকের যে তাৎপর্য্য দিয়াছেন, তাহা এইরূপ— 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ',— 'যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ' ইত্যাদি। বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্করহিত হইয়া সমাধিস্থ অবস্থায় আত্মকারা বুদ্ধিগ্রাহ্য আত্যন্তিক সুখলাভ হয়। সেই বিশুদ্ধ আত্মারামী যোগীর চিত্ত আর তত্ত্ববস্তু হইতে কোনপ্রকারেই বিচলিত হয় না। যোগিগণ যে অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, সিদ্ধি, ঈশিতা, বশিতা, প্রাকাম্য, ইত্যাকার অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা যোগাবস্থায় অবান্তর ফলমাত্র। সমাধি অবস্থায় সে-সমস্ত লাভও অতি তুচ্ছ বলিয়া স্থির হয়। অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটি বা দুইটি সিদ্ধিলাভ করিয়া অনেকেই যোগসিদ্ধির ছলনা করিয়া চিত্তচাঞ্চল্যে পতিত হইয়া যায়। তাহাতে চরমসিদ্ধি যে সমাধি তাহা লাভ হয় না। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মযোগী ভক্তের সেরূপ সম্ভাবনা নাই। কারণ কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে কার্য্যসমূহে ভক্তের চিত্তনিরোধ হইয়া যায়। স্বতঃই তিনি যোগীর পরম সিদ্ধি 'সমাধি' লাভ করেন। কৃষ্ণসেবার্থে তাঁহাদের যোগসিদ্ধি নব নবায়মান হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং সেই সেবায় যে কি অপ্রাকৃত লাভ আছে তাহা প্রাকৃত 'বণিক্‌বৃত্তি'তে বুঝা যায় না।

কর্ম্মযোগীর কথা বাদ দিয়াও সাধারণ যোগি-সম্প্রদায়ের যোগসিদ্ধির অগ্রসরপথে সমাধিপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অগ্রসর না হইতে

পারিলেও, যতদূর অগ্রসর হওয়া যায় তাহাও বৃথা যায় না। শরীর ধ্বংসের সহিত প্রাকৃত সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন বা তত্ত্বিদ্যালাভ সকল পরিশ্রমই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু শুদ্ধকর্ম্মযোগীর ভক্ত্যন্মুখী কর্ম্মাদি শরীর ও মনকে অতিক্রম করিয়া আত্মা ও পরমাত্মা সম্পর্কে সাধিত হয় বলিয়া, তাহা আত্মার সম্পদ্ হইয়া, শরীর নাশ হইলেও যেমন আত্মার নাশ হয় না, সেইপ্রকার তাহাও কদাচিৎ নষ্ট হয় না। সেইজন্য ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগিগণ যে আত্ম কল্যাণকর কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেরই সম্পদ হইয়া বর্ত্তমান থাকে। সেইপ্রকার সম্পদের কোনদিনই নাশ হয় না। যথা—

*পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।*
*ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥*

(*গীতা* ৬/৪০)

উক্ত শ্লোকের অর্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যেরূপ জানাইয়াছেন, তাহা এইরূপ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ! ইহকালে লোকে অর্থাৎ প্রাকৃত লোকে, পরলোকে অর্থাৎ অপ্রাকৃত লোকে কখনই যোগানুষ্ঠান কর্ত্তার বিনাশ হয় না; কল্যাণপ্রাপক যোগ-অনুষ্ঠাতার কখনও দুর্গতি হইবে না। মূল কথা এই যে, মানব-সকল দুইভাগে বিভক্ত—'বৈধ' ও 'অবৈধ'। যে সকল ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয়মাত্র তৃপ্তি করে, এবং কোন বিধির বশীভূত নয়, তাহারা পশুদিগের ন্যায় বিধিশূন্য। সভ্যই হউক আর অসভ্যই হউক, মূর্খই হউক বা পণ্ডিতই হউক, দুর্ব্বল হউক আর বলবান হউক' অবৈধ ব্যক্তির আচরণ সর্ব্বদাই পশুতুল্য। তাহাদের কার্য্যে কোনপ্রকার কল্যাণলাভের সম্ভাবনা নাই। বৈধ নরগণকে 'কর্ম্মী' 'জ্ঞানী' ও 'ভক্ত' এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কর্ম্মিগণকে 'সকাম-কর্ম্মী' ও 'নিষ্কাম-কর্ম্মী'—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।



সকাম কর্ম্মিসকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র সুখান্বেষী অর্থাৎ অনিত্য-সুখাভিলাষী। তাহাদের স্বর্গাদিলাভ ও সাংসারিক উন্নতি আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত সুখই অনিত্য। অতএব যাহাকে জীবের পক্ষে 'কল্যাণ' বলা যায়, তাহা তাহাদের প্রাপ্য নয়। জীবের জড়-বন্ধন মোচনান্তর নিত্যানন্দ-লাভই কল্যাণ। সেই নিত্যানন্দ-লাভ যে পর্ব্বে নাই সে পর্ব্বই 'ফল্গু'। কর্ম্মকাণ্ডে যখন সেই নিত্যানন্দ-লাভের উদ্দেশ্য সংযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মকে "কর্ম্মযোগ" বলা যায়। সেই কর্ম্মযোগ-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানলাভ, তদনন্তর ধ্যানযোগ ও চরমে ভক্তিযোগ লাভ হয়। সকাম কর্ম্মে যে সমস্ত আত্মসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্লেশ-স্বীকারের বিধান আছে, তাহা দ্বারা কর্ম্মীকেও তপস্বী বলা যায়। তপস্যা যতই হউক, সে সকলের অবধি ইন্দ্রিয়-সুখ বৈ আর কিছুই নহে। অসুরগণ তপস্যার দ্বারা ফল লাভ করত ইন্দ্রিয়-তর্পণই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ অবধি অতিক্রম করিলে সহজেই জীবের কল্যাণোদ্দেশক কর্ম্মযোগ আসিয়া পড়ে। সেই কর্ম্মযোগস্থিত ধ্যানযোগী বা জ্ঞানযোগী—অধিকতর কল্যাণকারী।"

সেইপ্রকার কল্যাণকারী কর্ম্মযোগিগণ ইহ-জীবনে যতদূর অগ্রসর হয়, পরজীবনে সেই অবস্থা হইতে আরও অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করে। যথা—

*তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্ ।*
*যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥*

(*গীতা* ৬/৪৩)

"হে কুরুনন্দন! তিনি তথায় জাত হইয়া পৌর্ব্বদেহিক বুদ্ধি সংযোগ লাভ করেন; অতএব নৈসর্গিক রুচিক্রমে যোগ সংসিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নবান হন।"

আবার যাঁহারা যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, তাঁহারা সদাচারী ব্রাহ্মণদিগের গৃহে অথবা ধনী বণিকদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

*'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥'*

সাধারণতঃ যোগভ্রষ্ট বলিতে গেলে সকল প্রকার যোগীকেই অর্থাৎ কর্ম্মযোগী, ধ্যানযোগী, জ্ঞানযোগী, হঠযোগী প্রভৃতি সকলকেই বুঝায়। কিন্তু সেইপ্রকার সকল যোগিগণের মধ্যে কর্ম্মযোগিগণ ভগবৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন বলিয়া তাঁহারা অধিকার হিসাবে ভক্তযোগীর পর্য্যায়ে অবস্থিত। উত্তরাধিকারে তাঁহারা কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান সমস্তই 'ঈশাবাস্য' ভূমিকায় অধিরূঢ় বলিয়া তিনি ভক্তযোগী বলিয়া পরিচিত হন। তিনিই সর্ব্বোত্তম যোগী বা মহাত্মা। সেই অনন্যচিন্তাযুক্ত ভগবদ্ভক্ত সকল যোগীর গুরু। যথা—

*যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।*
*শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥*

(*গীতা* ৬/৪৭)

সুতরাং ভগবদ্ভক্তিই সকল প্রকার কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাই এই শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

"যত প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি যোগিগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈধ মানবদিগের মধ্যে সকাম কর্ম্মীকে 'যোগী' বলা যায় না। নিষ্কাম-কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা, ইঁহারা যোগী। বস্তুতঃ-ভাবে ইহা এক বই দুই নয়। যোগ একটি সোপান মার্গবিশেষ, সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। 'নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ' ঐ সোপানের প্রথম ক্রম; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ 'জ্ঞানযোগ' হয়। তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যানযুক্ত হইয়া 'অষ্টাঙ্গযোগরূপ' তৃতীয় ক্রম হয়। তাহাতে ভগবৎ প্রীতি সংযুক্তা হইলে 'ভক্তিযোগরূপ' চতুর্থ ক্রম হয়।



ঐ সমস্ত ক্রম সংযুক্তা হইয়া যে বৃহৎ সোপান, তাহারই নাম 'যোগ'। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ডযোগ-সকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্য-কল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রত্যেক ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করতঃ শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার উপরিস্থিত ক্রমগমনের জন্য পূর্ব্বক্রম-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোনক্রমে আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক হয় না, অতএব যেক্রমে আবদ্ধ থাকেন সেই ক্রমের নামসংযুক্ত একটি খণ্ডযোগেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী, কেহ বা ভক্তযোগী বলিয়া পরিচিত হন। অতএব হে পার্থ! কেবল আমাতে ভক্তি করাই যাঁহার চরম উদ্দেশ্য, তিনি অন্য তিন প্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি সেই প্রকার যোগী অর্থাৎ ভক্তিযোগী হও।"

জড়ক্রমপন্থা এবং চিৎক্রমপন্থা একপ্রকার নহে। জড়-ক্রমপন্থার একটি ক্রমের পর আর একটি ক্রমে যাওয়াই বিধি এবং সেই ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইবার উপায় নাই। যেমন কেহ যদি এম. এ. পাশ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে ক্রমপন্থায় নিম্নশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চশ্রেণীতে পৌঁছাইতে হয়। কেহ যদি মনে করেন, একেবারেই এম. এ. পাশ করিব—তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু চিদ্রাজ্যে সেই প্রকার ক্রমপন্থার বিধিমার্গ বর্ত্তমান থাকিলেও, ভগবানের কৃপা হইলে একেবারেই এম. এ. পাশ করা যায়। ভগবানের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ দ্বারা সেইপ্রকার কৃপা লাভ করা যায়। ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গপ্রভাবে সেই প্রকার সম্বন্ধের উদ্ভব হয়। আমাদের প্রত্যেকের সহিতই ভগবানের নিগূঢ় নিত্য সম্বন্ধ আছে। কিন্তু মায়াসঙ্গ প্রভাবে সেই সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা সকলেই অত্যন্ত ধনীর পুত্র হইয়াও নিজ কর্ম্মদোষে পথে পথে ঘুরিতেছি। দারিদ্র্যের কবলে

নিষ্পেষিত হইতেছি। এ বিষয় আমরা সকলেই ভালরূপ বুঝিতে পারি। কিন্তু আমরা কোন্ ধনীর পুত্র, কোথায় গেলে সেই পৈতৃক ধন পাইয়া সুখী হইব—এ সকল সন্ধান না জানিয়া কেবলমাত্র বৃথা চেষ্টা করিয়া নিজেদের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছি না। এই প্রকার দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থায় পথে বহুলোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহারা আমাকে সাহায্য করিবে বলিয়া বলে, কিন্তু পরে দেখা যায়, সকলেই আমার মত দরিদ্র ব্যক্তি। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধনী বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহারা আমাকে যে পথ দেখায়, তাহাতে আমার দারিদ্র্য মোচন হয় না। তাহারা ধনীরূপে আমাকে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ধ্যান ইত্যাকার বহু পথই প্রদর্শন করে; কিন্তু তদ্দ্বারা আমার দারিদ্র্যের সমাধান হয় না। সেইজন্য সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপগোস্বামীকে প্রয়াগতীর্থে ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন—

*ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।*
*গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥*

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯/১৫১)

সেই ভক্তিলতার বীজ আমরা গীতা-শাস্ত্রেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে পাইতে পারি। যদি আমরা সেই বীজ গ্রহণ করিতে পারি, তবেই আমরা গীতাশাস্ত্রের সার গ্রহণ করিতে সক্ষম হই। নচেৎ জন্মে-জন্মে গীতা পাঠ করিয়া এবং তাহার ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের কোনই লাভ হয় না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি তত্ত্ব, তাহা গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে ব্যক্ত করিয়াছেন। কত সাধারণ ব্যক্তি নিজের কথা নিজে ব্যক্ত করিয়া (যাহাকে ইংরাজীতে auto-biography বলে) সাময়িকভাবে কত বাহবা-ই গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ যখন নিজের কথা নিজে বলেন, তাহা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। অধিকন্তু



আমাদের স্ব-কপোল কল্পিত মত স্থাপনের জন্য গীতার মুখ্যার্থ ছাড়িয়া দিয়া গৌণার্থ লইয়া টানাটানি করি। সেইপ্রকার বিকৃত গৌণার্থ টানিতে টানিতে শেষ পর্যন্ত অর্থের সামঞ্জস্য রাখিতে না পারিয়া পরিশেষে 'শিব গড়িতে বানর' গড়িয়া লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে এবং তাঁহারই সেবা করা আমাদের নিত্যকর্ম্ম ও ধর্ম্ম—তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। এই দুটি তত্ত্বই বুঝিবার জন্য গীতা শাস্ত্রের অবতারণা এবং তাহা বুঝিতে পারিলেই ভক্তিরাজ্যের কনিষ্ঠাধিকার লাভ হয়। এই কনিষ্ঠাধিকারই শ্রদ্ধা শব্দে অভিহিত। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

*'শ্রদ্ধা' শব্দে 'বিশ্বাস' কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।*
*কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয় ॥*

---

ভক্তি
কথা

# কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগতীর্থে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে যখন ভক্তিকথা বা ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি স্থাবর-জঙ্গম নির্ব্বিশেষে জীব-চৈতন্যের বিচার করিয়াছিলেন। নয় লক্ষ প্রকার জলজন্তু, কুড়ি লক্ষ রকমের বৃক্ষাদি জীব, এগার লক্ষ রকমের ক্রিমি-কীট, দশ লক্ষ রকমের পক্ষীজাতি, ত্রিশ লক্ষ রকমের পশুজাতি এবং চারি লক্ষ রকমের মনুষ্যজাতি—মোট সর্ব্বসমেত চৌরাশী লক্ষ রকমের জীব-নিচয়ের মধ্যে মনুষ্য-জাতিই অল্প সংখ্যক। সেই অল্প সংখ্যক মনুষ্য-জাতির আবার বিশ্লেষণ করিলে অসভ্য, অর্ধসভ্য এবং সভ্য—এই তিন প্রকার মনুষ্যের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। তাহার মধ্যে সভ্য-জাতি বলিয়া পরিচিত বহু মনুষ্যই সকল প্রকার নিয়মানুষ্ঠান বাদ দিয়া জীবনে তথাকথিত স্ফূর্তি করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় অসভ্য জাতিরই মত কেবলমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতারই পরিবেশনকারী। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়গুলির সেবা এবং তাহাদিগকে তোয়াজ করিয়া বেশ কার্য্যক্ষম রাখাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। এমনকি, অশীতি বর্ষের বৃদ্ধও নিজ ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ রাখিবার জন্য আধুনিক চিকিৎসানুসারে বাঁদরের শিরাবিশেষকে নিজ শরীরে নিয়োগ করিয়া পুনর্যৌবন ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারী মনুষ্য-সমাজ জানে না যে, ইন্দ্রিয় অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ মন, মন অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি এবং এই বুদ্ধির পশ্চাতে যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ অহঙ্কার আছে, তাহাই আত্মার আবরণ। সেই প্রকার আত্মার অনুসন্ধান করিতে হইলে, কেবল উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারী





ব্যক্তিগণ চিরদিনই পশ্চাতে থাকিবেন। কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারী ব্যক্তিগণ পশুজাতির মধ্যেই গণ্য,—কারণ মনুষ্য-জাতির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ব্যতীত আরও অনেক বেশী গুরুতর কার্য্য আছে যাহার জন্য সে সকল জাতিরই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। তজ্জন্য কিছু কিছু লোক জীবনের গুরুত্ব বুঝিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশয় না দিয়া মহাজনগণের প্রদর্শিত নিয়মানুসারে জীবন যাপন করিয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য-সাধনে ব্রতী হন।

হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীস্টিয়ান ইত্যাদি যাঁহারা যতদূর ভগবদ্-বিশ্বাসী, সকলেই দেশ, কাল, পাত্র-বিশেষে নিজ নিজ নিয়ম পালন করেন। সেই সকল নিয়ম-পালনকারী ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর অর্জ্জুন মহাশয়ের সম্মুখে বলিয়াছিলেন যে,—

*মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।*
*যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥*

(গীঃ ৭/৩)

জীব-চৈতন্য অনাদি কাল হইতে বহু ইতর-যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ক্রমবিকাশ-পন্থায় বহু জন্মের পর এবং বহু ভাগ্যে এই মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যেতর কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষীর শরীরে জীব-চৈতন্য অত্যন্ত আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মই প্রবল। মনুষ্য জীবনেও কতকগুলি ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম হইতে কিছু বিরত থাকিয়া জগতে মহাপুরুষ, যোগী, জ্ঞানী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত হইয়া ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ যে মন, সেই মনোধর্ম্মে বা তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি-ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন। বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে জীব-চৈতন্য, সেই চৈতন্য-ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকার নামই চেতনাধর্ম্ম বা সনাতন-ধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম।

চেতন-ধর্ম্ম ব্যতীত ছল-ধর্ম্ম বা অন্য তদনুরূপ যে-সকল ধর্ম্ম আছে, তাহাতে পশু-ধর্ম্মে প্রাথমিক প্রয়োজন আহার, নিদ্রা, ভয়,

মৈথুনাদি কার্য্যই তরতম হিসাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্যেতর জীবের চেতন-ধর্ম্মের বিকাশের আদৌ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে সেই চেতন-ধর্ম্মের বিকাশের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কেহ কেহ সেই সিদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টা করেন। মনুষ্য-জীবনেই আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি—

*"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়?"* (*চৈঃ চঃ মঃ* ২০/১০২)

মনুষ্য-জীবনেই একটা নিত্য সুখের অনুসন্ধান আরম্ভ হয় এবং সেই শরীরেই উপলব্ধি হয় যে—আমি দুঃখ চাহি না, অথচ আমার স্কন্ধের উপর দুঃখ আসিয়া চাপে, আমি মৃত্যু চাহি না, অথচ আমাকে মৃত্যু জোর করিয়া লইয়া যায়, আমি জরা চাহি না, অথচ যৌবনের পরেই জরা আসিয়া আমাকে বৃদ্ধ করিয়া দেয়; আমি রোগ-শোক হইতে মুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিলেও তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দেয় না। অধিকাংশ বোকা লোকই এইসকল দুঃখ-দৈন্য থাকা সত্ত্বেও মনুষ্য-জীবনকে সুখের করিবার বহু চেষ্টা করে। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহারা স্থিরভাবে চিন্তা করেন—কিভাবে এই সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে এবং তাহার কোন প্রকৃষ্ট উপায় আছে কি না? এই প্রকার সত্যানুসন্ধান প্রবল হইলেই 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' উপস্থিত হয় এবং সেই সকল ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণই সিদ্ধিলাভের পথিক। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুকৃতি বলে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া সর্ব্বদাই জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির দুঃখকে সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করেন।

সেই-সকল দূরদর্শী সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নস্তরের লোক কর্ম্মী। এই কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ভোগী, ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মী। তাহাদের অপেক্ষা আরও কিছু উচ্চস্তরে অবস্থিত—যাঁহারা শরীর বা ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানি-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয়



দেন। তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন, তাঁহারা যোগি-সম্প্রদায় বা তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত সিদ্ধিকামী। ইহাদিগকে অশান্ত ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা জড়াভিমান ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন, এবং শরীর, মন, বুদ্ধি ও জড়াহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আত্মধর্ম্মে অবস্থিত তথা মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই মাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বতঃ বুঝিতে বা জানিতে পারেন। এবং সেই সকল কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌গণ যে-কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তাঁহারাই জগদ্‌গুরু।

*কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।*
*যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥*

(*চৈঃ চঃ মঃ* ৮/১২৭)

সুতরাং কর্ম্মি-সম্প্রদায় এবং জ্ঞানি-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝেন না, ভক্তিতত্ত্ব বা ভক্তি-কথাও বুঝেন না। এই সকল মূঢ় কর্ম্মি-সম্প্রদায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মনুষ্য ভাবিয়া অবজ্ঞাবশতঃ গীতার কদর্থ করিয়া থাকেন।

কলিকালে হতজ্ঞান মনুষ্যগণ সকল বিষয়েই দীন-দরিদ্র হইয়া পশু-জীবনের যে প্রাথমিক আবশ্যক—আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন তাহাতেই সকল সময় নষ্ট করিয়া, মুক্তাবস্থায় কৃষ্ণতত্ত্ব জানা ত' দূরের কথা সম্যক্‌ভাবে কর্ম্ম-জ্ঞান চর্চারও সময় পায় না। শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম-জ্ঞান দ্বারা যে চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তদ্দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিবার কিছু কিছু শক্তি লাভ হয়। জ্ঞানের শেষ কথা—ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্তি হইলে, তাহার পর কৃষ্ণভক্তি লাভের অবস্থা পরিবর্দ্ধিত হয়। সেই প্রকার ব্রহ্মভূত অবস্থালাভের সুযোগ কলিহত জীবের মোটেই নাই বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজতত্ত্ব সরাসরি ভগবদ্‌গীতায় বলিয়াছিলেন।

ভক্তরূপে, প্রেমের অবতার, পরম-দয়াল গৌরহরি-রূপে জীবকে গীতার কথা আদর্শরূপে বুঝাইয়া দিলেন। ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমিই সব", আর সেই কথাই শৃগাল-বাসুদেব-জাতীয় ব্যক্তিগণ কদর্থ করিবে বলিয়া তিনি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মূর্ত্তিতে বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণই সব"। দুই কথার মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। লক্ষ্য বস্তু একই। সাধারণ ভাষায় বলিয়া থাকি 'বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা'। আমরা কলিহত জীবগণ সেই প্রকার বাঁদরের মত। আমাদিগকে কৃপা করিয়া ব্রহ্মার দুর্লভ বস্তু কৃষ্ণতত্ত্ব—ভক্তিতত্ত্ব অতি সহজে বিলান হইয়াছে বলিয়া আমরা ভক্তিতত্ত্বেরও যথেষ্ট কদর্থ করিয়াছি। ইহাও আমাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয়। যে নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুইবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে সেই আত্মধর্ম্মের কথা আবার ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছি।

অল্পবুদ্ধি শিশুর নিকট যেমন একটি রঙ্গিন কাচের পুতুল, আর একটি স্বচ্ছ হীরকখণ্ড উপস্থাপিত করিলে শিশু যেমন হীরকখণ্ড বাদ দিয়া কাচের পুতুলটিই গ্রহণ করে, সেইরূপ কলিহত অল্পবুদ্ধি মনুষ্যজাতি স্বচ্ছ-হীরকখণ্ড যে ভক্তি-কথা বা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে হতাদর করিয়া রঙ্গিন কাচখণ্ড যে 'কর্ম্ম' আর 'শুষ্ক-জ্ঞান' তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। অল্পবুদ্ধি শিশুগণ যেমন বুঝিতে পারে না যে, ঐ স্বচ্ছ হীরকখণ্ডের মধ্যে শত সহস্র রঙ্গিন পুতুল অনুস্যূত আছে, সেই প্রকার অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বুঝে না যে, "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃত হয়।"

যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব বা ভক্তিতত্ত্ব বুঝেন তাঁহাদের কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, দান, তপ, জপ, সকল তত্ত্বই স্বতঃই জানা হইয়া যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই সম্পর্কে এইরূপ সিদ্ধান্ত আছে, যথা—



*যৎ কর্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।*
*যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥*
*সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।*

(ভাঃ ১১/২০/৩২-৩৩)

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা অন্যান্য শ্রেয়ঃ সাধন-সমূহ দ্বারা জগতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, মদীয় ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা অনায়াসেই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

# ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব

নিরীশ্বর কপিল যে সাংখ্যদর্শন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে মহত্তত্ত্ব হইতে প্রাকৃতিক ভূমি, অপ, অনল, বায়ু, আকাশ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পানি, পায়ু, পাদ, উদর, উপস্থ, মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি চতুর্বিংশতি-তত্ত্বের বিচার করিয়াছিলেন। এবং এই চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব হইতে অব্যক্ত আত্মাকে বুঝিতে না পারিয়া তিনি ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই। কপিল সেইজন্য সাত্বত-সম্প্রদায়ের নিকট 'নিরীশ্বর কপিল' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দেবহুতি-পুত্র ভগবান কপিলদেব এই নিরীশ্বর কপিল হইতে পৃথক্। তিনি ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার বলিয়া স্বীকৃত।

নিরীশ্বর কপিলের পদাঙ্কানুসরণকারী সাংখ্য-দার্শনিকগণের অব্যক্তানুমান নিরসন করিয়া অষ্টপ্রকার প্রকৃতির নিয়ন্তা যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা গীতায় ব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

*ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।*
*অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥*

(*গীঃ* ৭/৪)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু, তাঁহার স্বরূপ কি? তাঁহার ঐশ্বর্য, বল-বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য কিরূপ, তাহা না জানিলে ভক্তিতত্ত্ব সিদ্ধ হয় না।

*সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস ।*
*ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥*

(*চৈতন্যচরিতামৃত* ২/১১৭)





এই প্রকার তত্ত্ব জানিয়া যে কার্য্যের সূচনা হয়, তাহাই ভক্তিকথা। মনুষ্যজাতি নিজ মন ও বুদ্ধি সঞ্চালন করিয়া বায়ুর বেগে দ্রুত গমন করিয়া শত-সহস্র বৎসর ধরিয়া কপিলের মতে যাহা জানিতে পারে নাই, তাহাই এক-কথায় এই স্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্ত করিলেন। যাহারা বুঝিতে পারিল না, তাহারা ভক্তিকথা হইতে দূরে চলিয়া গেল; কিন্তু যাহারা বুঝিল, তাহাদের ভক্তিতত্ত্ব আরও দৃঢ় হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম-তত্ত্ব—এবং যেখানে পুরুষ সেইখানেই তাঁহার সেবার জন্য প্রকৃতি আছে। পুরুষাভিমানী সাধারণ জীবের অধীনে যদি সর্বত্রই প্রকৃতির আবশ্যক থাকে, পুরুষোত্তম ভগবানের প্রকৃতি বা সেবিকা নাই—এমন অবান্তর কথা বাতুলেই বলিয়া থাকে। পুরুষকে প্রকৃতির অধীন করিয়া যে দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা, তাহা সর্ব্বদাই অসম্যক্ জানিতে হইবে। "প্রকৃতি" বলিয়া থামিয়া গেলে চলিবে না; কাঁহার প্রকৃতি তাহা সন্ধান করা আবশ্যক। প্রকৃত পুরুষ কে; তাহা সিদ্ধান্তিত হওয়া দরকার। প্রকৃতি আর শক্তি একই তত্ত্ব। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই শক্তির পরিচয়ে শক্তিমানের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। উপনিষদাদি শ্রুতিশাস্ত্রে পরতত্ত্ব যে ব্রহ্ম, তাঁহার বহুধা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতায় বিশেষ আলোচনা আছে। এই ব্রহ্ম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গজ্যোতি—ইহাই আমরা ব্রহ্ম-সংহিতা হইতে জানিতে পারি।

*যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-*
*কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্ ।*
*তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥*

(*ব্রঃ সঃ* ৫/৪০)

সৃষ্ট জগতের ব্যতিরেক চিন্তাতে অতন্নিরসন কল্পেই ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ অবস্থিতি। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব যে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিরঞ্জন, নিঃশক্তিক,—তাহা বেদাদি শাস্ত্রে কথিত হইলেও সেই ব্রহ্মতত্ত্বের যে প্রতিষ্ঠা, তিনি জড় আকার-বর্জ্জিত চিৎ সবিশেষ, চিচ্ছক্তিসম্পন্ন, চিদ্বস্তু চিদ্গুণের গুণমণি। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং সেই চিল্লীলাবিশিষ্ট পরম পুরুষই চরম প্রতিপাদ্য বিষয়। কর্ম্মজড়-সম্প্রদায় সেই চিদ্বিশেষকে জড়-বিশেষ মনে করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া যাইতেছেন, আর শুষ্ক-জ্ঞানি-সম্প্রদায় জড় সবিশেষের তিক্ততা আস্বাদন করিয়া চিদ্-সবিশেষও সেই অপ্রীতিকর তিক্ততা আছে,—এইরূপ অনুমান করিয়া তাহাদের আরোহ-পন্থার অবরতা, হেয়তা প্রকৃষ্টভাবেই প্রমাণ করিতেছেন। এই দুই বিকৃত সম্প্রদায়ই কৃপার পাত্র এবং তাহাদিগকে বিশেষ কৃপা করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ নিজতত্ত্ব ও নিজ-শক্তিতত্ত্ব ভগবদ্গীতায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

উপরোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির প্রসূতি জড়মায়া বা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। সেই বহিরঙ্গা শক্তির বহু অবরতা আছে বলিয়া তাহা অনুৎকৃষ্টা প্রকৃতি বলিয়া পরিচিতা। জড়-শক্তিরূপা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইত্যাদির নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই বলিয়া ইহারা অপরাপ্রকৃতি বা অনুৎকৃষ্টা শক্তি। এবং সেই অনুৎকৃষ্টা শক্তি যে শক্তির দ্বারা চালিত হয়, তাহা উৎকৃষ্টা শক্তি বা পরাশক্তি।

শক্তিতত্ত্ব কখনও নিজে ভোগী হইতে পারে না বা একটি শক্তি অপর একটি শক্তিকে কখনও ভোগ করিতে পারে না। শক্তি-তত্ত্ব ভোগ্যা, আর শক্তিমান-তত্ত্ব ভোগী বা ভোক্তা।

পরাশক্তি-সম্ভূত জীব স্বতন্ত্র বলিয়া, অস্বতন্ত্র ক্ষিতি-অপ্-তেজাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্টা। কিন্তু তাই বলিয়া জীব কখনও সকল তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম-তত্ত্ব ভগবানের সহিত সমান নহে। অস্বতন্ত্র জড় প্রকৃতি



হইতে চেতনের উৎকৃষ্টতা সহজেই অনুমেয়। জীবশক্তিই এই জড়জগৎকে আলোড়ন করিয়া ধারণ করিতেছে। যদি সেই জীবশক্তি জড়শক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার চেষ্টা না করিত, তাহা হইলে জড়জগতে জড়বিলাসসমূহ প্রত্যক্ষ করা যাইত না। ভূমি, অপ, অনল যেখানে যাহা আছে, সেখানেই তাহা থাকিত—যদি চেতনাশক্তি তাহাতে বিলাস করিবার চেষ্টায় সংযুক্ত না হইত। চেতনের সংযোগেই মাটি, কাঠ, পাথর, লৌহাদি পদার্থের বিনিময়ে এই দৃশ্য জগতের মেঠো ঐশ্বর্য্য, অট্টালিকাদি কল-কারখানা সমস্তই সম্ভবপর হইয়াছে। জড় শক্তির এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সে নিজে নিজেই একটা কিছু হয়।

এতদ্দারা আরও আমরা বুঝিতে পারি যে, এই জড় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও নক্ষত্র-গ্রহাদি এইভাবে কোন বৃহৎ চেতনের সংযোগে সম্ভব হইয়াছে। জড়ের নিজের কোন ক্ষমতা নাই—ইহাই নিছক সত্য।

জড়-সম্ভূত চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে চেতনই আলোড়ন করিয়া যে একটি জড়-বিলাসের বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে জড়ের হেয়তা, অবরতা ও পরিচ্ছিন্নতা সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, ইহাই প্রমাণিত হয়। চিদ্-বৈচিত্র্য ব্যতীত চিদানন্দের কোন সম্ভাবনা নাই। জীব যা পরাশক্তি, তদ্বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—

*অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।*
*জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥*

(*গীতা* ৭/৫)

জীব পরাশক্তি-সম্ভূত বলিয়া জড় শক্তিতে তাহার স্বজাতীয় মিল নাই। যেমন জল-জন্তুর সহিত স্থলের মিল নাই অথবা স্থল-জন্তুর সহিত জলের মিল নাই। সেইরূপ পরাশক্তির সহিত জড় শক্তির যে আপাত অভিনিবেশ, তাহাই মায়িক বা মিথ্যা। কিন্তু জীবতত্ত্ব

পরাশক্তি-সম্ভূত বলিয়া জড় শক্তির উপর কর্তৃত্ব করিবার চেষ্টা করিতে পারে মাত্র;—যদিও তাহা মায়িক ও অসম্ভব ব্যাপার। কারণ এক শক্তি অন্য শক্তির উপর চিরন্তন কর্তৃত্ব করিতে পারে না। নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরা প্রকৃতির শক্তিমানের সেবা করিবার ক্ষমতা মাত্র আছে। শক্তিমানের সেবা-চেষ্টায় জীবশক্তির যে জড়-প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করিবার চেষ্টা—তাহাই একমাত্র চিন্ময় বা যাজ্ঞিক, অন্যথায় মায়িক কর্ম্মবন্ধন মাত্র।

বিষ্ণু পুরাণে ত্রিবিধ শক্তির কথা আমরা শুনিতে পাই।

*বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।*
*অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥*

(*বিঃ পুঃ ৬/৭/৬১*)

বিষ্ণুশক্তি পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞা-বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তিই চিচ্ছক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তিই জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি (যাহা মায়ারূপা অবিদ্যা হইতে অপরা বা ভিন্না বলিয়া উক্ত হইয়াছে) এবং কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যা শক্তির নামই 'মায়া'।

অতএব এই দৃশ্য জগতে যে-সমস্ত কার্য্য হইতেছে তাহার মূলীভূত কারণ—ভগবানের উপরোক্ত পরা ও অপরা শক্তিদ্বয়। অপরা শক্তি 'ক্ষেত্র' কর্ম্মসংজ্ঞা, আর পরাশক্তি ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা। ইহজগতে যতপ্রকার বিভিন্ন জীব-নিচয়ের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাহা সমস্তই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা-শক্তির সংঘর্ষে উৎপাদিত। এবং সেই দুই শক্তির অধ্যক্ষ ও শক্তিমান-তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূলীভূত কারণ জানিতে হইবে।

*এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয় ।*
*অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥*



*মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।*
*ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥*

(*গীঃ ৭/৬-৭*)

বেদাদি শ্রুতি-শাস্ত্রে আমরা *'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম'*, *'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'*, *'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'*, *'অহং ব্রহ্মাস্মি'* ইত্যাদি যে প্রাদেশিক বাক্য শুনিয়াছি, তাহার সামঞ্জস্য এই স্থানে। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ একই পরাৎপর-তত্ত্ব; সুতরাং তাঁহার সম বা অধিক আর কেহই দ্বিতীয় পুরুষ নাই। সেই কথাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, *মত্ত পরতরং নান্যৎ* এবং তিনি যে তাঁহার বিবিধ শক্তির দ্বারা এই জগতে ওতঃ প্রোতঃ ভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাহাও স্পষ্টীকৃত হইল।

শক্তির পরিণামই দৃশ্য জগৎ এবং শক্তি ও শক্তিমান অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব বলিয়া *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* শব্দে ভগবানের পরা ও অপরাশক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শক্তির পরিণামে পূর্ণব্রহ্মের কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব নহে বলিয়া 'ব্রহ্ম' নিরঞ্জন আখ্যায় শব্দিত এবং অপরা-প্রকৃতি ব্রহ্মের ছায়ামাত্র বলিয়া ব্রহ্ম 'নিরাকার' শব্দে বিঘোষিত।

শ্রীচৈতন্যদেব এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। সকল সিদ্ধান্তের সার সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব এবং জীব ও জগৎ তাঁর অধীন শক্তিতত্ত্ব। ইহা যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারাই অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত অধীন জীব (Materialist) এবং এই তত্ত্ব বুঝিয়া যাঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টাবিশিষ্ট, তাঁহারাই মায়ামুক্ত ভগবদ্ভক্ত (Spiritualist)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই গীতাতে বলিয়াছেন, যথা—

*ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ।*
*মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥*

*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।*
*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥*
(*গীঃ* ৭/১৩-১৪)

ইচ্ছা-দ্বেষ, ভাল-মন্দ বিচার প্রভৃতির মূল কারণ, —সত্ত্ব-রজ-তমঃ এই গুণত্রয় সমস্ত জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য গুণাতীত চিদ্‌বিলাস যে ভগবান, তাঁহাকে *পরমব্যয়ম্‌* বলিয়া বুঝিতে অসুবিধা হইতেছে। এখানে পরম অব্যয় বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবানের অনন্ত শক্তি প্রকারে দৃষ্ট হইলেও তিনি নিত্যকালই পূর্ণ এবং নির্ব্বিকার আছেন। এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, যেহেতু ব্রহ্ম সমস্ত জগতেই সত্তা বিস্তার করিয়া আছেন, সেই হেতু তাঁহার নিজের কোন স্বরূপ নাই। অগ্নির উত্তাপ সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইলেও অগ্নির কোন বিকার নাই। সূর্য্য চিরদিনই উত্তাপ দিতেছেন বলিয়া সূর্য্যের হ্রাস যদি না হয়, তাহা হইলে সূর্য্য যাঁহার কণামাত্র শক্তির পরিচয়, তাঁহার হ্রাসের কি কথা আছে? ভগবানের শক্তি অগ্নির উত্তাপের ন্যায় সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইলেও তাঁহার শক্তি কোন দিনই ন্যূন হইবে না। সেই জন্যই তিনি পরম-অব্যয় শক্তিমান-তত্ত্ব। যথা, শ্রুতিতে—*পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।*

দৈবী-মায়ার মোহিনী শক্তির কবল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই পরম অব্যয় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করিবার উপায়ও তেমনি *একমেবাদ্বিতীয়ম্‌*। সূর্য্যের আলোকই যেমন একমাত্র সূর্য্যদর্শন করিবার উপায়, সেইরূপ কৃষ্ণ-সূর্য্যের আলোকই তাঁহাকে দেখিবার একমাত্র উপায়। তাঁহারই পাদপদ্মে প্রপত্তি বা কৃষ্ণভক্তিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার একমাত্র উপায়। শরীর ও মনের কসরৎ যে কর্ম্ম-জ্ঞান, তাহা দ্বারা ভগবানকে পাইবার উপায় নাই। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যাইতে পারে। জ্ঞান ও যোগাদির দ্বারা



ভগবানের আংশিক দর্শন ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা প্রকাশিত হন। কিন্তু ভক্তির দ্বারাই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়। সূর্য্য উদিত হইলে জগতের অন্ধকার কাটিয়া যায় এবং যে বস্তুর যে স্বরূপ তাহা প্রকাশিত হয়। সেইভাবে কৃষ্ণ-সূর্য্যের উদয় হইলে মায়ার অন্ধকার কাটিয়া যায় এবং সকল বস্তুই স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হয়। অতএব ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়। সেই প্রকার সম্যক্‌ জ্ঞান লাভের পথে 'দুরত্যয়া মায়া' ব্যবধান ঘটাইতে পারে। এই স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রপত্তি করিলেই যদি সর্ব্বধর্ম্ম কৃত হয়, তাহা হইলেই জগতের সকল লোকই একমাত্র ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকেই পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে পারিত। জগতের সকল দেশে সকল লোকেই ভগবান এক ভিন্ন দুই নাই, ইহা অল্পাধিক স্বীকার করে; অথচ সেই একমাত্র ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিজে আসিয়া তাহা ব্যক্ত করা সত্ত্বেও সকলে তাঁহার চরণে প্রপত্তি করিতেছে না কেন? যাহারা অপর সাধারণ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে অনেকেই একথা বুঝিতে না পারেন, কিন্তু জগতের বহু বড় বড় পণ্ডিত ও নেতা যাঁহারা বহু শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াছেন এমন বহু লোকও শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রপত্তি করেন না। ইহার কারণ কি? এই কারণও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিশ্লেষণ করিয়াছেন, যথা—

*ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।*
*মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥*
(*গীঃ* ৭/১৫)

প্রথমতঃ দুষ্ট লোকগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রপত্তি করে না। জগতে দুই প্রকার লোক সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে। যাঁহারা ভাল লোক তাঁহারা শিষ্ট, আর যাহারা মন্দ লোক তাহারা দুষ্ট-শব্দবাচ্য। ইহারা সকল দেশে সব সময়েই আছে। কিন্তু সকল দেশেই সব সময়েই তদ্দেশীয় লোকদিগকে শিষ্ট করিবার জন্য বিধি-নিষেধ সম্বলিত

আচার-ব্যবহার-প্রণালী সর্ব্বদাই আছে। যাঁহারা শিষ্ট লোক তাঁহারা সেই-সকল আচার-ব্যবহার ও বিধি-নিষেধ পালন করিয়া মনুষ্য-জীবনের ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হন, আর দুষ্ট লোকগণ প্রায়ই যথেচ্ছাচারী হইয়া কোন বিধি-নিষেধের অধীন হইতে চাহে না। আধুনিক জগতে যে নানাপ্রকার রাষ্ট্র-বিপ্লব, যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক বিবাদ প্রভৃতি বহু বিঘ্ন সমাজে দৃষ্ট হয়, তাহা এই দুষ্ট লোকগুলির খামখেয়ালী ও যথেচ্ছাচারিতার ফলস্বরূপ। শিষ্ট-লোকগুলি কিন্তু যে-কোন দেশে, সমাজে বা ধর্ম্মে অবস্থিত থাকুন না কেন, নিজ নিজ শাস্ত্রানুসারে বিধি-নিষেধ পালন করিয়া অন্যান্য দেশীয় শিষ্ট লোকের সহিত নিজ নিজ ভাবের আদান-প্রদান ফলে, সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর। কিন্তু দুষ্টলোকগণ যাহারা নিজের অপস্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাহারা তথাকথিত ধর্ম্মধ্বজীর ছাপ লাগাইয়া কেবল পাপাচরণই করিয়া থাকে। এমন কি, সেই দুষ্টলোকগুলি যে দেশে, যে ধর্ম্মে অবস্থিত তাহারও কোন ধার ধারে না। দুষ্টলোক অপস্বার্থ প্রণোদিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি করা দূরে থাকুক, সাধারণ ব্যবহারিক কার্য্যেও প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ধার ধারে না। এই দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সর্পাপেক্ষাও ভীষণ ভয়াবহ।

যাহারা প্রপত্তি করে না, তাহারা সাধারণ মূঢ় বা বোকা কর্ম্মি-সম্প্রদায়। এই সকল বোকা লোকগুলি ভগবান্ কি? জগৎ কি? সে নিজে কি? কি-জন্য সে আজীবন খাটিয়া মরিতেছে? তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল কি? —এই সকল কথা তত্ত্বতঃ কিছুই বুঝে না। গর্দ্দভ যেমন আজীবন রজকের বস্ত্রভার বহন করিতে করিতে সামান্য ঘাস মাত্র খাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, সেই প্রকার মূঢ় কর্ম্মি-সম্প্রদায় কেবলমাত্র উদর-পূর্ত্তির জন্য সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে। গর্দ্দভই সর্ব্বাপেক্ষা মূঢ়ের প্রতীক; কারণ সে কেবল উদর-পূর্ত্তি ও গর্দ্দভীর সঙ্গলাভের নিমিত্তই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে। সেই



প্রকার গর্দ্দভপ্রায় পরিশ্রমী লোকগুলি কেবলমাত্র গৃহকেই বা বৃহৎ গৃহ—দেশকেই শ্রেষ্ঠ বস্তু মনে করে। এবং এই গৃহে গৃহিণীর পক্ব অন্ন ভোগ করিয়া এবং তাহার সহিত বহু দুঃখভারাক্রান্ত ইন্দ্রিয়াদি সম্ভোগ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। জগতে আহারাদি-ব্যাপার ব্যতীত আর কি আছে বা না আছে, তাহার খবর কর্ম্মি-সম্প্রদায় রাখিবার প্রয়োজন মনে করে না। তাহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুবিধা করিবার জন্য যাঁহারা নেতৃত্ব-সজ্জায় সাহায্য করেন, তাঁহারাও মূঢ়গণের মধ্যে বৃহৎ মূঢ়। সুতরাং তাঁহারা গীতার ধার ধারেন না, ভগবদ্গীতার বক্তা যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ত' কথাই নাই। 'প্রপত্তি'—শব্দের অর্থই তাঁহাদের জানা নাই।

প্রপত্তি করে না যাহারা, তাহারা নরাধম শব্দবাচ্য। যাহারা মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়াও পশুর মত জীবন কাটাইয়া দেয়, অর্থাৎ মনুষ্যজীবনে যে কার্য্য হইবার সম্ভাবনা ছিল সেই কার্য্য সমাধান না করিয়া ইতর কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করে, তাহারাই নরাধমবাচ্য। কোন ব্যক্তি বহু ধন-রত্ন লাভ করিয়াও যদি দরিদ্রের মত জীবন কাটাইয়া দেয়, তাহাকে যেমন নরাধম কৃপণ বলা হয়, সেই প্রকার যে অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্য-জীবন, বৃথা পশুর মত কেবলমাত্র আহার-নিদ্রাদি ব্যাপারে ব্যয় করে, সে নরাধম আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। নরাধমগণের জানা থাকে না যে, বহু বহু মনুষ্যেতর জন্মলাভের পর তবে দুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করা যায়। এই জন্মেই এমন একটি সুবিধা লাভ করা প্রয়োজন যদ্দ্বারা মনুষ্য-মায়ামুক্তির পর ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তত্ত্ববস্তুকে লাভ করতঃ নিজের দেশে ফিরিয়া যাইতে পারে। জন্মান্তরে বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াও যদি মনুষ্য-জীবনে সেই ক্লেশের নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় নরাধম কৃপণই থাকিয়া যাইব। আর যদি মনুষ্য-জীবনোচিত চেষ্টা করি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীবনের সফলতা লাভে সক্ষম হইব। এস্থানে জাতি-ব্রাহ্মণের (?) কথা বলা হইতেছে না। ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মণ্যদেব

জাতি-ব্রাহ্মণের (?) কথা বলা হইতেছে না। ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মণ্যদেব গোবিন্দ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি করেন, কিন্তু নরাধম তাহা করিতে পারে না। ভক্তি-সম্বন্ধ ত্যাগকারীই নরাধম-শব্দবাচ্য।

ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি করে না। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, কংস প্রভৃতি নৃপতিগণ, বহু বিদ্যাবুদ্ধি ও তপস্যার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াও যেহেতু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হিংসা করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহারা 'অসুর' বলিয়া বিদ্বৎ-সমাজে পরিচিত। অসুরগণ সাধারণতঃ বিদ্যা-বুদ্ধিতে বড় কম 'ডাক্তার' নহে, কিন্তু যেহেতু সেই সকল 'ডাক্তার'গণ অসুর-ভাবাপন্ন বা ভগবদ্-বিদ্বেষী সেইজন্য তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধির চরম ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। অর্থাৎ সেই সকল বিদ্যা-বুদ্ধি মায়াকবলিত হইয়া অপহৃত-জ্ঞান হইয়া যায়। তাহার কারণও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি না করিলে *'দুরত্যয়া মায়া'*র হাত হইতে কখনই পরিত্রাণ লাভ হয় না।

অসুরগণের প্রধান কার্য্যই হইতেছে ভগবানকে এবং ভগবদ্ভক্তকে বিদ্বেষ করা। তাহারা মনে করে, শ্রীরামচন্দ্র ত' মানুষই ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণও সেই প্রকার আর একজন মানুষ। সুতরাং শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ যদি মানুষ হয় তাহা হইলে তাহারাই বা কম কিসে। তাহারা মনে করে, আমরা বিদ্যা ও বুদ্ধিতে শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অপেক্ষা কিছু কম নাকি? মহাবদান্যাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপর নাস্তিক পড়ুয়াগণ এই প্রকার মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া দয়াল প্রভুকে সন্ন্যাস আশ্রমের কঠোরতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিল। অসুরগণ এইভাবে চিরদিন ভগবানকে মানুষ-বুদ্ধি করে এবং মানুষকে ভগবান্-বুদ্ধি করে। সেই প্রকার মূঢ়গণের সম্বন্ধেও ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা— *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।* সুতরাং এতাদৃশ বৃত্তি অসুরগণের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব অসুরগণের বিদ্যা-বুদ্ধির



উপাধিগুলি বিষধর সর্পের মস্তকে বহুমূল্য মণির মত। সর্পের মস্তক মণি-শোভিত থাকিলেও সে যেমন ভয়ঙ্করই থাকে, সেইপ্রকার অসুরগণের বিদ্যা-বুদ্ধি, উপাধিগুলিও তাহাকে কম ভয়ঙ্কর করে না। মরা মানুষকে বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদে সাজাইয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া যেমন একটা লোকরঞ্জন বা লোক-প্রবঞ্চনা কার্য্য, সেইপ্রকার ভগবদ্বিদ্বেষী, নাস্তিক অসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে কেবল নামমাত্র বিদ্যাশিক্ষার উপাধি-দ্বারা ভূষিত করা একটা বিশিষ্ট লোক-প্রবঞ্চনা কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে যে নিরীশ্বর আসুরিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তদ্দ্বারা পদবীধারী কতকগুলি অসুরের সৃষ্টি হইতেছে মাত্র। তাহার প্রমাণ— উত্তর-প্রদেশে আলিগড়ে প্রিন্সিপ্যাল গার্গ তদীয় ছাত্রাদি কর্ত্তৃক নিহত হন। উত্তর-প্রদেশে এই বিষয়টি লইয়া বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। রাজ্যপাল-মহোদয় বিদ্বৎজনকে লইয়া পরামর্শ করিতেছেন, কিন্তু এই প্রকার Conference দ্বারা যেমন পূর্ব্বে কোন সমস্যারই সমাধান হয় নাই, সেইরূপ বর্ত্তমান প্রচেষ্টাও বিফল হইবে, ইহাই আমাদের ধারণা। আসুরিক স্বভাব দমন করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষই একমাত্র প্রতিষেধক। এই প্রকার ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরগণের হিংসা-বৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় জগতে যে অমঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমাদের সকলেরই লক্ষিতব্য বিষয়।

# শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে ডাঃ এম্ এস্ আনে'র মতবাদ

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, বিহার প্রদেশের রাজ্যপাল ডাঃ এম্ এস্ আনে মহোদয় গত ১২ই জানুয়ারী ১৯৫১ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Convocation (সমাবর্ত্তন) সভায় নিম্নলিখিত ভাবে বক্তৃতা দিয়াছেন; যথাঃ—

"Our youth are being brought up in a tradition of veiled contempt for religion and everything religious. Spiritualists and religious-divotees are the laughing stock of the educated youth and as the general masses are religious-minded and have great respect and reverence for such devotees and spiritualists, they feel generally disgusted with the attitude of the educated class and have no regard for them as a class. The educated class has also no feeling of affection for the masses whose way of life are mostly moulded and determined by religious ideas. The result is that the educated classes have not been able to produce a sufficient number of servants to look for the amelioration for the masses in a real missionary spirit."





ভাবার্থ এই যে, "আমাদের যুবক-সম্প্রদায়কে এমনভাবে মানুষ করা হইতেছে যে তাহাদের ভিতর একটা প্রচ্ছন্ন ভগবদ্বিদ্বেষ বা ধর্ম্ম-বিদ্বেষ-ভাব পুষ্টিলাভ করিতেছে। শাস্ত্রত-ভক্ত এবং ধার্ম্মিকগণ আধুনিক শিক্ষিত যুবকবৃন্দের নিকট কয়েকজন হাস্যাস্পদ ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া পরিচিত। সাধারণ ভারতবাসীগণ স্বভাবতই ধর্ম্মভাবাপন্ন বলিয়া এবং ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের জন্মগত একটা শ্রদ্ধা থাকায়, ধর্ম্ম-বিদ্বেষী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই মনোভাবকে তাহারা রীতিমত ঘৃণা করে, এবং এই তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের কোন শ্রদ্ধা নাই। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও সাধারণের প্রতি কোন দরদ নাই। ফল এই হইয়াছে যে সাধারণের উন্নতিকল্পে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন সেবা বৃত্তির উন্মেষ হয় নাই।"

ডাঃ আনের উক্ত বক্তৃতা, যাহা কোন বাংলা দৈনিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা-প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে আহ্বান জানাইতেছি ঃ—

ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষাদান সম্পর্কে ডাঃ আনে বলেন, বর্ত্তমানে স্কুল ও কলেজ-সমূহে যে শিক্ষানীতি প্রচলিত, তাহাতে ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষা দানের কোন ব্যবস্থা নাই।

স্কুল ও কলেজে ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের তীব্র বিরোধিতা করা হইয়াছে, কিন্তু সমাজ-জীবনে ইহার প্রতিক্রিয়া আধুনিক যুব সমাজের মধ্য দিয়া কঠোরভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত না হইলে মানব-মনের পুনর্ব্বিকাশের পথ বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া আমি মনে করি। ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাবে সমাজে যুবকদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আত্মসংযমের ভীষণ অভাব দেখা দিয়াছে। যে-সব ছাত্র প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা না করে, তাহারা ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া পড়ে এবং তাহাদের মন 'নিরবলম্ব' অবস্থায় পড়িয়া থাকে। তাহাদের

মনে নীতি অথবা ধর্ম্মের কোন প্রভাবই বিস্তার লাভ করিতে পারে না। তাহারা যুক্তি-তর্কের পিছনে ছুটিয়া চলে এবং প্রায়ই কোন না কোন বিপজ্জনক নীতিবাদের কবলে যাইয়া পড়ে। আজিকার দিনে গুরু-শিষ্যের মধ্যে পবিত্র কোন সম্পর্ক নাই। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মশিক্ষার অভাবই ইহার প্রধান কারণ। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতিগণ আজকাল ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন।

রাজ্যপাল ডাঃ এম্ এস্ আনে মহোদয়ের সহিত কিছুদিন পূর্ব্বে পাটনায় গভর্নমেন্ট হাউসে (১৮/১/৫০, বেলা ১১টা) আমাদের কিছু আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য কিছু কথা বলিয়াছিলাম। তিনি নিজে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া আমাদের কথা কিছু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং আসুরিক ভাব দমন করিবার জন্য আমাদের যে আন্দোলন তাহাতে তিনি সহানুভূতিও প্রকাশ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার এই বক্তৃতায় আমরা কিছু মঙ্গল দর্শন করিতেছি।

ভগবদ্‌বিদ্বেষী দুষ্ট, মূর্খ, নরাধম ও নষ্টবিদ্যা অসুরগণ যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রপত্তি করে না, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেইপ্রকার তাহাদের কোনদিনই দয়া করেন না। পরমদয়াল অবতারী শ্রীগৌরসুন্দর ভগবদ্ভক্ত-বিদ্বেষী গোপাল-চাপালকে এইভাবেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। *'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্'* ভগবানের এই বিচার। বরং সেই-সকল অসুরগণ কি-প্রকার ক্রমান্বয়ে অন্ধ-যোনিতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং জন্ম-জন্মান্তর অসুরভাবেই থাকিয়া যায়, তাহারই তিনি ব্যবস্থা করেন। যথা—

*তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।*
*ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥*
*আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।*
*মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥*
(গীঃ ১৬/১৯-২০)



অর্থাৎ—সেই বিদ্বেষী, ক্রূর, নরাধমদিগকে আমি এই সংসারমধ্যেই অশুভ আসুরী-যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের অসুর-ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে-জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।

কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ভগবান্ অপেক্ষাও মহাবদান্য বলিয়া তাঁহারা আমাদের মত নীচ অসুরগণকেও দয়া করেন।

ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের পরিত্যক্ত ব্যক্তিগণকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ,—ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব। সুতরাং পতিত, দুষ্ট, মূর্খ, নরাধমগণকে দয়া করিবার জন্য ভগবদ্ভক্তগণ নানা উপায় উদ্ভাবন করেন, ইহাই তাঁহাদের প্রচার বৈশিষ্ট্য। এমন কি, তাঁহারা নিজে দুষ্ট মূর্খগণের মধ্যে থাকিয়া, কি উপায়ে তাহাদের মঙ্গল হয়, কিভাবে তাহারা ভগবদ্-ভজন পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া বিবিধ কৌশল অবলম্বন করেন। নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লন্ডনে ছাত্রাবাস স্থাপনের পরিকল্পনায় আমাদিগকে যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, আবশ্যক হইলে ঐ সকল বিপথগামী ছাত্রগণকে Sugar Coated Quinine-এর মত, অসদাচারের কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় দিয়াও তাহাদিগকে ভগবদ্ভক্তি-লাভের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। অসীম শক্তিশালী গুরু-বৈষ্ণবগণ ইচ্ছা করিলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকেই এককালীন উদ্ধার করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। শ্রীল বাসুদেব দত্ত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি জগতের সকল জীবের পাপ গ্রহণ করিয়া অনন্তকাল নরকে বাস করিতে প্রস্তুত,—যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু এককালে সকল জীবকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। বৈষ্ণবের প্রাণ এমনই উদার যে, তাঁহারা জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল

লাভের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল এবং তাঁহাদেরই পাদপদ্মের রজোভিষেক ভিন্ন ভগবানের কৃপা লাভ করিবার অন্য কোন উপায়ও নাই।

ভগবদ্ভক্তগণ বুঝেন যে, মূঢ়, নরাধম, দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সকলেই মায়াদুষ্ট। সেইজন্য উদারস্বভাব ভগবদ্ভক্তগণ সেই সকল দুরদৃষ্ট ব্যক্তিগণকে কদাপি হিংসা না করিয়া তাহাদের পরম মঙ্গল লাভের জন্য সর্ব্বদাই যত্নবান। ভগবদ্ভক্তগণই তজ্জন্য 'পতিত-পাবন' বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহারা ভগবান্ অপেক্ষাও বহুগুণে দয়াল। ভগবানের কৃপাতেই তাঁহারা ভগবান অপেক্ষা অধিক বলশালী। সেই প্রকার বলশালী ভগবদ্ভক্তের কৃপায় কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন, খশ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ পাপ-যোনিতে জাত নরনারী ভগবদ্‌পাদপদ্ম লাভ করিতে পারে।

এবম্বিধ ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মে অপরাধ করিলে আর কোন উপায় নাই। ভগবৎ-পাদপদ্মে অপরাধ করিলে ভগবদ্ভক্তগণই উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের পাদপদ্মে অপরাধ হইলে স্বয়ং ভগবানও তাহা হইতে রক্ষা করিতে পারেন না বা করেন না। ভগবদ্ভক্তগণ সেইজন্য কাহারও অপরাধ গ্রহণ করেন না। প্রভু যীশুখৃষ্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করিলেও তিনি কাহারও অপরাধ গ্রহণ করেন নাই। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, কাজীর বিচারে নবদ্বীপের ২২টি বাজারে বেত্রাঘাতে লাঞ্ছিত হইলেও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, —যেন বেত্রাঘাতকারীর কোন প্রকার দণ্ড না হয়। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মার খাইয়া রক্তাক্তকলেবর হইয়াও পতিত জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার "পতিত-পাবন" নামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তগণের এমনই কৃপা। সুতরাং পতিত, নরাধমগণের সুকৃতিলাভের একমাত্র উপায়—ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গলাভ। আমরা সর্ব্বতোভাবে আশা করি যে, নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অনুকম্পিত বলশালী ভগবদ্ভক্তগণ আর সময় নষ্ট না করিয়া কলিহত জীবের



কল্যাণের নিমিত্ত একযোগে পুনরায় শ্রীল রূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিবেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে তাঁহার আরাধ্যদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কলির স্থান-স্বরূপ কলিকাতায় যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর লোকচক্ষে-গুরুবাক্য লঙ্ঘন (?) করিয়াও কেবল কলিকাতায় কেন, সুদূর বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লণ্ডন, বার্লিন প্রভৃতি বৃহৎ কলির আড্ডায় ভগবদ্ভক্তি প্রচারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নির্জ্জনে মঠ মন্দির স্থাপন করিয়া নির্ব্বিবাদে বসবাস করিবার অভিনয়ের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। জীবনের সমস্ত energy cent percent যাহাতে ভগবৎ সেবায় জীব-কল্যাণে নিয়োজিত হয়, তিনি তাহারই একমাত্র প্রচারক ছিলেন। বোম্বাই শহরতলীতে 'ভিলাপার্লা'-নামক 'নিরিবিলি স্থানে' আমাদের কোন গুজরাটি বন্ধু মঠ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রকার আচার-প্রচার-চেষ্টা দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। কিন্তু, পতিতপাবন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর কি আবার আমরা পতিত, নরাধম, দুষ্কৃতিপরায়ণ থাকিয়া যাইব? আমাদের কি উদ্ধার হইবে না? শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু আবদ্ধ করুণাসিন্ধু-রূপ ভগবৎ-প্রেমের মোহনা কাটিয়া সর্ব্বত্র উহা দ্বারা প্লাবিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশজ পরিচিত কয়েকজন জাতি-গোস্বামী সেই করুণাসিন্ধুকে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-বিধিতে রুদ্ধ করিবার দুরাশা পোষণ করিলে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর আবার সেই মোহনা কাটিয়া দিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই প্রেম-বন্যায় প্লাবিত করিয়াছিলেন। আমরা কি জাতি-গোস্বামীর অনুকরণে আবার তাহা রুদ্ধ করিয়া দিব?

ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গপ্রভাবে আমার ন্যায় দুষ্ট, মূর্খ, নরাধম এবং অসুর প্রবৃত্তির লোকও অজ্ঞাত সুকৃতিবলে ভগবদ্ভজনোন্মুখী হয়। চঞ্চলমতি বালকগণকে যেমন বস্তু-পাঠ, খেলনা, গান প্রভৃতি আমোদজনিত

উপায়ে কিন্ডারগার্টেন (Kindergarten) বিধিমতে ক্রমশিক্ষা দিয়া লেখাপড়ায় একটা আসক্তি জন্মান সম্ভব হয় সেই প্রকার যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিয়া অর্থাৎ অর্চ্চনমার্গে তৎ অধিকারিকে বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ কৌশলে ভগবানের বীর্য্যবতী কথারূপ ঔষধ এবং ভগবানের উচ্ছিষ্ট নৈবেদ্য প্রসাদ দান করিয়া পথ্যের ব্যবস্থা করেন। এতদ্দ্বারা নিম্নাধিকারীর ভবরোগব্যাধি প্রশমিত করা সম্ভবপর হয়। কৃষ্ণভক্তি জীব-মাত্রেরই নিত্যসিদ্ধ সম্পত্তি (Birth right); তাহা নূতন কোন মনগড়া জিনিস নহে। মূঢ় ব্যক্তিগণ এই ভগবৎ-ভক্তিকে একটা মনের জড়াবস্থা-বিশেষ ধারণা করিয়া অধিকতর মূঢ়তার পরিচয় দিয়া থাকে। এই নিত্য-সিদ্ধ বস্তুটি (যাহাকে ভাগবতে বাস্তব-বস্তু বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে) শুদ্ধচিত্তে স্বতঃই উদিত হয়। রোগ শান্তি হইলে যেমন স্বতঃই ক্ষুধার উদ্রেক হয় সেইরূপ সাধুসঙ্গের সুকৃতি অর্জ্জিত হইলেই কৃষ্ণভক্তির স্বতঃই উন্মেষ হয়।

সেই প্রকার সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে তারতম্য হিসাবে চারি শ্রেণীর ব্যক্তি, যথা—আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী সকলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। যথা—

*চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।*
*আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥*
(গীঃ ৭/১৬)

ভগবৎ-প্রবর্ত্তিত এবং আর্য্য-ঋষিগণ প্রচারিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালনে একপ্রকার সুকৃতি অর্জ্জিত হয়। যথা—

*বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্*
*বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্।*
(বিঃ পুঃ ৩/৮/৯)

অর্থাৎ, ভগবানের আনুগত্য স্বীকার করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র



কর্ত্তব্যকর্ম্ম। স্বীয় স্বভাবানুসারে যিনি যে বর্ণে বা আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত তিনি সেই বর্ণ এবং আশ্রমোচিত ধর্ম্ম-পালন করিলেই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু যথোচিত আরাধিত হন এবং তদ্দ্বারাই তিনি সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি ধর্ম্মী স্ব স্ব স্বভাবে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও যাজন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেই সুকৃতি অর্জ্জনে সক্ষম হন। সেই প্রকার—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসিগণও স্ব স্ব আশ্রমোচিত ধর্ম্মাচরণ করিলেই সুকৃতি অর্জ্জিত হয়। কিন্তু কলির প্রভাবে যখন এই সকল বর্ণাশ্রমে আসুরিক ভাব আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই মনুষ্য-সমাজে ব্যাভিচারসমূহ দৃষ্ট হয় এবং তাহাতে বিষ্ণুমায়া-সঙ্ঘটিত নৈসর্গিক বহু প্রকার উৎপাত আরম্ভ হয়। রাজার আইন মানিয়া চলিলেই রাজ্য সুশৃঙ্খলায় চালিত হয় এবং সকলেই সুখে বাস করে। কিন্তু রাজার আইন অমান্য করিয়া কতকগুলি আসুরিক বর্ণাশ্রমী বা বর্ণসঙ্কর চোর, বদমাস এবং গুণ্ডার বৃদ্ধি হইলে রাজ্যে বহু প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

# ঈশ্বরের সন্ধানে

কালদুষ্ট এইপ্রকার বিশৃঙ্খল অবস্থায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সুষ্ঠু পালন আদৌ সম্ভবপর নহে। যাহা কিছু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নামে চলিতেছে, তাহাও আসুরিক-ধর্ম্মের আর একটা সংস্করণ মাত্র। সেই প্রকার আসুরিক-বর্ণাশ্রম যাজন করতঃ তথাকথিত সূত্র-সংস্কারে উপবীত ধারণ করিয়া কোনই লাভ নাই বা সুকৃতির সম্ভাবনা নাই। সকল সংস্কার পরিত্যাগ করতঃ সমাজে "হাম বড়া" হইবার জন্য কলিহত জীবের *বিপ্রত্বং সূত্রমেব হি* ভবিষ্যদ্বাণী পালন করিয়া কোন প্রকার সুকৃতি অর্জ্জন করিবার সুবিধা নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রকার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকেই বাহ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেজন্য গীতায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা না করিয়া, যজ্ঞার্থে কর্ম্মের উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। সুতরাং যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিলেই বিষ্ণুপ্রীতি হইবে এবং তাহাতেই সমস্ত ক্লেশঘ্ন শুভদ ফল নিহিত আছে, জানিতে হইবে।

যাঁহারা রোগ-শোকাদি দ্বারা প্রপীড়িত, তাঁহারাই আর্ত্ত বলিয়া পরিচিত। সাধারণভাবে সকল লোকই ঔষধ-বৈদ্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রোগ-শোকাদি প্রতিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ বলেন,—রোগ-শোকাদি যত প্রকার ক্লেশ আমাদের হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্ব পাপাচরণেরই ফল। সেই সকল পাপ প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, কূটস্থ অবিদ্যা-দ্বারাই কৃত হয়—সাধারণ ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারে না। ঔষধাদি গ্রহণে তাৎকালিক কিছু সুবিধা হইলেও তাহাদ্বারা ক্লেশের যে আদি-কারণ তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না। ভগবানের





শরণাগতি-দ্বারাই আত্যন্তিক উপকার হয়। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* আলোচনা করিলে এই প্রকার পাপ, পাপবীজ এবং অবিদ্যা, ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে কিরূপে নষ্ট হয় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সেইজন্য সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণই দুঃখের সময় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হন। তাৎকালিক রোগ-শোকাদি প্রশমন করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু জন্ম, মৃত্যু, জরা-ব্যাধি রূপ শত শত প্রকারের ক্লেশ হইতে অর্থাৎ এককথায় ভবরোগ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য যে "ভবৌষধি" তাহারই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সেইজন্য সুকৃতিবান্ ব্যক্তি সাধু-শাস্ত্ররূপ সদ্বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজের আত্যন্তিক মঙ্গলের চেষ্টা করেন। সাধু-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হইলেই ভগবদ্ভাবরূপ ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং তাহাতেই সকল অনর্থ বা ভবরোগের কারণ নিবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ ভগবানে প্রপত্তি লাভ করা যায়।

নিষ্কপট শিক্ষার্থিগণকে জিজ্ঞাসু বলা যাইতে পারে। নিষ্কপট শিক্ষার্থিগণই সমাজের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল। ধীশক্তি-সম্পন্ন সুকুমারমতি-বালকগণ প্রায়ই জিজ্ঞাসু হয়। তাহারা পিতামাতার নিকট প্রত্যেকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়া লয়। সেইপ্রকার ধীশক্তি-সম্পন্ন বালক-বালিকাগণকে তাহাদের উপযুক্ত পিতামাতা বা গুরুজন সকল বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলে, তাহারা সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং উত্তরোত্তর বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দূরদর্শী হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার মেধাবী সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা সুকৃতিশালী বা পুণ্যবান্, তাঁহারাই ভগবদ্বিষয় জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত বা উৎসুক হন। যাঁহারা কেবলমাত্র ইতর-জ্ঞান অর্জ্জন করিবারই চেষ্টা করেন, তাঁহাদের জীবনে কোন প্রকার সুফল লাভ না হইয়া স্থূল-তুষাবঘাতন-স্বরূপ কেবল ক্লেশই লাভ হয়। যাঁহারা ইতর-জ্ঞান ব্যতীত আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন, তাঁহারা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু বলিয়া পরিচিত। সুতরাং সেইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বা

তাঁহার দাসানুদাসগণের নিকট প্রপন্ন হন। ইহা তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম-সঞ্চিত পুণ্য-কার্য্যের পরিচয়। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু পুণ্যবান ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ উন্নত-স্তরে পৌঁছিয়া *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্* (*গীঃ* ১৪/২৭)—ব্রহ্মের যে প্রতিষ্ঠা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে বুঝিতে পারেন এবং পরিশেষে তাঁহারই ভজনা করেন। সুতরাং স্বল্প পুণ্যবান ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্ত হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন—

*মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।*
*স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥*

সাধারণ গৃহস্থ সকলেই প্রায় অর্থার্থী। বিশেষ করিয়া আজকাল সকলেই অর্থের টানাটানিতে ক্লিষ্ট। সাধারণ-ব্যক্তির যে অর্থের পিপাসা, তাহা কেবলমাত্র ভোগের নিমিত্ত। ভোগি-সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়িয়া যাহার অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হয়, তাহার অর্থ জগতে কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা এবং তদানুষঙ্গিক বাড়ী, গাড়ী, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি লাভ করিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। যে সকল ব্যক্তিগণের কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই একমাত্র মূল উদ্দেশ্য, তাহারাই পূর্ব্বকথিত মূঢ় কর্ম্মি-সম্প্রদায়। কিন্তু তাহার মধ্যে কেহ যদি সুকৃতিবান্ হন, তাহা হইলে তিনি কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টা না করিয়া ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ ভগবানের সেবার জন্য যত্ন করেন। এই সকল কর্ম্মী, শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ না করিয়াও 'পারমার্থিক' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কারণ তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্যই থাকে—নিজ-ইন্দ্রিয়-তোষণ। *হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনম্*—এই কথা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানী, যোগীও দেখা যায়, কিন্তু ইঁহাদের সকলের নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তিই একমাত্র কাম্য। শ্রীল রূপ গোস্বামী-কৃত পারমার্থিক বিজ্ঞান-শাস্ত্র '*শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু*'ই এই প্রকার মিশ্র ভক্তগণকে শুদ্ধভক্তে পরিণত করিতে একমাত্র সমর্থ।



জ্ঞানী-অর্থে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ যাঁহারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে সকল বিষয়ই অবগত আছেন। জ্ঞানিগণ অমানী, অদাম্ভিক, শৌচ, আর্জ্জব, আচার্য্য উপাসনা প্রভৃতি বহুগুণে বিভূষিত হইয়া প্রায়ই সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া থাকেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, তাঁহাদের মধ্যে 'অহংগ্রহ'-উপাসনাদি বা 'আমিই ভগবান্' এরূপ একটি দোষ বা কষায় থাকিয়া যায়। তাঁহারা অহং *ব্রহ্মাস্মি* এই বেদ-বাক্যের বিকৃত অর্থ করতঃ শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইয়া অতন্নিরসন মাত্র কেবল-জ্ঞানলাভমূলে ক্লেশকর আলোচনাকে বহুমানন করেন। এইরূপ কেবল-জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ পূর্ণব্রহ্ম-জ্ঞান বা ভগবদ্‌জ্ঞান আশ্রয় করিতে গিয়া মায়াদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। মায়াদেবী 'মুক্তি' নামক শেষ জাল বিস্তার করিয়া এই সকল মায়াবাদী জ্ঞানিগণকে ভবসমুদ্রে আটকাইয়া রাখেন। তাঁহারা মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান হইয়া 'আমিই সেই', 'আমিই সেই' নামক মন-কলা খাইয়া তাহাতেই বিভোর হইয়া থাকেন।

এই সকল মায়াবাদী কোন প্রকারে সুকৃতি-লাভ করিলে এবং গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রাপ্ত হইলে (যেমন কাশীর মায়াবাদিগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক উদ্ধার-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) তাঁহাদের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমাত্ম-জ্ঞান অসম্পূর্ণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এই অবস্থায়ই তাঁহারা ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যান। সনকাদি মুনিগণ, শুকদেব গোস্বামীর ন্যায় বহু জ্ঞানি-সম্প্রদায় পরে এই ভগবজ্‌জ্ঞানের আস্বাদন পাইয়া, ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্ময় লীলাকথাই কীর্ত্তন করতঃ জীবন ধন্যাতিধন্য করিয়াছিলেন।

*পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্য উত্তমঃ শ্লোকলীলয়া।*
*গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥*

(ভা ২/১/৯)

নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও শুকদেব গোস্বামী স্বীয় পিতা

শ্রীব্যাসদেবের নিকট ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ করিয়া সেই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-কথায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তিনিই মহারাজ পরীক্ষিতের সম্মুখে সর্বপ্রথম পঞ্চমপুরুষার্থ শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত সুকৃতিবান্ আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানিগণের বিষয়ে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

*তত্র প্রধানীভূতাসু ভক্তিষু মধ্যে আর্ত্তাদিষু ত্রিষু যাঃ কর্ম্মমিশ্রাস্ত্রিশঃ সকামাঃ ভক্তাঃ, তাসাং ফলং তত্তৎকাম-প্রাপ্তিঃ। বিষয়াদ্‌-গুণাৎ তদন্তে সুখৈশ্বর্য্য-প্রধান সালোক্য-মোক্ষপ্রাপ্তিশ্চ; ন তু কর্ম্মফল-স্বর্গভোগান্ত ইব পাতঃ; যদ্বক্ষ্যতে,—'যান্তি মদ্‌যাজিনো মাম্‌' ইতি চতুর্থ্যা জ্ঞানমিশ্রায়াস্তুতঃ উৎকৃষ্টায়াস্ত ফলং শান্তরতিঃ সনকাদিস্বিব। ভক্তভগবৎ কারুণ্যাধিক্যবশাৎ কস্যাশ্চিৎ তস্যাঃ ফলং প্রেমোৎকর্ষশ্চ শ্রীশুকাদিষ্বিব। কর্ম্মমিশ্রাভক্তির্যদি নিষ্কামা স্যাৎ, তদা তস্যাঃ ফলং জ্ঞানমিশ্রাভক্তিঃ তস্যাঃ ফলমক্তমেব। কচিচ্চ স্বভাবাদেব দাসাদি ভক্তসঙ্গেথ—বাসনাবশাদ্বা জ্ঞানকর্ম্মাদিমিশ্র-ভক্তিমতামপি দাস্যাদিপ্রেমা স্যাৎ, কিন্তু ঐশ্বর্য্যপ্রধানমেবেতি। অথ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রায়াঃ শুদ্ধায়াঃ অনন্যা-কিঞ্চন-উত্তমাদিপর্য্যায়া ভক্তের্বহুপ্রভেদায়া দাস্য-সখ্যাদি-প্রেমবৎ পার্ষদত্বমেব ফলম্‌ ইত্যাদিকং শ্রীভাগবত-টীকায়াং বহুশঃ প্রতিপাদিতম্‌। অত্রাপি প্রসঙ্গবশাৎ সাধ্যো ভক্তিবিবেকঃ সংক্ষিপ্য দর্শিতঃ ॥*

অর্থাৎ—"আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী প্রভৃতি তিন প্রকার যে ভক্ত, তাঁহারা সকাম-ভক্ত এবং তাঁহাদের ভক্তি প্রধানীভূতা বা মিশ্রভক্তি। সেই সেই ভক্তের প্রাপ্তিফল—সেই সেই কামনায় সিদ্ধিলাভ। তাহার পর সেই-সকল ভক্তের সুখৈশ্বর্য্য-প্রধান সালোক্য-মোক্ষ বা বৈকুণ্ঠ



প্রাপ্তি। কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মীদিগের ন্যায় অন্তবৎ স্বর্গাদি-প্রাপ্তি নহে। যথা কথিত হইয়াছে—"আমাকে যে যজনা করে, সে আমার নিকটই যায়।" আর চতুর্থ ভক্ত যে জ্ঞানী, তিনি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হন, যেহেতু তিনি জ্ঞানমিশ্র-ভক্ত। সনকাদির ন্যায় তাঁহার শান্তরতি লাভ হয়; পরন্তু, ভক্ত ও ভগবানের কারুণ্যাধিক্যবশতঃ ঐ সকল জ্ঞানী-ভক্তগণ ভগবৎ-প্রেমও লাভ করিয়া থাকেন,—যেমন শুকদেব গোস্বামী। কর্ম্মমিশ্র-ভক্তি নিষ্কাম হইলে তখন তাহা জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিতে পরিণত হয়। সেই জ্ঞানমিশ্র-ভক্তির ফল উপরে কথিত হইয়াছে। কখনও কখনও জ্ঞান-কর্ম্মাদিমিশ্র ভক্তগণের স্বভাব-প্রভাবে দাস্য-ভাবাদি সঙ্গলাভের ইচ্ছা হইলে ঐশ্বর্য্যপ্রধান দাস্য-ভক্তিও লাভ হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্র-ভক্তদিগের আরও বিশুদ্ধাবস্থা লাভ ঘটিলে তাঁহাদের দাস্য-সখ্যাদি প্রেমবশতঃ ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ হইয়া থাকে, — শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে। এস্থানে প্রসঙ্গবশতঃ কিছু কথিত হইল মাত্র।

# একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য

সাধারণতঃ জ্ঞানি-সম্প্রদায় অদ্বৈতপন্থী হইয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহারা চেতনের সন্ধান পাইয়াছেন এবং জড়ের তিক্ততা বোধ করিয়াছেন ও কর্ম্মের ব্যর্থতা অনুভব করিয়াছেন—ইহাই জ্ঞানিগণের অদ্বৈতবাদ অবস্থা। কিন্তু চিদনুসন্ধান পরিপূর্ণ হইলে, চেতন-রাজ্যে যে চিদ্ বিলাসরূপ সবিশেষত্ব বর্ত্তমান আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। ক্রমশঃ সেই চিদ্বিলাস-তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণ-তত্ত্বে আকৃষ্ট হন। যথা—

*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।*
*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥*

(*গীতা* ৭/১৯)

কৃষ্ণ-তত্ত্ব যাঁহার অনুভব হয়, ত্রিজগতের মধ্যে তাঁহার 'তিক্ত' বলিয়া কোন বস্তু থাকে না। সম্বন্ধ-জ্ঞান পরিপুষ্ট হওয়ায় কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই সমস্ত জগৎই, মুমুক্ষুদিগের ন্যায় প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি না হইয়া, 'কৃষ্ণ সেবায় উপকরণ' বা 'বাসুদেবময়' —তাঁহার এই ভাবের উদয় হয়। তখন বাসুদেবময় জগৎ কৃষ্ণ হইতে আর স্বতন্ত্র-বস্তু থাকে না। তিনি সেই সকল বস্তুর চরম উপাদেয়ত্ব অনুভব করেন। বাসুদেব-পর জগতে মায়ার কোন অধিকার না থাকায় তাহা তাঁহার নিকট বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়। সেই-প্রকার কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানী-ভক্ত যে কেবলমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মে নিজেই প্রপত্তি করেন তাহা নহে, পরন্তু পৃথিবীর সকলকেই সেই শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া 'মহাত্মা' নামে অভিহিত হন। এই প্রকার 'মহাত্মা'গণই যথার্থ মহাত্মা, তাঁহারা খুবই সুদুর্লভ।





সাধারণতঃ তথাকথিত মহাত্মাগণ জগৎকে বাসুদেবময় না জানিয়া নিজেই 'বাসুদেব' সাজিয়া সেবা গ্রহণ করিবার ছলনা করিয়া মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহারা বহু কামনা দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া, বাসুদেব ব্যতীত অন্যান্য ইতর দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন।

*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।*
*তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥*

(*গীতা* ৭/২০)

কামনা-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ রোগ-শোকাদির দ্বারা নষ্টবুদ্ধি হইয়া 'হৃতজ্ঞান' শব্দে শব্দিত হন। সেই-প্রকার হৃতজ্ঞান ব্যক্তি অন্যান্য দেবতার পূজা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। হৃতজ্ঞান বহ্বীশ্বরবাদী। বহ্বীশ্বরবাদিগণ বুঝেন না যে—"কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়"। তাঁহাদের ধারণা—সূর্য্যাদি দেবগণ বিষ্ণুর সমান। সেই প্রকার মায়িক বিচারে পতিত হইয়া হৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণ কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তি করিতে অসমর্থ হন। কিন্তু যাঁহারা উদার-ধী-সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহারা জানেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর; তাঁহাদের কোন প্রকার কামনা থাকিলেও তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যথা—

*অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।*
*তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥*

(ভাঃ ২/৩/১০)

যাঁহার যে-কামনাই থাকুক না কেন, তাহার সিদ্ধির জন্য ( ইতঃ পূর্ব্বে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন) তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা সেই পরম-পুরুষ বা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আরাধনা করা কর্ত্তব্য। স্বভাবতঃই যাঁহারা কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ তাঁহারা যদি কামনা লইয়াও পরম-পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে

প্রপত্তি করেন, তাহা হইলে স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের কামনাকষায় দূর হইয়া ভগবৎ-প্রেমরূপ অমৃত আস্বাদনের সুযোগ লাভ হয়। সুতরাং , নষ্টবুদ্ধি না হইয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, পরতত্ত্ব-বস্তু হইয়া জীবের অণুস্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করেন না। 'একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।" —সূর্য্যাদি দেবগণ সকলেই ভগবানের আজ্ঞানুসারে কার্য্য সমাধা করেন, এবং সেইজন্য তাঁহারা দেবতা বলিয়া খ্যাত। কারণ ভগবদ্ভক্তমাত্রই দেবতা-পর্য্যায়ে পরিগণিত; আর তদ্বিপর্য্যয় যাহারা, তাহারা অসুর-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। সুতরাং দেবতাগণের নিজের কোন স্বতন্ত্র ক্ষমতা নাই। এমন কি তত্তৎ দেবতাগণের প্রতি শ্রদ্ধা উদয় করাইবারও ক্ষমতা সেই দেবতাগণের নাই; তাহাও শ্রীভগবান-কর্ত্তৃক সাধিত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার একাংশে পরমাত্মারূপে সকল জীবের হৃদ্দেশে অবস্থান করিয়া তত্তৎ দেবতাগণের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করেন। ইহাই অন্তর্য্যামীর কার্য্য। কারণ সূর্য্যাদি দেবগণের যে বিভূতি, তাহা ভগবানেরই শক্তি। শক্তির দিকে আকৃষ্ট হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির ক্রমশঃ শক্তিমানের দিকে আকর্ষণ হয়। ব্যতিরেকভাবে সেই সেই দেবতাগণের পূজা দ্বারা অবিধিপূর্ব্বক ভগবানেরই পূজা হইয়া থাকে। কামনাসক্ত জনগণ শক্তিমান অপেক্ষা শক্তির প্রতিই অধিক আকৃষ্ট। যথা—

*যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।*
*তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥*
*স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।*
*লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥*

(*গীঃ* ৭/২১-২২)

রাজার তুলনায় রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের যে-রূপ ক্ষমতা, ইতর দেবতাগণেরও সেইরূপ ক্ষমতা। তাঁহাদের নিজের কোন ক্ষমতা নাই, কারণ তাঁহারা সকলেই জীব-তত্ত্ব। যে-জীবের প্রতি ভগবানের যেটুকু ক্ষমতা দেওয়া আছে, তাহা লইয়াই সে বাহাদুরী করিতে পারে। জীবের নিজের কোন স্বতন্ত্র ক্ষমতা নাই। সুতরাং, রাজপ্রদত্ত ক্ষমতা-প্রাপ্তি-হেতুই যেমন রাজকীয় কর্ম্মচারীর নিকট হইতে কিছু উপকারাদি পাওয়া যায়, সেইরূপ ভগবান্ দেবতাগণকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন, তদনুযায়ী দেবতাগণ সেই সেই যাজকগণের উপকার করিতে সমর্থ। কামনাযুক্ত দেবতা-যাজকগণের যদি কোন বুদ্ধি হয় যে, দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়ই তাঁহাদের কামনা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুদ্ধিমান হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। পৃথক্ পৃথক্ দেবতাগণের পৃথক্ পৃথক্ ক্ষমতা থাকে। যেমন—সূর্য্যের ক্ষমতা—রোগ প্রশমিত করা, চন্দ্রের ক্ষমতা—ওষধি বৃক্ষ সমূহকে বীর্য্যবান্ করা, দুর্গার ক্ষমতা—বল-বীর্য্য দান করা, সরস্বতীর ক্ষমতা—বিদ্যা দান করা, লক্ষ্মীর ক্ষমতা—ধনাদি দান করা, চণ্ডীর ক্ষমতা—মদ্য মাংস খাইবার সুবিধা দেওয়া, গণেশের ক্ষমতা কার্য্যসিদ্ধি করা—ইত্যাকার বহু দেবতার বহু প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ক্ষমতা থাকিলেও তাহা সমস্তই ভগবৎ-প্রদত্ত শক্তি জানিতে হইবে। এক দেবতার নিকট এক সুবিধা পাওয়া যায়, অন্য দেবতার নিকট অন্যরূপ সুবিধা মিলে। কিন্তু পূর্ণ ভগবানের নিকট সকল সুবিধাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কূপমণ্ডুকের জলাশয় আর প্রবহমান নদীর জলাশয়, উভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য বর্ত্তমান।

আমরা পূর্ব্বে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি যে, জগতে সমস্ত ব্যাপারই ক্ষেত্র-শক্তি ও ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি—এই উভয়েরই সংঘর্ষে উৎপাদিত। সেই দুই শক্তি পূর্ব্বে 'পরা ও অপরা' নামে অভিহিত হইয়াছে এবং দুই-ই ভগবানের প্রকৃতি—ইহা জানিতে পারিয়াছি। সুতরাং জগতের সমস্ত ব্যাপারই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-পরিণাম মাত্র। শক্তি ও শক্তিমান-তত্ত্ব সর্ব্বদাই অপৃথক্ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। অগ্নি ও অগ্নির

দাহিকা-শক্তি একত্রই সম্পর্কিত। কিন্তু মায়াবাদিগণ শক্তির পরিণাম না বুঝিয়া জগতে বিপর্য্যয় উপস্থাপন করিয়াছেন।

দেবতাগণ বা জীবগণ সকলেই শক্তিতত্ত্ব। কেহই শক্তিমান-তত্ত্ব নহেন। জগৎও শক্তি-তত্ত্ব। এই সূক্ষ্ম অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে পরিশেষে মায়াবাদী হইয়া যাইতে হয়। ফলে, ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিস্তব্ধ হইতে হয়। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্—শক্তিমান্-তত্ত্ব; তাঁহাকে 'নির্ব্বিশেষ' ব্রহ্ম বলিলে ব্রহ্মের পূর্ণতার হানি করা হয়। ব্রহ্মের পূর্ণতা একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে জানিতে হইবে। তিনি অসমোর্দ্ধ পরাৎপর তত্ত্ব, তাঁহার সমান বা অধিক কেহই নাই। তাই তিনি—*একমেবাদ্বিতীয়ম্*। তাঁহার শক্তি বহুভাবে প্রকাশিত দেখিয়া বিভ্রান্ত ব্যক্তিগণই বহ্বীশ্বরবাদী হইয়া পড়েন। সুতরাং, আমাদের বোধগম্য হওয়া আবশ্যক যে—জগতে যতপ্রকার বৈচিত্র্য আছে, তাহা সমস্তই ভগবানেরই শক্তির পরিচয়। মায়াবাদিগণ এই 'শক্তির পরিণাম' বাদ দিয়া 'বিবর্ত্ত'-আশ্রয়ে ব্রহ্মকে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ভগবানের নির্ব্বিশেষ পরিচয় যে স্থলে কথিত হইয়াছে, সে স্থলে ভগবান্ স্বয়ং *'পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ', 'জীবনং সর্বভূতেষু', 'বলং বলবতাং চ', 'বুদ্ধিঃ বুদ্ধিমতাং', 'তেজস্তেজস্বিনাম্'* ইত্যাদি কথায় বহুপ্রকারে নিজের নির্ব্বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। এই সমস্ত নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ পরিচয় দ্বারা অচিন্ত্য—শক্তিমান্ পুরুষ একই কালে 'সম' এবং 'পৃথক' পরিচয়ে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই প্রতিস্থাপিত করিয়াছেন। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্বই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে এইভাবে নিঃসৃত হইয়াছে, যথা—

*মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥* (গীঃ ৭/১২)

অর্থাৎ সমস্ত চরাচর বস্তুই তাহা হইতে প্রভাবিত ও বিভাবিত হইলেও তিনি তাহাতে নাই, কিন্তু সমস্ত বস্তুই তাহাতে আছে।



শক্তিমান্ হইতে সমস্ত শক্তি প্রবাহিত হইলেও, শক্তির কার্য্য হইতে তিনি স্বয়ং পৃথক। শক্তি তাঁহাতে নিহিত থাকিলেও, তিনি শক্তি-কার্য্যে নিহিত নহেন। এই সিদ্ধান্তে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, দেব-দেবিগণের শক্তি শক্তিমান্ ভগবানেই নিহিত, কিন্তু সেই সেই দেবতাগণ কখনও ভগবান্ নহেন। সুতরাং দেবগণের প্রদত্ত ফল কখনই নিত্যমঙ্গল বিধান করিতে পারে না।

*অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।*
*দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥*
(গীঃ ৭/২৩)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সকাম ভক্তগণ যদি কামনার বশবর্তী হইয়াও অন্যান্য দেবতাগণের আরাধনা না করিয়া কেবলমাত্র ভগবানেরই আরাধনা করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন। সকাম-কর্ম্মিগণ কর্ম্মযোগ-পন্থা হইতে নিষ্কাম জ্ঞানযোগ-পদে অধিরূঢ় হইবেন। তাহা হইলে সাধারণ কর্ম্মীর ন্যায় নশ্বর স্বর্গাদি লাভ না করিয়া বৈকুণ্ঠে-সালোক্য মুক্তি লাভ করিবেন। দেব-যাজকগণ দেবলোকে গমন করেন। সেই দেবলোক বা স্বর্গলোক-সমস্তই অনিত্য বস্তু। পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় স্বর্গাদি লোক হইতে এই ভূলোকে আসিতে হয়। কিন্তু ভগবদ্ ভক্তগণ—ভগবল্লোক বা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগকে আর এই মরলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

# কলিকালে নাম-রূপে কৃষ্ণ অবতার

অল্পমেধাবী ব্যক্তিগণই অনিত্য ফল-লাভের আশায় অন্য দেবতার আরাধনা করে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, একমাত্র ভগবানের আরাধনা করিলেই যদি সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকল ব্যক্তিই সেই পথ অবলম্বন করে না কেন? দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"মহারাজ, যাহাদের অল্প পুণ্য সঞ্চয় আছে তাহাদের নাম-ব্রহ্মে, বৈষ্ণবে, গোবিন্দে এবং মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয় না।" *ভগবদ্‌গীতায়ও* ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাই স্বয়ং সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—

*যেষাস্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।*
*তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥*

(*গীঃ* ৭/২৮)

পাপাবিষ্ট অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণের বিদ্বৎপ্রতীতি জন্মায় না। যাঁহারা স্ব-স্ব-ধর্ম্ম-সম্মত জীবন স্বীকার করতঃ প্রভূত পুণ্যকর্ম্মদ্বারা পাপসমূহ দূরীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই আদৌ কর্ম্ম-যোগ স্বীকার, পরে জ্ঞান-যোগ ও পরিশেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা সমাধিক্রমে ভগবানের চিৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। সেই প্রকার পুণ্যবান ব্যক্তিই ভগবানের নিত্য-স্বরূপ শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ বিদ্বৎ-প্রতীতিতে দেখিতে পান,—





*বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং*
*বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।*
*কন্দর্পকোটি-কমনীয়বিশেষশোভং*
*গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥*

(*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩০)

পাপের দ্বারা অবিদ্যারূপ ঘোর অন্ধকার বিস্তার-লাভ করে, আর পুণ্যদ্বারা জ্ঞানরূপ আলোকের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই পুণ্যদ্বারা যে জ্ঞান সঞ্চয় হয়, তাহাই বিদ্বৎ-প্রতীতি। নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীব-হিংসাদি ব্যাপার সাধন করিয়া যাহারা কেবলই পাপকর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদের বিদ্বৎ-প্রতীতি লাভ করা একান্ত দুরূহ ব্যাপার। পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা বা সাধুসঙ্গ প্রভাবে বিদ্বৎ-প্রতীতি উদিত হইলেই, দ্বৈতাদ্বৈত-রূপ দ্বন্দ্ব-মোহ হইতে নির্ম্মুক্ত ব্যক্তি *'একমেবাদ্বিতীয়ম্'* ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া দৃঢ়ব্রত হইয়া তাঁহাকেই ভজন করেন। কেবলমাত্র পুণ্যকর্ম্ম দ্বারাই ভগবদ্দর্শন হয় না। পুণ্যকর্ম্ম সম্যক্ সাধিত হইলেই সত্ত্বগুণ উত্থিত হয় এবং তদ্দ্বারা তমোগুণাদি মোহ ধ্বংস হইয়া যায়। রজস্তমোগুণ ধ্বংস হইলেই বিদ্বৎ-প্রতীতি প্রকাশ পায়।

এস্থলে বিবেচনা করা উচিত যে, কলিকালে পুণ্যকর্ম্ম করিবার যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি যে পদ্ধতি, তাহা সাধন করিবার সামর্থ্য সাধারণ ব্যক্তির আছে কি না? ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, সেই সকল ব্যয়বহুল কার্য্য কলিহত জীবের আদৌ সম্ভবপর নহে। তজ্জন্যই কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এই মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন,—

*হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।*
*কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥*

কলিকালে একমাত্র শ্রীহরিনামেরই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। এ বিষয়ে বহু শাস্ত্রে বহু প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কলিকালে একমাত্র নামযজ্ঞ-সাধনেই সর্ব্বার্থসিদ্ধ হয়। *হরের্নাম* বা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় নামেরই শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সমস্ত অভদ্ররাশি নষ্ট হইয়া যায়—

*অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*
*ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি ।*
*(ভাঃ ১২/১২/৫৫)*

সুতরাং আমাদের দ্বন্দ্ব ও মোহরূপ অভদ্রাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে সেই শ্যামসুন্দর মুরলীধর ভগবদ্বিগ্রহকে বা তদ্‌ভিন্ন নিত্য, পূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত শ্রীভগবন্নামকে সর্ব্বদাই স্মরণপথে রাখিতে হইবে। সেই কথাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিস্তৃতভাবে গীতায় ব্যক্ত করিলেন। যথা—

*যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।*
*তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥*
*তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।*
*ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥*
*(গীতা ৮/৬-৭)*

মৃত্যু সময়ে যিনি যে-ভাব পোষণ করিয়া উপস্থিত শরীর ত্যাগ করেন, পরজন্মে তিনি সেই সেই ভাবগত শরীর প্রাপ্ত হন। উপস্থিত পঞ্চভূতাত্মক জড়-শরীর নষ্ট হইলে, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার গঠিত যে সুপ্তাবস্থার সূক্ষ্ম-শরীর আছে, তাহা মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। যেরূপ বায়ু-প্রবাহ হইতে স্থূল-বিশেষের ভাব প্রবাহিত হয়, সেই প্রকার মৃত্যুকালের মন বুদ্ধি-অহঙ্কার সম্বলিত ভাব পরজন্মে জড়-শরীরে প্রকটিত হয়। কোন উত্তম সুগন্ধি ফুল-ফল শোভিত উদ্যান বাটীকা



হইতে প্রবাহিত বায়ু যেমন সুগন্ধই বহন করিয়া লইয়া যায় এবং কোন দুর্গন্ধময় স্থান হইতে প্রবাহিত বায়ু যেরূপ দুর্গন্ধময় হইয়াই প্রবাহিত হয়, সেই প্রকার জীবিত-কালের মন-প্রবাহ আচার-ব্যবহারে আবিষ্টচিত্ত হইয়া মৃত্যুকালে ভাবরূপে উদিত হয় এবং সেইভাব সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা প্রবাহিত হইয়াই পরজন্মে স্থূল-শরীরে প্রকাশিত হয়। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে 'Face is the index of the mind', মনের ভাব শরীরে প্রকাশ পায় এবং মনেই পূর্ব্বজন্মের সংস্কার গঠিত হয়। অতএব মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারেই পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের সংস্কার গঠিত হয়। অতএব, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারই পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের সামঞ্জস্য বিধান করে। দিবাভাগে আমরা যে যে কার্য্যে ব্যস্ত থাকি সেই সেই কার্য্য মনের উপর প্রভাবিত হইয়া রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় বহুপ্রকার ভাব প্রকাশ করে। এই প্রকারে আমৃত্যু আমরা যে-যে ভাবে জীবন-যাপন করি, তাহাই মৃত্যুকালে ভাবরূপে মনে উদিত হয় এবং তাহাই পরজন্ম গঠন করে। সুতরাং বর্ত্তমান শরীরের স্থিতিকালেই আমরা ভগবানের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য এবং শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি রূপ চিৎ-তত্ত্বের আলোচনা করিলে, মৃত্যুকালে তদ্রূপ ভাবেরই প্রকাশ স্বাভাবিক। এইরূপ চিদালোচনা দ্বারা ভগবদ্ভাব প্রকটিত হইলে পরজন্মেই আমরা ভগবদ্ধাম লাভ করিতে পারি। অতএব, সেই প্রকার ভাবের উদয় করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্য সাধারণ জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'তুমি যুদ্ধও কর' এবং 'আমাকেও স্মরণ কর'। ইহারই নাম কর্ম্মযোগ। তজ্জন্য ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাদের শরীরযাত্রা নির্ব্বাহাদি সমস্ত কর্ম্মে, এমন কি, যুদ্ধ-বিগ্রহাদির মধ্যেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই স্মরণ-পথে রাখিয়া চলেন। তাঁহাদের দেহ-রথের সারথি স্বয়ং ভগবান্ পার্থসারথি। এই প্রকার ভগবদর্পিত দেহ, গেহ, মন সমস্তই ভগবদিচ্ছায় চালিত হইয়া পরিশেষে সেই ভক্তগণ এই জড়

শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর পরিত্যাগ করতঃ ভগবদ্ধামেই উপনীত হন।

বস্তুতঃ উপরিউক্ত ভগবন্নামের নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিই বিশুদ্ধ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পূর্ব্বে যে কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই সেই কার্য্যে দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে বহুপ্রকার অসুবিধার কথা আছে। বিশেষতঃ শুদ্ধভক্তি পর্য্যায়ে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের সম্যক্ দর্শনলাভ ঘটে না। যে-শুদ্ধভক্তি লাভ হইলে *ভক্ত্যা মামভিজানাতি* ইত্যাদি বিচারের সার্থকতা হয়, তাহার প্রথম অবস্থা এইরূপ—

*অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।*
*তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥*
(গীঃ ৮/১৪)

শুদ্ধভক্তির প্রথম লক্ষণ—অনন্যচিত্ত। ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ বা ব্যাপারই যাঁহার চিত্তে স্থান পায় না, তাঁহাকেই অনন্যচেতা শুদ্ধ ভক্ত বুঝিতে হইবে। এই শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে অন্যান্য মহাজনগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহারও কিছু দিক্‌দর্শন করা যাইতেছে। গৌড়ীয়-আচার্য্য সম্রাট শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য এইভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন—

*অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্ ।*
*আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥*
(ভঃ রঃ সিঃ ১/১/৯)

আমাদের অন্যাভিলাষ থাকার জন্যই আমরা অন্যান্য দেবদেবীর আরাধনা করি। রোগ-শোকাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আর্ত্তাদি মিশ্র ভক্তগণ যে সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনা করেন, তাহার কারণ এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে তাঁহাদের সন্দেহ আছে। ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ সূর্য্যাদি দেবগণ আমাদের রোগাদির হস্ত



হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, আর শ্রীকৃষ্ণ পারেন না—এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধিই 'অন্যাভিলাষ'। এই প্রকার সন্দেহবাদ অপসারিত হইলেই শুদ্ধভক্তির গৃহে প্রবেশ-লাভ হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতেও ভুক্তি ও মুক্তির অভিলাষ থাকে। সুতরাং সেই সমস্ত বিষয় হইতে সম্পূর্ণ অনাবৃত অবস্থায় যে অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন সম্ভব হয়, তাহাই 'উত্তমভক্তি'। দেবর্ষি শ্রীনারদও বলিয়াছেন—

*সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্ ।*
*হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥*
(*নারদ-পঞ্চরাত্র*)

শরীর ও মন সম্বন্ধে আমাদের যে বিবিধ পরিচয় আছে, তাহা সমস্তই উপাধি। স্বরূপের সেই সমস্ত উপাধি নাই। স্বরূপের একমাত্র পরিচয়—ভগবানের দাস ও অংশবিশেষ। অতএব উপাধিশূন্য হইলেই 'তৎ'পরত্ব লাভ হয়। এবং তৎপরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মায়া-মুক্তি নির্ম্মলতা লাভ করে। সেই প্রকার নির্ম্মল ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবার নামই শুদ্ধভক্তি, ইহাই শুদ্ধভক্তির পরিচয়।

'অনন্যচেতা' ও 'নিত্যযুক্ত'—এই শব্দ দুইটি এক তাৎপর্য্যপর। ভগবদ্-বিষয়ে অনন্যচেতা না হইলে নিত্যযুক্ত হওয়া যায় না। ভগবানেই নিত্যযুক্ত থাকিলে কর্ম্ম-জ্ঞান, অন্যান্য দেবারাধনা, স্বর্গাপবর্গাদি ফলপ্রাপ্তি-বাঞ্ছা সমস্তই তিরোহিত হইয়া অনন্যচেতা হওয়া যায়। 'সতত' শব্দে বুঝিতে হইবে—দেশ, কাল, পাত্র, শুদ্ধ, অশুদ্ধাদি অবস্থার অপেক্ষা না করিয়া, সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের সকল ব্যক্তিই স্ত্রী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি, এমনকি চণ্ডালদিগের সকলেই অন্যান্য জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-চেষ্টা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া অনন্যচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারেন। 'নিত্য' শব্দে প্রতিদিনই। সর্ব্বক্ষণই যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকটই ভগবান্ সুলভ।

*ব্রহ্মসংহিতায়* এরূপ বলা হইয়াছে, যথা—

*অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-*
*মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।*
*বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥*

(*ব্রঃ সং ৫/৩৩*)

বেদেরও অগম্য, কিন্তু শুদ্ধ আত্মভক্তিরই লভ্য সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। তিনি সমস্ত বেদাদি-শাস্ত্রদ্বারা দুর্লভ হইলেও নিজ ভক্তগণের নিকট সর্ব্বদাই সুলভ।

সকল প্রকার ধর্ম্ম-যাজন করিতে বা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধন করিতে গিয়া আমাদিগকে যে পরিশ্রম, অর্থব্যয় এবং পুণ্য-পাপাদি সঞ্চয় করিতে হয়, একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলেই সেই সমস্ত ক্লেশ বা কার্য্য হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই বিশ্ববাসী সকলের পক্ষে সুলভে প্রাপ্তি ঘটায়। তিনি আনন্দময় লীলা-পুরুষোত্তম এবং তাঁহার ভজনে একমাত্র 'অনন্য-ভক্তিই' প্রয়োজন; অন্য কোন প্রকার আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে কোন প্রকার হিংসাবৃত্তি নাই। কেবলমাত্র জঘন্য-বৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বা শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তকে হিংসা করিয়া থাকে। কৃষ্ণ ভজনে সুখ, কৃষ্ণ লাভে সুখ এবং কৃষ্ণভক্তই সুখী।

# মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি জ্ঞান

কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী বা সাধারণ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং অপরাপর সকলেই যাঁহারা এই দুঃখময় জগৎকে সুখময় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের ভালভাবেই বুঝা আবশ্যক যে, এই জগৎ অত্যন্ত দুঃখময় এবং অনিত্য। এই জগতে থাকিবার জন্য আমরা যতই পাকা বন্দোবস্ত করি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত এস্থান হইতে আমরা চলিয়া যাইতে বাধ্য। যতদিন এখানে থাকা যায়, ততদিনই কেবল 'দুঃখের সহিত বুঝা-পড়া' করিতে হয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া এইভাবে আমাদের 'যাওয়া-আসা' চলিতেছে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ এই জগতে যে কেবল সুখে বাস করেন তাহা নহে পরন্তু যে-জগতে তাঁহারা গমন করেন তাহাও নিত্য আনন্দময়। ভগবদ্ভজনশীল ব্যক্তিগণ ভগবদ্ধামেই গমন করেন। *যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।*

শ্রীভগবান্ এস্থলে পুনরায় নিম্নোক্তরূপে বলিয়া তাঁহার পূর্ব্ববাক্যের পরিসমাপ্তি করিতেছেন—

*মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।*
*নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥*

(*গীঃ ৮/১৫*)

নিত্যযুক্ত মহাত্মাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট চলিয়া গেলে তাঁহাদিগকে আর এই দুঃখালয়ে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধি *সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ* লাভ করায় ভগবানের নিত্যলীলার পরিকরত্ব প্রাপ্ত হন। যোগিগণের 'অষ্টসিদ্ধি' আর এই

'পরমসিদ্ধি' এক বস্তু নহে। যোগীদিগের অষ্টসিদ্ধি—প্রাকৃত বা ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু ভগবৎ-সেবায় যে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাই অপ্রাকৃত সিদ্ধি বা নিত্যসিদ্ধি। ভগবানের সৃষ্ট অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নিত্যকালই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভৌমলীলা নিত্য প্রকটিত আছে। সূর্য্য যেমন একই স্থানে অবস্থান করা সত্বেও ব্রহ্মাণ্ডস্থিত কোটি কোটি বসুধাদিতে লোকচক্ষে 'উদয় হন' এবং 'অস্ত যান' এবং সেইভাবে চিরদিনই প্রতীয়মান হন, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নিত্যকাল তাঁহার নিত্যধাম গোলোকে অবস্থান করিয়াও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই নিজলীলা প্রকটিত করেন। 'প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত হইল, আর সন্ধ্যাকালে সূর্য্য অস্ত গেল'—এই প্রকার ধারণা যেমন আমাদের ভুল এবং লৌকিক (কেন-না, সূর্য্য কোন দিনই উঠেন না বা কোন দিনই ডুবিয়া যান না।) সেই প্রকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অমুক অমুক সময়ে উদিত হইলেন বা অমুক সময়ে অমুক স্থানে অস্ত গেলেন বা অমুক স্থানে অমুকের দ্বারা হত হইলেন (?) —এই প্রকার সমস্ত ধারণাই ভুল বা লৌকিক। তাঁহার জন্ম-কর্ম্ম সমস্তই দিব্য বা অলৌকিক। সুতরাং সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব যাঁহাদের বোধগম্য হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে।

*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।*
*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুনঃ॥*

(গীঃ ৪/৯)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখনই যেখানে তাঁহার ভৌমলীলা বিস্তার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিত্য পিতামাতা শ্রীবসুদেব-দেবকীর মারফত শ্রীনন্দ-যশোদার পুত্ররূপে নিজেকে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ও শ্রীযশোদার নন্দনরূপে প্রকটিত করেন, সেই সেই স্থানেই যে-সমস্ত মহাত্মাগণ পরমা সংসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা তাঁহার পার্ষদরূপে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট



স্বরূপসিদ্ধ বা পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তগণ পরমসুখে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য পার্ষদ অর্জ্জুনকে লইয়া যে অন্যান্য অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের এই নিত্যলীলা প্রকটিত করেন, তাহা আমরা নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটিতে জানিতে পারি,—

*বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।*
*তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥*
*অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।*
*প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥*

(গীঃ ৪/৫-৬)

যে সকল ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইবার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিয়া ঔপাধিক ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া প্রাকৃত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি সাধনে যত্নবান্ হন এবং স্বর্গাপবর্গাদি সামান্য সুখ সুবিধা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা প্রাকৃত উচ্চাবচ স্থানে অবস্থিত হইয়া নাগর-দোলায় চড়িয়া বৃথা ঘুরিয়া মরেন। যথা—

*আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।*
*মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥*

(গীঃ ৮/১৬)

আমরা ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-মহঃ-জন-তপঃ-সত্য এবং ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত একটির পর আর একটি—এই প্রকার যত ঊর্দ্ধলোকেই আরোহণ করি না কেন, সে-স্থান হইতে আবার আমাদের ফিরিয়া আসিতে হয়। ঐ প্রকার পরলোকাদির কথা বাদ দিলেও, ইহলোকেই আমরা দেখিতে পাই—রাজা, মহারাজা, দেশপাল, রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি, নেতা প্রভৃতি

বহু লোকই বহু কষ্টসাধন করিয়া ঐ সকল উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার *পুনর্মূষিকো ভব* হইয়া নিম্নস্তরে চলিয়া যান। উচ্চ হইতে নিম্নে পতিত হইলে যে কিরূপ মৃত্যু-যন্ত্রণা হয় তাহা আমাদের 'লীডার' (চালক) গণ 'হাড়ে হাড়ে' উপলব্ধি করিয়া থাকেন। *দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ* ব্যক্তিগণ যদি কোনদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ প্রকার প্রকৃতির নাগর-দোলায় চড়িয়া *যন্ত্রারূঢ়ানি মায়ার* ন্যায় কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, কভু দাস, কভু প্রভু, কভু ব্রাহ্মণ, কভু চণ্ডাল, প্রভৃতি 'রং-বেরং' এর অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হইলেই আমাদের নিত্যস্বরূপের বিলাস আরম্ভ হয়।

শরীর ও মনস্তত্ত্বে আবদ্ধ হইয়া থাকিলেই যেমন কর্ম্মবশে জন্মজন্মান্তর শরীর-ত্যাগ ও পুনর্গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ শরীর ও মনস্তত্ত্বের যে অনিত্য প্রাকৃত বিলাস-ভূমি চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড, তাহাতে 'কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে' এইভাবে ভ্রমণ করিতে হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে, সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত আত্মার যে চিন্ময় বিলাসভূমি, সেইখানে অবস্থিত হইয়া যায়, সেই চেতন-ভূমি জড় ব্রহ্মাণ্ড ও অব্যক্তেরও অতীত। তেজ-বারি-মৃৎ বিনিময়ে প্রস্তুত এই শরীর যেরূপ নশ্বর, তদ্রূপ ক্ষিতি-অপ্-তেজ নির্ম্মিত মরীচিকাবৎ এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডও নশ্বর। আবার অপ্রাকৃত আত্মা, যাহা তেজ-বারি ও মৃত্তিকার বিনিময়ে কোন বৈজ্ঞানিকই আজ পর্য্যন্ত তাঁহার বহু গবেষণা-'ল্যাবরেটরী'তে প্রস্তুত করিতে পারেন নাই, সেই আত্মা এবং তাহার নিত্য বিলাসভূমিও অবিনশ্বর। দুই বস্তুই সনাতন। সনাতন বস্তুকে সনাতন ধামে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে উপায়, তাহাই 'সনাতন ধর্ম্ম'।

নিরীশ্বর সাঙ্খ্যকার কপিলাদি দার্শনিকগণ প্রাকৃত জগতের বিশ্লেষণ কার্য্যে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু জড় প্রকৃতির পরও যে সনাতন প্রকৃতি আছে তাহা তাঁহাদের সামান্য বুদ্ধিতে কুলাইয়া উঠে নাই, এবং তাঁহারা অকূল-পাথারে 'হাবু-ডুবু' খাইয়া শেষ পর্য্যন্ত 'অব্যক্ত' বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র জীব যত বড়ই মননশীল হউক না কেন, তাহার সমস্ত কার্য্যই একটি প্রাকৃত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। এই প্রকার বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর নিকট কখনই অগ্রসর হইতে পারা যায় না। সুতরাং যে-বস্তু প্রাকৃত বুদ্ধি-সীমার অতীত হইয়া বর্ত্তমান, তাহাকে 'অব্যক্ত' না বলিয়া আর উপায় কি? ইহারই নাম—'কূপ-মণ্ডূক-ন্যায়'। কূপ-মধ্যস্থিত মণ্ডূক তাহার সীমার বাহিরে যে মহাসমুদ্র বর্ত্তমান তাহা নিজবুদ্ধিতে কোনদিনই উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার ধারণা—নিজ কূপের জল ব্যতীত অন্য কোন বৃহৎ জলাশয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব। আমরাও সেই 'কূপ-মণ্ডূকে'র ন্যায় শরীর ও মনের 'কসরৎ' স্বরূপ যোগ-জ্ঞান ইত্যাদি লইয়া যতই আলোড়ন করি না কেন—যতই চিন্তাশীল দার্শনিক হই না কেন, আমাদের ঐ কূপসীমা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। সুতরাং সঙ্কীর্ণচেতা আমাদিগকে কে সেই মহাসিন্ধুর সন্ধান দিতে পারেন? আমরা ব্রহ্মাণ্ড-রূপ কূপের মধ্যে পড়িয়া *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ* পরিভ্রমণ করিয়া কত জন্ম-জন্মান্তর হাবু-ডুবু খাইতেছি, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? সেই কূপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন—একমাত্র ভগবান্ বা তাঁহারই ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিজ জন ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীরূপা সরস্বতী। তাঁহাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে মহাসমুদ্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহারই নাম অবরোহ-পন্থা এবং তাহাই অপ্রাকৃত জ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায়। অবরোহ-পন্থায় সেই সনাতন-ভূমিকার পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—



*সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।*
*রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥*
*অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।*
*রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥*

*ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।*
*রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥*
*পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।*
*যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥*
(*গীঃ* ৮/১৭-২০)

ব্রহ্মালোকে লক্ষ-লক্ষ বৎসর বাঁচিয়া থাকা যায় বলিয়া সাধারণ মনুষ্যগণ ব্রহ্মালোকের বহুমানন করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করিয়া এই ব্রহ্মালোক প্রাপ্তির জন্য বহু কৃচ্ছ্র-সাধন ও তপস্যা করিতে হয়। কিন্তু আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, সেই ব্রহ্মালোকের যিনি অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ব্রহ্মা, তিনিও চিরদিন বাঁচিয়া থাকেন না। যাঁহারা শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন—মনুষ্য মানের যে ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হয়, সেই প্রকার প্রায় বিয়াল্লিশ লক্ষ বৎসরে একটি চতুর্যুগ সম্পূর্ণ হয়। ঐরূপ একহাজার চতুর্যুগ সমাপ্ত হইলে তবে ব্রহ্মার একদিন সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রকার দিন, পক্ষ, মাসাদি বৎসর পরিমাণ করিয়া একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ুঃ। অতএব তিনিও নশ্বর এবং তাঁহার সৃষ্ট এই যে ব্রহ্মাণ্ড ইহাও নশ্বর। এবং তাঁহার সৃষ্ট মনুষ্য যে নশ্বর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের তুলনায় মনুষ্য যেরূপ অমর (?) আমাদের ক্ষুদ্র পরমায়ুর তুলনায় ব্রহ্মাদি দেবগণও সেইপ্রকার অমর (?)। প্রকৃতপক্ষে শরীরধারী মনুষ্য কেহই শরীর সম্বন্ধে 'অমর' নহে।

ব্রহ্মার দিবাভাগের শেষে যখন রাত্রিভাগ উপস্থিত হয়, তখনই স্বর্গলোক পর্য্যন্ত প্রলয়ীভূত হইয়া যায়।

জগতের সমস্ত প্রাণিগণ ব্রহ্মার দিবাভাগে সৃষ্ট হইয়া রাত্রিভাগে প্রলয়ীভূত হয়—*ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।*

# ভগবানের লীলাস্থান অনন্ত বৈকুণ্ঠধাম

ব্রহ্মার দিন ও রাত্রিব্যাপক অব্যক্ত ও ব্যক্ত ভাবাপন্ন যে জড় প্রকৃতি তাহার পরপারে সনাতন অর্থাৎ যাহার পুনঃ পুনঃ প্রলয় ও সৃষ্টি হয় না—এই প্রকার আর একটি নিত্য-স্বভাব বা ধাম বর্ত্তমান। তাহাই বৈকুণ্ঠজগৎ বলিয়া বিখ্যাত। আমাদের এই দৃশ্য-জগতের চরাচর সমস্ত প্রাণীসমূহের বিনাশ হইলেও সেই বৈকুণ্ঠ-জগৎ অবিনশ্বরই থাকে। এই বৈকুণ্ঠজগতে বা ভগবদ্ধামে প্রবিষ্ট হইলে, ব্রহ্মাণ্ডের জীবনিচয়ের ন্যায় পুনঃপুনঃ সৃষ্টি প্রলয়াদি দুঃখে আর অভিভূত হইতে হয় না। পরজগতে জড়াকাশের পরিবর্ত্তে যে চিদাকাশ আছে, তাহাই 'পরব্যোম' বলিয়া বিখ্যাত। সেই পরব্যোমের অন্তর্গত যে অপ্রাকৃত গোলোক বা মণ্ডলাদি বর্ত্তমান তাহাই ভগবানের নিত্যলীলা-স্থান অনন্ত-বৈকুণ্ঠ ধাম। পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, ভগবানের পরা ও অপরা নামে দুইটি প্রকৃতি আছে। পরা প্রকৃতি-সম্ভূত বৈকুণ্ঠাদি ধাম, আর অপরা প্রকৃতি-সম্ভূত এই জড় জগৎ। জীবশক্তিও ভগবানের পরাশক্তি-সম্ভূত। কিন্তু জীব-সকল বৈকুণ্ঠ এবং জড়জগৎ উভয় স্থানেই থাকিতে পারেন বলিয়া, পরাশক্তি-সম্ভূত হইলেও জীবশক্তিকে 'তটস্থা-শক্তি' নামে একটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। বৈকুণ্ঠজগৎ ভগবানের 'আত্মমায়া' বা অন্তরঙ্গা শক্তির বিকাশ। এই সমস্ত শক্তিতেই শক্তিমান্ তত্ত্ব যে ভগবান্, তাঁহার অধ্যক্ষতা আছে। সুতরাং আমরা এই যে জড়-জগৎ দেখিতে পাই, তাহাতেও তাঁহার অধ্যক্ষতা পূর্ণমাত্রায় আছে—ইহা অস্বীকার করিবার

উপায় নাই। উপমাস্থলে বলা যাইতে পারে, যেমন একটি কুম্ভ; কুম্ভের উৎপত্তির কারণ মৃত্তিকা, চক্ররূপ যন্ত্র এবং কুম্ভকার। কুম্ভ উৎপত্তিরূপ কার্য্যের প্রথমতঃ মৃত্তিকাই 'উপাদান-কারণ,' দ্বিতীয়তঃ কুম্ভচক্র 'নিমিত্ত-কারণ', আর তৃতীয়তঃ কুম্ভকারই 'প্রধান কারণ', সেই প্রকার প্রকৃতি সমস্ত জড়জগতের উৎপত্তির কারণ 'উপাদান' এবং নিমিত্ত-কারণ হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'প্রধান কারণ'। প্রকৃতি তাঁহারই ইঙ্গিতে সমস্ত কার্য্য ছায়ার ন্যায় করিয়া থাকেন। যথা,—

*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।*
*হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥*

(গীঃ ৯/১০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতায় এই জড় প্রকৃতিতে সমস্ত চরাচর প্রাণিগণ সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং তাঁহারই অধ্যক্ষতায় পুনরায় প্রলয়গত হয়। ইহাই নিত্য-সত্য-তত্ত্ব।

দুঃখের বিষয় এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে নিজতত্ত্ব ব্যক্ত করিলেও, দুর্ভাগা লোক তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। বিশেষ করিয়া ধর্ম্মধ্বজী মায়াবাদী-সম্প্রদায় প্রায় তাঁহাকে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিয়া থাকে। এই প্রকার নাস্তিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ নিজে নিজে কোনদিনই ভগবৎ-তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। ভগবান্ স্বয়ং বা তাহার দাসানুদাসগণ ভগবৎ-তত্ত্ব বহুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তাহা ভগবৎ-ভাগবত-বিদ্বেষী অসুরগণের কখনও বুঝিবার অবকাশ হয় না। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

*মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা,*
*মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।*
*অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং*
*পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥*



*ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং*
*দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।*
*অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-*
*স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥*

(ভাঃ ৭/৫/৩০-৩১)

মহাভাগবত প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন, হে পিতঃ! গৃহব্রত ব্যক্তিগণের চিত্ত গুরু হইতে অথবা আপনা হইতে কিংবা পরস্পর হইতে কোন প্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাঁহারা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং বারংবার এই ক্লেশকর সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিতে থাকে। যাহারা শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সমূহকেই বহুমানন্ করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধ-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে ব্রহ্মণাদি নামরূপ দামসমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্য-কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

এই প্রকার অদান্ত-ইন্দ্রিয়, গো-দাস, অন্ধ, গৃহব্রত, মূঢ় ব্যক্তিগণের পক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

*অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।*
*পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥*

(গীঃ ৯/১১)

স্বয়ং ভগবান্ নিজে আসিয়া ভগবৎ-তত্ত্ব বিবৃত করিলেও বোকা লোকগুলি শ্রীভগবান্‌কে আমাদের মত একজন সাধারণ মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া অপরাধী হয়।

অতিক্ষুদ্র মনুষ্যজাতি সামান্য ঘটী-বাটি, কল-কারখানা প্রভৃতিই সৃষ্টি করিতে সমর্থ। অতএব আমাদের মত দেখিতে একটি মনুষ্য-শরীরধারী

ব্যক্তি (?) যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি যে অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তিনিই যে সৃষ্টিকর্ত্তা ও সর্ব্বেশ্বর বা তিনি যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্—এই সমস্ত কথা যতই ভালভাবে বুঝান হউক না কেন, শ্ব-লাঙ্গুল-বক্র ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে দুর্ভাগা মনুষ্যগণ কিছুতেই উহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই তাহারা মায়াবাদের আশ্রয়ে কৃষ্ণকে 'স্বয়ং ভগবান্' স্বীকার না করিয়া বরং কৃষ্ণও ভগবান্ এবং তাহারা নিজে নিজেও এক একজন ভগবান্ (?) —এইরূপ একটা রফা-নিষ্পত্তি করিতে রাজী হয়। এই প্রকারে তাহারা ভগবানের প্রতিযোগী হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মুখ ভ্যাঙ্গচাইয়া শেষ পর্য্যন্ত 'আমিই সব' এইরূপ মূঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

এই সকল মূঢ় লোকগুলিকে কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষী 'Satan' বা শয়তান বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। পূর্ব্বেও এই প্রকার ভগবানের প্রতিযোগী শয়তান-জাতীয় রাবণ, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, কংস ইত্যাদি বহু অসুরের জন্ম হইয়াছিল। এখন তাহাদের অনেক বংশ-বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সকল শয়তানগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও 'শচীপিসির ছেলে' বলিয়া ডিস্‌মিস্ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু চিন্তা করা আবশ্যক যে, ভগবানের প্রতিযোগী কেহই হইতে পারে না। ভগবান্ অসমোর্দ্ধ এবং *একমেবাদ্বিতীয়ম্*। সুতরাং ভগবানের সমান বা ভগবান্ অপেক্ষা বড় কেহই নাই। 'একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।' সামান্য উদরান্ন-সংস্থানের জন্য দাসত্ব করিয়া করিয়া, মাথায় লাথি খাইয়া যাহাদের জীবন অতিবাহিত হয়, তাহারা যদি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের প্রতিযোগী হইবার দুর্ব্বাসনা পোষণ করে, তবে তাহা নিতান্তই হাস্যকর, তাহারা আসলে শ্রীভগবানের ভূত-মহেশ্বরত্ব পরমভাব অবগত নহে বলিয়াই এইরূপ দুরাশা পোষণ করে। কিন্তু ভগবান্ এমনই দয়াময় যে, সেই সকল 'শাটান্' জাতীয় লোকগুলিকেও তাঁহার ভূত-মহেশ্বরত্ব পরমভাব কৌশলে বুঝাইবার



চেষ্টা করিয়াছেন। ভগবানের দাসানুদাসগণ বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া, হাজার হাজার গ্যালন চিদরক্ত জল করিয়া এইসকল 'ভূতে পাওয়া' লোকগুলির 'শাটান্' বা শয়তানী-রোগ দূরীভূত করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আবার অতি পণ্ডিতগণও বলিয়া থাকেন যে, যাহারা 'শাস্ত্রাদি' পাঠ করে নাই এমন লোক মূঢ়তাবশতঃ না হয় বোকা হইতে পারে। কিন্তু আমরা ত' বহু শাস্ত্রজ্ঞ; শাস্ত্রেই দেখিতে পাই যে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। বাসুদেবের পুত্র দেবকীনন্দন কৃষ্ণ সেই মহা বিষ্ণুর অংশ হইতে পারেন কিন্তু তিনি যে সর্ব্বোপরি একথা কি করিয়া স্বীকার করা যায়? পণ্ডিতগণও সময়ে সময়ে মায়ার দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া যান, যখন এই প্রকার আসুরিকভাব আশ্রয় করেন। শ্রুতি-স্মৃতিতে যে সকল প্রমাণ আছে তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইতে পারে। আচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রুতি হইতে এই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—'*ত্বমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবন সুরভূরুহভাবনাসীনং সততং স-মরুদগণোঽহং পরময়াস্তুত্যা তেষয়ামি' ইতি শ্রুতে; 'নরাকৃতিঃ পরব্রহ্ম' ইতি স্মৃতেঃ।*

এতদ্ব্যতীত *ব্রহ্মসংহিতা* হইতেও আমরা এই প্রকার প্রমাণ পাই যে, কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর অবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ যথা,—

*যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগনিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ।*
*আধারশক্তিমলম্ব্য পরাং স্বমূর্ত্তিং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥*

(ব্রঃ সং ৫/৪৭)

"মানুষকে ভগবানের মত রূপ করিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে।" এই প্রকার সিদ্ধান্তানুযায়ী মানুষ ভগবানের মত দ্বিভুজ হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া দ্বিভুজ ভগবান্ মানুষ হইয়া যাইবেন—এইরূপ সিদ্ধান্ত

হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানুষের মত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করা মহাপরাধ। তাঁহার পরমভাব কি, তাহা সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য হইতে জানিয়া লওয়াই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য।

কিন্তু অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ মনুষ্যজীবন কিভাবে পরিপূর্ণ করিতে হয়, তাহা না বুঝিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ নহেন (?)—এই কথা প্রমাণ করিতেই সর্ব্বদা তৎপর। সেই সকল নাস্তিকগণ যতই উচ্চাশা পোষণ করুক না কেন, যতই উত্তম কর্ম্ম করুক না কেন, তাহাদের উচ্চাশাদির মূলে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-রূপ ভিত্তি না থাকায় সেই সমস্ত আশা, কর্ম্ম-জ্ঞান সকলই বিফল জানিতে হইবে। একের পৃষ্ঠে শূন্য দিলে দশ হয়, দশের পৃষ্ঠে শূন্য দিলে একশত হয় এবং একশতের পৃষ্ঠে শূন্য দিলে এক হাজার হয়। অর্থাৎ একক সংখ্যা অবলম্বন করিয়া যত শূন্য বসান যায়, ততই মূল্য বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এক সংখ্যা বাদ দিলে শূন্যগুলির মূল্য শূন্যই থাকে। আজীবন কেবলমাত্র শূন্য বাড়াইলে কোনদিনই একের সমান হইতে পারা যায় না। রাবণ যেরূপ স্বর্গের সিঁড়ি করিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, ভগবদ্বিদ্বেষীর আশা ভরসাও সেই প্রকার রাবণের সিঁড়ির মত। যথা—

*মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।*
*রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥*

*(গীঃ ৯/১২)*

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যাহারা মানুষ-বুদ্ধি করিয়া, অথবা প্রথমে তিনি মানুষ ছিলেন তারপর হঠাৎ ভগবান্ হইয়া পড়িলেন, যেমন আজকাল বহু অবতার (?) গজাইয়া উঠে এরূপ মনে করিয়া নিজেদের কৃষ্ণভক্ত বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত আশাই বিফল জানিতে হইবে। আমরা জানি অনেক মায়াবাদী, মিছাভক্ত, ছলভক্ত, প্রভৃতি দল বাঁধিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ-বুদ্ধি করিয়া তাঁহার ভক্তসজ্জায়



সজ্জিত হইয়া পরে বেচারী কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপিবার ব্যবস্থা করেন অর্থাৎ নিজেরাই 'কৃষ্ণ' হইবার দুরভিসন্ধি পোষণ করেন। এই দুরাশা পোষণকারী ব্যক্তিগণই 'মোঘাশা'। ভগবানে মনুষ্য-বুদ্ধিকারী কর্ম্মিগণও তাহাদের কর্ম্মের ফল যে স্বর্গাদি-লাভ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পরিশেষে 'মোঘকর্ম্মা' হইয়া-যান। আর তাঁহারা যদি জ্ঞানি-সম্প্রদায়ভুক্ত হন তাহা হইলে জ্ঞানের ফল যে মায়ামুক্তি, তাহাও নিষ্ফল হইয়া যায়।

# মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ

সেই প্রকার ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র রাক্ষস-স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া জগতে লাভপূজা প্রতিষ্ঠার ভিখারী, মিছাভক্ত, বৃথাকর্ম্মী, মায়াদ্বারা অপহৃত জ্ঞান হইয়া বাস করে। সুতরাং তাহাদের জীবন বৃথাই বুঝিতে হইবে।

কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা, তাঁহাদিগকে এই প্রকার আসুরিক স্বভাব কখনও আক্রমণ করিতে পারে না। এতদ্দ্বারা 'মহাত্মা' উপাধিমাত্রকে লক্ষ্য করা হইতেছে না। অসুরের শিষ্যত্ব করিয়া এবং কৃষ্ণবিদ্বেষ করিয়া নিজেকে এবং অপরকে বঞ্চিত করিতে পারেন কিন্তু বাস্তব মহাত্মাগণের স্বরূপ-লক্ষণ আমরা এইরূপ দেখিতে পাই;—

*মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।*
*ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥*

(*গীঃ* ৯/১৩)

বাস্তব মহাত্মাগণ অনন্যমানসে মনকে ভুক্তিবাঞ্ছাদিতে কোন প্রকারে বিচলিত না করিয়া কেবলমাত্র ভগবদ্ভজনকেই একমাত্র লক্ষ্য করেন। তাঁহাদের দৈবী-প্রকৃতিবশতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই *সর্ব্বকারণ-কারণম্* বলিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন। দৈবী-প্রকৃতির আশ্রিত ব্যক্তিগণই সর্ব্বগুণসম্পন্ন। দুর্লভ কৃষ্ণভক্তগণ দেবতা দুর্লভ সদ্‌গুণরাশিতে সর্ব্বদাই বিভূষিত। সুতরাং জগতে সুখ-শান্তি আনিতে হইলে সেই প্রকার দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত মহাত্মাগণের একান্ত প্রয়োজন।

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় একটি চিকিৎসক বিদ্বৎসভাতে বক্তৃতাকালে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন—





"We go in for public health, sanitation and all kinds of preventive measures, rather than wait for him to fall ill and then treat him. Why not apply that in larger sphere and prevent something which you will have to deal with later in much more difficult form. That will take you to sociological and other places of human activity...... so perhaps, when wise men like you gather together you might think of the ills and diseases of humanity as a whole which create so many conflicts and troubles and come in the way of human progress."

তাৎপর্য্য এই যে, ডাক্তারগণ রোগী কখন রোগে পড়িবে তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বহুধা উপায় ব্যবস্থা করেন। সেই প্রকার সমাজে যে মনোরোগের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার যদি কোন ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে মনুষ্য সমাজের স্বাভাবিক প্রগতি আর বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

বাস্তবিক, জগতে যতপ্রকার জগজ্জঞ্জাল আরম্ভ হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণই ঐ মন। এ বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ বহুপ্রকার আলোচনা করিয়াছেন। অম্বরীষ মহারাজের আনুগত্যে প্রজাগণ যদি *মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ* পালন করিতে পারেন, তবেই তাহার চিকিৎসা হইতে পারে, অন্যথায় *হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ* ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির তথাকথিত মহৎ গুণের কোনই মূল্য নাই, কেননা সে মনরূপ রথে আরোহণ করিয়া যথেচ্ছাচার করিবেই করিবে। মনের রোগ সারাইতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত 'চিত্তদর্পণ মার্জ্জনকারী কৃষ্ণ কীর্ত্তনের'ই একমাত্র প্রয়োজন। এই গূঢ় রহস্য যতদিন পর্য্যন্ত ভেদ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতির মনোব্যাধির

কোনই চিকিৎসা সম্ভবপর নহে; ইহা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের বিবেচনা করা দরকার। জগতে কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা কিছুমাত্র বাড়িলেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আবার ফিরিয়া আসিবে। মনুষ্যকে দেবতা করিতে হইলে তাহার সুপ্ত কৃষ্ণভক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলাই একমাত্র কার্য্য। ইহাই মনুষ্যজাতির চরম উপকার বুঝিতে হইবে।

সেই প্রকার সদ্‌গুণসম্পন্ন মহাত্মাগণের আর এক স্বরূপ লক্ষণ এইরূপ। যথা—

*সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।*
*নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥*
*(গীঃ ৯/১৪)*

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত কিভাবে হওয়া যায়, তাহারই আভাস কিছু এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। 'সতত' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, চিত্তশুদ্ধি-করণাত্মক কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির এবং দেশ-কাল-পাত্রাদির বিচারই অপেক্ষা করিতেছি না। যে যেখানে বা যেরূপ অবস্থায় অবস্থান করুক না কেন, জীব মাত্রেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাস—এই অভিমান করিলেই জীবের আর কোন দুঃখ নাই জানিতে হইবে। সেই প্রকার কৃষ্ণদাস্যাভিমানী ব্যক্তির জন্ম-কর্ম্ম-চিত্তাদি শুদ্ধির নিমিত্ত অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। সর্ব্বেশ্বর হরি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার ভজন করিবার লোভই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার লুব্ধতাই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র মূল্য। তীব্র ভগবদ্ভক্তি যাজনই মহাত্মাগণের স্বরূপ-লক্ষণ। সেই প্রকার মহাত্মাগণ দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য সর্ব্বদাই 'শ্রবণ কীর্ত্তনাদি' নববিধা ভক্তি যাজন-মুখে আলোচনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবা লাভ করিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই



যত্নবান্। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারটাই অথবা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বা আধ্যাত্মিক যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহারই সেবানুকূল করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত। পূর্ব্বে আমরা 'ভগবানের কথা' প্রসঙ্গে প্রবন্ধে যজ্ঞার্থে কর্ম্ম আলোচনা-মুখে যে সমস্ত কথা বিচার করিয়াছি তাহা সমস্তই এইপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যেই বুঝিতে হইবে। আমরা কুটুম্ব-পালনার্থ যেভাবে কষ্ট স্বীকার করিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করি, ঠিক সেইভাবেই কুটুম্বের পরিবর্ত্তে শ্রীভগবানের সেবার জন্যই মহাত্মাগণ সর্ব্বদা যত্ন করেন। কুটুম্ব-ভরণের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করা হয় তাহা মায়িক। সুতরাং ক্লেশদায়ক। কিন্তু ভগবানের সেবার জন্য যে কষ্ট স্বীকার তাহা অপ্রাকৃত, সুতরাং তাহা আনন্দময় বা চিন্ময়। আরও জানা আবশ্যক যে, ভগবানের সেবার দ্বারা কুটুম্ব-সেবাদি আনুষঙ্গিকভাবে হয়, কিন্তু কুটুম্বের সেবা ভগবানের সেবা নহে। ইহার তাৎপর্য্য মহাত্মাগণই বুঝিয়া থাকেন। ভগবানের সেবা দ্বারা কেবল কুটুম্বাদির কেন, সমস্ত জগতের সেবা হয় অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম যতপ্রকার জীব-জন্তু আছে, সকলেরই সেবা হয় এবং তাহাই জগতের সুখ-শান্তির একমাত্র মূল। যথা—

*যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।*
*রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি ॥*

অতএব শ্রীভগবানের অর্চ্চনাদি কার্য্যে জগৎ-প্রাণাদি সমস্ত কার্য্যই সহজে সাধিত হয়। মহাত্মাগণ সেই প্রকার অনুষ্ঠানাদিতেই সতত দৃঢ়ব্রত থাকেন। নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার হরিকথা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। যথা—

'শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাকারী একজন কনিষ্ঠ বৈষ্ণব শ্রীবিগ্রহের কাছে যে ঘণ্টা বাদন করেন, এই ঘণ্টার একটিবার বাদনের সহিত সহস্র সহস্র

কর্ম্মবীরের অসংখ্য হাসপাতাল, দরিদ্র-সেবা, সেবাশ্রম, বিপুল কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান চেষ্টা এবং নির্ব্বেদ জ্ঞানবীরের বেদবেদান্তানুশীলন, ধ্যান, কৃচ্ছ্রতপোযোগসাধন অতীব নগণ্য।'

মহাত্মাগণের পদানুসরণ করিয়া যে ভগবৎসেবার পদ্ধতি আছে, তাহা বাদ দিয়া হাসপাতাল প্রভৃতি খুলিয়া যে পরোপকারের ছলনা হয় তাহাতে পরোপকার কার্য্য-সাধন কোনদিনই হয় না। তবে হাসপাতালের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় মাত্র। সেই প্রকার দরিদ্রসেবার ছলনা করিলে কোনদিনই দারিদ্র্য মোচন হয় না, বরং দরিদ্রেরই সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আমরা হাসপাতাল খোলা, দরিদ্রসেবা প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্যগুলির মোটেই বিরোধী নহি, কিন্তু আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, ভগবানের সেবা বাদ দিয়া কর্ম্মবীরগণের এ সকল সেবার ছলনা সমস্তই 'মোঘাশা', 'মোঘ-কর্ম্ম'। এই 'মোঘাশা' সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। কৃষ্ণ সম্বন্ধে হাসপাতাল খোলা বা কৃষ্ণ সম্বন্ধে দরিদ্রসেবা করা বিষয়টি একদিকে মোঘকর্ম্মী এবং অন্যদিকে 'নেড়ানেড়ী' ইহারা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কারণ উভয়েই মহাত্মাগণের পদানুসরণ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাষায় ইহারা কেহই 'তৃণাদপি সুনীচ' নহে। 'তৃণাদপি সুনীচ' হইলে নিজের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মবীরত্ব, জ্ঞানবীরত্ব, ভক্তিবীরত্ব (?) ইত্যাকার 'মোঘাশা'র মরীচিকায় পতিত হইতে হয় না।

মহাপুরুষগণের পদানুসরণ করিলে কৃষ্ণসেবা কার্য্যে কোনদিনই শিথিলতা আক্রমণ করে না। সেই প্রকার কার্য্যে কৃষ্ণসেবার দৃঢ়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দৃঢ়ব্রত মহাত্মাগণ ভগবানের প্রীত্যর্থে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব মহাজন-প্রবর্ত্তিত জন্মাষ্টমী, একাদশ্যাদি উপবাস প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা ভগবৎ-সেবায় নিত্যযুক্ত হইয়া থাকেন। 'তৃণাদপি সুনীচ' বলিয়া মহাত্মাগণের নিকট কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণ সমস্তই নমস্য হইয়া থাকেন। কিন্তু



দুরাত্মা বা অসুরগণের যে কর্ম্মবীরত্বের পরিচয়-সাধনকালে কৃষ্ণসেবা করা যাইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণের 'ঘাড়ে চাপা'ও চলিতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণসেবা কার্য্যে তাহারা নিত্যযুক্ত নহে এবং কৃষ্ণ তাহাদের নিকট নমস্যও নহেন। এই প্রকার পাষণ্ড-বিচার হইতে মহাত্মাগণ সর্ব্বদাই পৃথক অবস্থান করেন। তাঁহাদের বিচার দৃঢ় এবং তাহাদের সেবাকার্য্য, সাধন ও সিদ্ধিকালে একইভাবে নিত্যযুক্ত।

# ভক্তবৎসল ভগবান্

আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় বিচার করেন যে, সদাসর্ব্বদা কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যস্ত থাকিলে পেট চলিবে কি করিয়া? পেটকে বাদ দিয়া কৃষ্ণসেবার জন্য সময় নষ্ট করিয়া আধ্যক্ষিকগণ মহাত্মা হইতে রাজি নন। বরং পেটের অবস্থা উন্নত হইতে উন্নততর করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় আছে, তাহারই অনুশীলন করিয়া মহাত্মা হওয়াই একমাত্র ধর্ম্ম ইহাই তাহাদের বিবেচ্য। জড় অর্থনীতিক যে ভুল করিয়াছেন তাহারই ফলে আজ জগতে "হা-অন্ন" সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সেই সকল অর্থনীতিকগণ *ভগবদ্গীতায়* ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন, তাহা জানিয়া লইতে পারেন। যথা—

*অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।*
*তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥*

(*গীঃ* ৯/২২)

কোন এক পাশ্চাত্য নাস্তিক সম্প্রদায়ের দেশে, তদ্দেশীয় নিরীহ ব্যক্তিগণকে নাস্তিক-সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য যেরূপ প্ররোচিত করিয়াছিল তাহা এস্থানে উল্লেখযোগ্য। নাস্তিক সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক গ্রামে গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা ভগবানকে কি উদ্দেশ্যে ভজনা করিবার জন্য গির্জায় যাও?" গ্রামবাসীগণ সহজেই বলিল, "ভগবান্ খাইতে দেন", নাস্তিক তখনই তাহাদের গির্জায় লইয়া গেল এবং তাহাদিগকে ভগবানের নিকট খাদ্যদ্রব্য চাহিতে বলিল। নিরীহ গ্রামবাসিগণ স্ব-স্ব প্রার্থনানুযায়ী





ভগবানের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা শেষে নাস্তিকগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা খাদ্য পাইয়াছ কি?" তাহারা 'না' বলিয়া উত্তর দিল।

তখন নাস্তিকগণ বলিল, "খাদ্যের জন্য আমাদের নিকট প্রার্থনা কর।" গ্রামবাসিগণ তাহাই করিল এবং তৎক্ষণাৎ ঐ নাস্তিকগণ বহু রুটি তাহাদিগকে প্রদান করিল। গ্রামবাসিগণ খুব উৎফুল্ল হইল এবং নাস্তিক সম্প্রদায়কেই ভগবান্ অপেক্ষা "প্র্যাক্‌টিক্যাল" বা কার্য্যোপযোগী ভাবিল।

কিন্তু হায়! সেখানে যদি কোন তত্ত্ববিদ্ ভগবদ্ভক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তাহাদের এই ভগবদ্ভক্তিনাশ হইত না। প্রাকৃত কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তপ্রায় ব্যক্তিগণের এই প্রকার পতনের সর্ব্বদাই সম্ভাবনা আছে। কারণ এই সকল প্রাকৃত ভক্তগণ যদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে বুঝিতে পারিত যে, ঐ রুটিগুলিই ভগবানের প্রসাদ এবং তাহা ভগবানই পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে নাস্তিক সম্প্রদায়ের আর অধিক উৎকর্ষ হইত না। কিন্তু তাহারা নিরীহ এবং বুঝে না যে, ভগবান ছাড়া আর কেহ ঐ রুটি কোনদিনই দিতে পারে না। মাঠে যদি ধান, চাউল, গম প্রভৃতি না জন্মায় তাহা হইলে নাস্তিকগণ তাহাদের জড় বিজ্ঞানাগারে কোনদিনই ঐ ধান, চাউল উৎপন্ন করিতে পারিবে না।

অনেকে বলিবেন, আধুনিক প্রক্রিয়ায় বহু বেশী ধান্যাদি উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা জড় বৈজ্ঞানিকদের আছে। কিন্তু আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, এই নাস্তিকতার প্রভাবেই আজ সমস্ত জগৎ জুড়িয়া 'হা-অন্ন' সমস্যা হইয়াছে এবং এখনও যদি আমরা সাবধান না হই তাহা হইলে এমন একদিন আসিবে যে-দিন বৃক্ষের ফল চর্ম্মসার হইবে, গাভী দুগ্ধ দিবে না এবং মাঠে ধানের পরিবর্ত্তে তৃণই হইবে, যাহা কলিকালের লক্ষণ বলিয়া শাস্ত্রাদিতে কথিত আছে।

বাস্তবিক পক্ষে ভগবানই আমাদের সর্ব্বদা রক্ষা করেন। জেলখানার কয়েদীগণকে শাস্তি দিলেও যেমন তাহাদের খাদ্যাদি দেওয়ার ভার রাজা স্বয়ংই গ্রহণ করেন, সেই প্রকার অভুক্ত হীন ছার ব্যক্তিগণ ভগবৎশক্তি ভগবতী দুর্গাদেবী কর্ত্তৃক শাসনযোগ্য হইলেও তাহাদের উদরান্নের ব্যবস্থা তিনিই করিয়া থাকেন।

শাসনযোগ্য, হীন, অভুক্ত, ছার ব্যক্তিগণের যদি আহারের সংস্থান তিনিই করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার পাদপদ্মে যাঁহারা অনন্যভাবে নিত্য অভিযুক্ত তাহাদের তো কথাই নাই। রাজা যদি সাধারণ প্রজাদেরই এরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাহার স্বীয় অপত্যাদির সম্বন্ধে আর কথা কি?

সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহাতে এইরূপ বুঝা যায় যে, যাহারা ধর্ম্মাদির দ্বারা নিত্য-চেষ্টায় জগতের সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করেন তাঁহারাই যে কেবল সুখ ভোগ করেন, আর কর্ম্ম-জ্ঞানাদির দ্বারা অনাবৃত তাঁহার ভক্তগণই যে কষ্ট পান এমন কথা নহে; ভগবানই তাঁহাদের প্রতিপালন করেন। ভগবানের পরিবারবর্গই তাঁহার ভক্তগণ। সাধারণ ব্যক্তিগণ যেমন নিজের পরিবার বর্গের সুখসুবিধা করিয়া নিজ নিজ সুখানুভব করেন, ভগবানও তদ্রূপ ভক্তগণকে প্রতিপালন করিয়া নিজে নিজে সুখানুভব করেন। ভগবান্ তাই 'ভক্ত-বৎসল' নামে বিখ্যাত। কিন্তু 'জ্ঞানীবৎসল' বা 'কর্ম্মীবৎসল' বলিয়া তাঁহাকে কেহ সম্বোধন করে না।

শ্রীভগবানের ভক্তসকল অনন্যরূপে তাঁহারই ভরসা রাখেন এবং দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে-সমস্ত কার্য্য করেন, তাহা সমস্তই ভক্তির অনুকূল। তাই শুদ্ধ ভক্তগণকে নিত্যাভিযুক্ত বলা হয়। অর্থাৎ সেইসকল অনন্য ভক্তগণ এক মুহূর্ত্তও ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য করেন না। তাঁহাদের কোনই কামনা নাই, সকলই কৃষ্ণসেবার জন্য, সেজন্যই তাঁহারা নিষ্কাম এবং শান্ত।



ভগবৎ-সেবার জন্য যে পরিমাণে অর্থাদির প্রয়োজন হয়, ভক্ত স্বয়ংই তাঁহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিযোগ-বিহিত বিষয় স্বীকার করিলে সাধারণ দৃষ্টিতে বিষয়ভোগই হয় বটে (?) কিন্তু ভক্তগণ নিষ্কাম হইলেই ভগবান্ তাহাদের প্রয়োজনীয় কামনাদি পূর্ণ করিয়া নিজে সুখানুভব করেন। পিতার নিকট সুশীল সন্তান নিজ-ভোগ্যবস্তু কিছু না চাহিলেও পুত্রবৎসল পিতা স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া পুত্রের সুখ-বিধান করিয়া নিজেই সুখী হন। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের যথাযোগ্য বিষয়-ভোগের ত' কোন অভাবই হয় না, পরন্তু দেহাবসানে তাঁহারা নিত্যানন্দ লাভ করেন। ইহাই ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত লাভ জানিতে হইবে।

কিন্তু সাধারণ কর্ম্মী-জ্ঞানী বা অন্যান্য দেবতাগণের উপাসক সম্প্রদায়ের সে সুবিধার সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি সম হইয়াও ভক্তবাৎসল্যহেতু ভক্তগণের সুখের বিশেষ সুবিধা করেন, ইহা তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নহে। তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, আমাতে যে যেভাবে প্রীতি করে, আমিও তাহাকে সেই সেই ভাবে প্রতিপালন করি। কৃষ্ণভক্ত শান্ত এবং নিষ্কাম হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কোন দ্রব্যেরই অভাব রাখেন না। এই প্রকার ভাগবতপ্রসাদ লাভ করায়, ভক্তগণের সর্ব্বদাই আনন্দ এবং তাহা গ্রহণে কোন প্রকারই অপরাধ নাই।

এইস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কৃষ্ণভক্তগণই কেবলমাত্র সেই পরমধামে যাইবেন কেন? যাঁহারা অন্যান্য দেবতাগণের পূজক তাহারাও তো সেই কৃষ্ণের শক্তিরই পূজা করিয়া থাকেন। 'শক্তি ও শক্তিমান অভেদ'-বিচারে কৃষ্ণের শক্তিরূপে অন্যান্য দেবতাগণের পূজক সম্প্রদায় পরমধামে কেন যাইবেন না? এ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ—

*যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।*
*তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥*
(গীঃ ৯/২৩)

ভগবান্ ব্যতীত অন্যান্য ইতর দেবতাগণের উপাসনার মূলে অনিত্য কামনাই [ইহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি] এবং সেই সেই দেবতাগণের প্রদত্ত ফলও অনিত্য। অন্যান্য দেবতাগণ যে ভগবানের বিভূতিস্বরূপ—ইহা যাঁহাদের জ্ঞান আছে তাঁহাদের দেবতান্তর পূজা বৈধ, কারণ সেই সেই বিভূতির পূজকগণ ক্রমে ক্রমে ভগবানেরই ভক্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহারা সেই দেবতাগণকে পৃথক ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন তাহা অবৈধ; সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর ইহা আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে পাঠে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য কোন স্বতন্ত্র দেবতা নাই, —যেরূপ রাজা ও রাজকর্ম্মচারী। রাজকর্ম্মচারী অনেক সময় রাজারই মত আসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিলেও তিনি মূল রাজা হইতে স্বতন্ত্র।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে সর্ব্বদাই প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব। সাধারণ ব্যবহারিক জগতে যেমন এক ব্যক্তিবিশেষে অপেক্ষাকৃত ছোট-বড় দেখা যায়, সেই প্রকার দেবতাবিশেষ উচ্চাবচ হইলেও, তাহারা সকলেই ভগবানের গুণাবতার জীবতত্ত্ব। জীবতত্ত্ব ভগবানের পরা-প্রকৃতি-সম্ভূত তটস্থাশক্তি। সুতরাং ঐ সকল সাময়িক ক্ষমতাপ্রাপ্ত জীবনিচয়কে স্বতন্ত্র ভগবান্ বলিয়া যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক যজনা করেন।

কোন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে স্বয়ং 'রাজা' বলিয়া ভুল করিলে, রাজা ও রাজকর্ম্মচারী কখনও এক হইবে না। *একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব 'ভৃত্য'*, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য দেবতাগণের সহিত পরস্পর



কি সম্বন্ধ *ব্রহ্মসংহিতা* পাঠে তাহা সম্যক্ বুঝা যাইতে পারে। বিষ্ণুতত্ত্বই যে *সর্ব্বোচ্চ আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্*—এ বিষয় প্রমাণ সহজেই বুঝা যায়।

ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে বহ্বীশ্বরবাদিদিগের মধ্যে সূর্য্যাদি অন্য দেবতাগণের যে পূজাপদ্ধতি আছে, তাহাতে সর্ব্বপ্রথমেই বিষ্ণুপূজার বিধি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান এবং পরিশেষে সমস্ত পূজার বা সমস্ত যজ্ঞের ফল সেই বিষ্ণু-পাদপদ্মেই অর্পণ করার বিধি আছে, কেন না বিষ্ণুই পরম-পদ। বিষ্ণুর পরম-পদ ব্রাহ্মণ মাত্রেই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিয়া থাকেন। *তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদম্* স্বীকার না করিলে ব্রাহ্মণের সমস্ত পূজাই ব্যর্থ হয়। আবার সেই বিষ্ণুই যাঁহার প্রাভব-বিলাসরূপে সর্ব্বত্র দীপ্তি লাভ করেন, সেই কৃষ্ণই গোবিন্দ, সর্ব্বকারণের কারণ আদিপুরুষ। সুতরাং তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যজ্ঞার্থের পরম অর্থ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই, ইহাই সাধুসম্মত সিদ্ধান্ত। যথা—

*অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।*
*ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥*
(গীঃ ৯/২৪)

শ্রীকৃষ্ণেতর অন্যান্য দেবতাগণের পূজার সময়ে নারায়ণের অর্চ্চাযজ্ঞেশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব শক্তিমান পুরুষ, তিনিই দেবতান্তর দ্বারা সমস্ত যজ্ঞের একমাত্র প্রভু বা ভোক্তা এবং ফলপ্রদাতা। দেবতান্তর দ্বারা তিনিই সেই সেই পূজকের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই সেই দেবতান্তর পূজক সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত নহেন বলিয়া, তাহাদের অতাত্ত্বিক উপাসনাবশতঃ তাঁহারা প্রকৃততত্ত্ব হইতে চ্যুত বা পতিত হইয়া যান।

আমি অমুক দেবতার উপাসক, তিনিই আমাকে কৃপা করিবেন। তিনিই আমার মনোভীষ্ট ফল প্রদান করিবেন। সুতরাং তিনিই পরমেশ্বর (?) ইত্যাদি ধারণা অন্যান্য ইতর দেবতা উপাসক সম্প্রদায়ের প্রবল। কিন্তু শাস্ত্র বিচারে তাহারা সকলেই অতাত্ত্বিক বাস্তবজ্ঞানহীন বলিয়া বুঝিতে পারে না যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শক্তিমৎ-তত্ত্ব। তাঁহারই শক্তি দেবতারূপে তাহাদের নিকট প্রকাশিত। অন্যান্য দেবতাগণের বিধিপূর্ব্বক পূজা হইলে সেই সেই দেবতাগণ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অধীনতত্ত্ব তাহা উপলব্ধি হয় এবং তাহা দ্বারা সেই সেই দেবতার পূজকগণ মোহমুক্ত হন। সুতরাং যাঁহারা অন্যান্য দেবতার উপাসক, তাঁহারা যদি সেই সেই দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ভগবান বলিয়া ভুল না করেন এবং ভগবানেরই বিভূতি জানিয়া উপাসনা করেন, তাহা হইলেই তাহাদের বাস্তব মঙ্গল লাভ হয়। সেই প্রকার পূজা অর্চ্চনাদি দ্বারা ক্রমে ক্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পৌঁছান যাইবে। অন্যথায় তত্ত্ববস্তু হইতে চ্যুত হইতে হইবে।

# পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং

আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেবতাগণের পূজার কোন প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ কলিযুগে ব্যয়সাপেক্ষ যজ্ঞ বা পূজার কোন সম্ভাবনা নাই। অধুনা একপ্রকার সার্ব্বজনীন পূজার বাহ্যাড়ম্বর দেখা যায়। এই সকল পূজার আয়োজনে শাস্ত্রসঙ্গত কোন বিধিরই পালন হয় না, কেবলমাত্র তামাসা পরিপূর্ণ কতকগুলি আমোদ-প্রমোদের তামসিক নৃত্য দেখা যায়। বাৎসরিক আমোদ-প্রমোদের মধ্যে কোনপ্রকার ভূরিভোজনেরও ব্যবস্থা থাকে না। মন্ত্রহীন, বিধিহীন, দক্ষিণাহীন, এই প্রকার তামসিক নাট্যের মূলে অর্থহীনতাই একমাত্র কারণ। কলিযুগে সাধারণের দারিদ্র্য-নিবন্ধন সমস্ত পূজাই বিধিহীন হইতে বাধ্য। সেজন্যই সুমেধাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞদ্বারা অকৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণের বা শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অথবা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন আদৌ ব্যয়সাপেক্ষ নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চন শ্রীকৃষ্ণ-অর্চ্চন অপেক্ষা আরও সুবিধাজনক। কারণ শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন সম্বন্ধে পত্র-পুষ্প-ফল-জল সংগ্রহ করিতে যে সামান্য পরিশ্রমের আবশ্যক হয়, শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চনায় তাহাও আবশ্যক হয় না। উভয়েরই অর্চ্চন সকল অবস্থায়, সকল-দেশে এবং মূর্খ, জ্ঞানী, পাপী, পুণ্যবান্, উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলের দ্বারাই সর্ব্বদাই সম্ভবপর হইতে পারে। সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ *গীতাতে* বলিলেন—

*পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।*
*তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ (গীঃ ৯/২৬)*

যত্নশীল ভক্তগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল—এই চারটি বস্তু মাত্র ভক্তির সহিত প্রদান করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হন এবং যেহেতু তিনি পরতত্ত্ব পরমেশ্বর, তজ্জন্য *সর্বার্হনমচ্যুতেজ্যা* বিচারে অর্চ্চন হইলেই সকলের অর্চ্চনা হইয়া যায়। যেমন বৃক্ষমূলে জল সেচন করিলেই তৎ-সম্বন্ধে শাখা-প্রশাখা-পত্রাদি সকল স্থানেই জল সিঞ্চিত হইয়া যায়, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন হইলেও দেব-তির্য্যক-মনুষ্যাদি সকলেরই পূজা-অর্চ্চনা সম্পাদিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনা-কার্য্যে কোনপ্রকার ব্যয়-বাহুল্যেরই-কথা নাই এবং দেশ-কাল-পাত্রাদির কোন প্রকার বিঘ্নও নাই। গঙ্গাস্নান করিবার যেমন সকলের অধিকার, সেইপ্রকার ভগবানের সেবাকার্যে সকলেরই অধিকার আছে। আবার তাঁহার পূজা-পদ্ধতি এতই সরল যে, জগতের যে-কোন ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। জগতের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই যেখানে পত্র-পুষ্প-ফল-জল—এই চারটি বস্তু অপ্রাপ্য। আবার জগতের বিচারে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা নির্ধন, তিনিও এই চারটি বস্তু বিনা-ব্যয়ে সংগ্রহ করিতে পারেন।

অধিকন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'অজ' হইয়াও সর্ব্বমূর্ত্তি-বিশিষ্ট, সকল জীবেরই পরম পিতা বলিয়া ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া শূদ্রাধম চণ্ডাল-কিরাত-হূণ-অন্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশাদি যতপ্রকার উচ্চ-নীচ যোনিসম্ভূত জীব আছেন, তাঁহারা সকলেই একযোগে কেবলমাত্র পত্র-পুষ্প-ফল-জল সংগ্রহ পূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তির সহিত সেই সর্ব্বকারণ কারণ আদি-পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিত্য ধামে গমন করিতে পারেন। এমন সুখ-সুবিধা ছাড়িয়া যাঁহারা মায়া মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া অন্তবৎ বস্তুর ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া অন্য দেবতার আরাধনা করেন তাঁহাদের অপেক্ষা বোকা লোক আর কে থাকিতে পারে? অধিকন্তু আজকাল সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া যে এক জাতি, এক ধর্ম্ম, এক শাস্ত্র এবং সকল বিষয়ই ঐক্য স্থাপনের যে একটা মহতী চেষ্টা



চলিতেছে তাহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনে বা ভজনে সম্ভবপর হয়। এই কথা কোন কাল্পনিক প্রহসন নহে। পরন্তু যিনি প্রকৃতপক্ষে সত্যানুসন্ধিৎসু, উপস্থিত যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তিনি যদি অবিলম্বেই বিধিমত পত্র-পুষ্প-ফল-জল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন আরম্ভ করেন তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, কিভাবে সেই পরমতত্ত্ব ভগবান্ ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। আমরা আমাদের সমস্ত সহৃদয় পাঠকবর্গকে বিনা-ব্যয়ে, বিনা-আয়াসে এবং বিনা-জ্ঞানে ও বিনা-জাতিবিচারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পৌঁছিবার এই প্রকৃষ্ট উপায় সাধন করিবার জন্য অবিলম্বেই সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি।

অন্যান্য দেবতাগণের উপাসকের মধ্যে এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবকের মধ্যে বহুল পার্থক্য বর্ত্তমান। সাময়িক কামনার বশবর্ত্তী হইয়াই সাধারণতঃ লোকে অন্যান্য দেবতাগণের আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের প্রতি নিত্য-প্রীতিসম্পন্ন হইয়া পত্র-পুষ্প-ফল-জল যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা ভক্তির সহিত অর্পণ করেন বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাই আদরে গ্রহণ করেন। সেই প্রকার ভগবৎ-প্রীতির মধ্যে কোন প্রকার কামনা থাকিতে পারে না (যেখানে কামনাই প্রধান, সেই-প্রকার বহু-ঈশ্বরবাদীর প্রদত্ত ষোড়শোপচার নৈবেদ্যও ভগবান্ গ্রহণ করেন না।) অন্য দেবতার উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে তত্তৎ দেবতার প্রতি প্রেমভক্তি থাকিতে পারে না; কারণ সেখানে প্রেম বা প্রীতি নাই। তবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম দয়ালু বলিয়া সেই সকল অল্পমেধা উপাসক সম্প্রদায়ের অনিত্য নশ্বর কামনাগুলি পরিপূরণ করিয়া থাকেন। প্রেমভক্তি বিবর্জ্জিত কোন দ্রব্যই শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। যেমন ক্ষুধার উদ্রেক না থাকিলে উত্তম উত্তম ভোজ্যদ্রব্যও গ্রহণীয় হয় না, তদ্রূপ প্রেমভক্তি বিবর্জ্জিত বহু-দ্রব্য-সম্ভার ভগবৎসেবার উপযোগী নহে। পূর্ব্বে যে আমরা অবিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার কথা আলোচনা করিয়াছি, তাহার মূল কারণই এই ভক্তি-হীনতা।

ভক্তির অর্থ ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, আর 'কামনা' অর্থে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-মানসে যাঁহারা ভগবৎসেবার ছলনা করেন, তাঁহারা কখনই ভক্ত হইতে পারেন না। শাস্ত্র তাহাদিগকে 'বণিক' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ভক্তি যখন ভগবানকে পাইবার মূলবস্তু, তখন আমাদের যাহা কিছু আছে তাহাই (পত্র, পুষ্প, ফল, জল-পর্য্যায়) যদি ভগবানকে প্রদান করি, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপস্যা-স্বাধ্যায় ইত্যাদি সাধনার সিদ্ধিস্বরূপ ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া যায়। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে সকলকেই উপদেশ দিলেন—হে মনুষ্যজাতি, তোমরা যে যেখানে যেমন ভাবেই অবস্থান কর না কেন, তোমাদের সংগৃহীত সমস্ত বস্তু আমাকেই প্রদান কর। সেই প্রকার বৃত্তির দ্বারা তোমাদের সাধারণ কর্ম্ম, সাধারণ ভোজন, সাধারণ দান, সাধারণ তপস্যা সমস্তই প্রাপ্তির কারণ হইবে।

*যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।*
*যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম্ ॥* (গীঃ ৯/২৭)

মনুষ্যজাতির কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, পুণ্য, স্ত্রী-পশু, দেহ-গেহ, ধনসম্পত্তি, বিদ্যা-বুদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম্ম-জ্ঞান, এমনকি পানীয় আহারাদি যাহা কিছু আছে—যাহা দ্বারা তাঁহারা দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নানাপ্রকার কার্য্যাদি করিয়া থাকেন, ভোজন করিয়া থাকেন, দান করিয়া থাকেন, হোম অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন, তপস্যা করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই যদি *'কাম—কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ—ভক্তদ্বেষিজনে'*—এই বিচারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তির সহিত অর্পণ করে, তাহা হইলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই বস্তু যথাযথ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কৃতকৃতার্থ করেন—পরম শক্তিময় নিত্যানন্দস্বরূপ তাঁহার পরমধামে লইয়া যান।



দেবতাগণের মধ্যে কেহ বা এক প্রকার পূজা লইতে পারেন, কেহ বা অন্য প্রকার পূজা গ্রহণে সমর্থ। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলের কর্ম্মফল গ্রহণ করিতে পারেন। বিরুদ্ধ-ভাবসম্পন্ন সকলের কর্ম্মফল গ্রহণ করিবার যোগ্যতা একমাত্র ভগবানেরই আছে। ভগবানের ভগবত্তা সেইখানে বর্ত্তমান। মনুষ্যজাতির মধ্যে সকলেই যে শুদ্ধ-ভক্তির কথা বুঝিতে পারিবেন, এমন আশা আমরা কুত্রাপি করি না। সকল প্রকার বিপর্য্যয় অবস্থাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করিবার যোগ্যতা সর্ব্বদাই সকলের বর্ত্তমান আছে। সুতরাং যাহার যাহা কিছু সম্বল আছে, তাহাই অর্চ্চনমার্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই প্রদান করা একমাত্র বিধি।

নিষ্কাম কর্ম্মযোগে যে-সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় আলোচনা হইয়াছে, সে সমস্তই প্রায় শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মপ্রধান। কিন্তু উপস্থিত আমরা বুঝিতে পারি, পারলৌকিক বা বৈদিক সকল কর্ম্মই, পণ্ডিতগণ যাহাকে 'অন্যাভিলাষিতাশূন্য' বলেন, তাহাও বা সকল কর্ম্মের ফলই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা যাইতে পারে। শরীর দ্বারা, মনের দ্বারা, বাক্য দ্বারা, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা বা নিজ-নিজ স্বভাব-সুলভ সকল কর্ম্ম দ্বারা যাহাই কৃত হউক না কেন, সমস্তই যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা হয়, তিনি দয়া করিয়া সমস্তই গ্রহণ করেন। এইস্থানে একটি বিষয়ে আমরা যেন ভুল না করি। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ সমস্ত কর্ম্ম করিবার পর নারায়ণকে যেরূপ কর্ম্মফল অর্পণ করেন, সেই প্রকার অর্পণ করিবার কথা এখানে হয় নাই। কারণ সেইরূপ অর্পণকার্য্যে কামনা ব্যতীত কোন প্রীতি বা ভক্তি নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, ভক্তি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তিই একমাত্র মূলকথা। সুতরাং যাহা কিছু করা যায়, সমস্তই ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃত হওয়াই প্রকৃত ভগবদর্পিত কার্য্য বুঝিতে হইবে। 'আমি ভোজন করিব'—এই উদ্দেশ্যে পরিশ্রম না করিয়া, ভগবানের ভোজন হইবে বা ভগবানকে খাওয়াইতে হইবে এবং সেইজন্যই সমস্ত প্রকার পরিশ্রম

স্বীকার করিব, তজ্জন্যই ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইবে। সেই জন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞান-দান-তপস্যাদি কার্য্য সমাধান করিব—এই প্রকার প্ররোচনাই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি-যাজনের মুখ্য কথা। জগতে যাহা কিছু কর্ম্ম আছে, তাহা সমস্তই ভগবানের ভক্তি-সম্বন্ধীয় কার্য্য; সুতরাং কোনটাই নৈরাশ্যজনক নহে। জগতের সকল বস্তুই ভগবানের সেবায় নিয়োগ করিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। সেই জন্যই সকল কর্ম্মের ফলই তিনি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিজ ভক্তগণকে কৃতকৃতার্থ করিতে পারেন। এই প্রকার ক্ষমতা তাঁহার আছে। কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার সেবাকার্য্যে নিজ-ইন্দ্রিয় তোষণ প্রবৃত্তি যেন আদৌ স্থান না পায়। মহাজন-প্রবর্ত্তিত পথেই আমাদিগকে অনুগমন করিতে হইবে। ভগবানের নিকট সকলেই সমান, তাঁহার কাছে কোনপ্রকার উচ্চ-নীচ বিচার নাই। অতএব প্রীতির সহিত যিনি বা যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে ভগবানের ভজন করেন, তিনি বা তাঁহারাই ভগবানের নিজ জন। তাঁহারাই অপ্রাকৃত হরিজন। ভগবানের সেবা ভজনকে বাদ দিয়া ছাপ মারিয়া যে প্রাকৃত 'হরিজন' তৈয়ারী করিবার অপচেষ্টা, তাহাই প্রাকৃত সহজিয়া-বাদ বা ভক্তিমার্গের উৎপাতবিশেষ।

*সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।*
*যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥*
*(গীঃ ৯/২৯)*

ভগবান্ সকলের প্রতি 'সম' ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভগবান্ নির্ব্বিশেষ এবং যাহার যে মত সেই প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতাময় মার্গেও ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়। তিনি সবিশেষ পরমভাবময় অপ্রাকৃত ক্রিয়াশীল। *সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং* অর্থাৎ তিনি সকলের বন্ধু।



সুতরাং বন্ধুত্বের মধ্যে যেমন তারতম্য আছে, সেই প্রকার ভগবানের সমতাও বৈশিষ্ট্যশূন্য-নির্ব্বিশেষ নহে। যিনি যেভাবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধিত, ভগবান তাঁহার প্রতি সেই প্রকারই ব্যবহার করিয়া থাকেন। *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।* যিনি যে-ভাবে নির্ব্বিশেষ, সবিশেষ, শান্ত, দাস্য, সখ্যাদি-ভাবে তাঁহাতে প্রপন্ন হন, ভগবানও তাঁহাকে সেইভাবে গ্রহণ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি 'মনুষ্য' ভাবিয়া অবজ্ঞা করেন, তিনিও তাঁহাকে সেইভাবে উপেক্ষা করেন। আর যাঁহারা তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ জানিয়া মহাজন-প্রবর্ত্তিত পথানুসরণে ভক্তি করেন, তিনিও সেই সকল প্রেমিক ভক্তকে সর্ব্বদাই রক্ষা করেন।

# সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

আধুনিক সভ্যতার প্রগতি-প্রসূত দুরাচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় করিলেই তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে, কৃষ্ণভক্তির সংস্রবে এবং কৃষ্ণস্মৃতির জন্য তাহাদের হৃদয়স্থিত অভদ্রভাব নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, হৃদয়ের নিভৃততম স্থানগুলি যেখানে কেবলমাত্র অভদ্রভাবেই পূর্ণ থাকিত, সেই স্থানগুলি ক্রমশঃ নির্ম্মল ও মঙ্গলময় ভাব পরিপূর্ণ হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবলেই ঐ দুরাচার বা সুদুরাচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া প্রবল অনুতাপ নিবন্ধন শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হন; অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করিয়াও যদি সুদুরাচারত্ব বর্ত্তমান দেখা যায়, ভগবৎ কৃপাবলে তাহাও শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া যাইবে—ইহাই সিদ্ধান্ত। অনন্যভাক্ ভক্তগণ যাঁহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব অপরাধী নহেন, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ সাধুই জানিতে হইবে। আমাদের বাহ্যিক দর্শনে ঐ সকল অনন্যভাক্ ভগবদ্ভক্তগণের সুদুরাচারত্ব সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ দেখা না গেলেও, ঐ সকল ভক্তগণ কোন দিনই কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগীর ন্যায় নষ্ট হইয়া যাইবে না ইহা ভগবানের সাক্ষাৎ শ্রীমুখ বাণী।

অজামিল উদ্ধার উপাখ্যানে আমরা এই দৃষ্টান্ত স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারি। অনন্য কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে প্রবেশ করিলেই বাহ্যতঃ দুরাচার দশাতেই শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াই বলিয়াছেন যে, তাঁহার অনন্যভাক্ ভক্তগণ কোনদিনই নাশ প্রাপ্ত হইবেন না। তাঁহার ভক্তবৎসলতার





প্রমাণ এই শ্লোকেই দৃষ্ট হয়, কারণ তিনি নিজে প্রতিজ্ঞা করিয়া না বলিয়া তাঁহার ভক্ত মহাবীর অর্জ্জুনকেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে বলিলেন। কারণ ভগবান্ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেও, ভক্তবৎসলতা নিবন্ধন তাঁহার ভক্তের প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদাই রক্ষা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও ভক্ত ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভক্ত-বাৎসল্যেরই পরিচয় দিয়াছিলেন।

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন যে, ভগবদ্ভক্তের সুদুরাচারত্ব বিনাশের কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা উচ্চবর্ণাদি সম্বন্ধেই সম্ভব। কারণ অজামিলাদি ভক্তগণ ব্রাহ্মণ কুলেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং কর্ম্মদোষে কিছুদিন সুদুরাচার সম্পন্ন দেখা গেলেও ভগবৎ-স্মৃতি জন্য তাহা বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সুদুরাচারত্বের যে কথা বলা হইল, তাহা উচ্চ-নীচ বর্ণসম্ভূত সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। কীরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ্র, ম্লেচ্ছ, যবন, খশ, চণ্ডালাদি জগতে যত প্রকার পাপ বা নীচ যোনিসম্ভূত মনুষ্যাদি বর্ত্তমান আছে এবং যাহারা স্বাভাবিক ভাবেই কদাচার সম্পন্ন, তাহারা সকলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা লাভ করিলেই সেই পরমধামে যাইতে পারিবে।

*মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।*
*স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥*

(গীঃ ৯/৩২)

কীরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দাদি অত্যন্ত নীচ যোনিসম্ভূত ব্যক্তিগণ যখন কৃষ্ণভক্তি দ্বারা পরমধামে যাইতে পারেন, তখন ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বা তন্নিম্নস্থ স্ত্রী-শূদ্র-যবনাদির ত' কোন কথাই নাই। ভগবানের ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি-বর্ণাদি সম্বন্ধীয় কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকতা নাই। প্রকৃত একজাতিত্ব, একেশ্বরত্ব ইত্যাকার ভাব

*একমেবাদ্বিতীয়ম্* ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ত্বেই সম্ভব হয়—অন্যথায় নহে।

কলিকাল-নিষ্পেষিত মনুষ্যজাতি মায়াকবলিত হইয়া যে স্বরূপভেদ-বুদ্ধিতে জগতে বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়াছে এবং সেই বিপর্য্যয়ের সমাধানকল্পে মনীষিগণ আজ জগতে যে একত্ব আনিবার জন্য গভীর গবেষণা করিতেছেন, উহা সহজে কিভাবে এবং কোন্ পথে সমাধান হইবে, তাহা বহুদিন পূর্ব্বেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গীতাশাস্ত্রেই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।*
*মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥*

(*গীঃ ৯/৩৪*)

হে মনুষ্যজাতি, তোমরা সকলেই *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার* বাণী অনুসরণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মন সংযোগ কর। তোমাদের শারীরিক, মানসিক সমস্ত কার্য্য তাঁহার সেবোপকরণ হিসাবে করিতে থাক। এইভাবে সর্ব্বতোমুখী কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইলেই, তোমরা কেবলমাত্র ইহ-জগতেই যে সুখী হইবে তাহা নহে, পরন্তু পরজগতেও নিত্যকাল তাঁহার সেবাসুখ লাভ করিয়া নিত্যানন্দে নিমগ্ন হইবে। মহাবদান্য-অবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু এই কথাই প্রচার করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাঙালীর সৌভাগ্যবশে তিনি বাঙলাদেশে অবতীর্ণ হইয়া বাঙালী জাতিকে ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন। বাঙালী জাতি তাঁহার কথা সমস্ত জগতে প্রচার করিয়া নিজেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যজাতিকে উদ্ধার করিতে পারেন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাঁহার কথা সুষ্ঠু প্রচার হইলেই বিবদমান মনুষ্য জাতি পরা শান্তি লাভ করিবে। দুঃখের বিষয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম ভাঙ্গাইয়া তের প্রকার অপসম্প্রদায়ই ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিয়া



কতকগুলি সরলজাতি শিষ্যাদি সংগ্রহ করতঃ নিজদিগকে বহুমানন করিতেছে। যাহারা নিজেরাই কোন প্রকার শিষ্যত্ব স্বীকার করে নাই, তাহারা কোন্ বলে গুরু বলিয়া পরিচয় দিতেছে—আমরা তাহা বুঝি না। যে কথা সমস্ত জগদ্বাসীকে গ্রহণ করাইতে হইবে, তাহা কোন লোক-বঞ্চনামূলক ভাবুকতা নহে, তাহা অত্যন্ত গভীর দার্শনিক তত্ত্ব। মূর্খসমাজে ভাবুকতার ভাণ দেখাইয়া গুরু সাজিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কোনদিনই প্রচার হইবে না। সাধু সাবধান!

আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করি যে, একমাত্র কুতার্কিক চিৎ জড় সমন্বয়বাদী বা মায়াবাদী শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিতে কুণ্ঠিত। তাহারা নিজ চেষ্টায় ভগবানকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া চিরদিনই বঞ্চিত থাকিবে।

একথা তাহারা নিজেরাও বুঝিতে পারে না এবং কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা দৃঢ়ভাবে বুঝাইয়া দিলেও তাহারা গ্রহণ করিতে অক্ষম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রপত্তির অভাবেই এই প্রকার দুরবস্থা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য সমস্তই অলৌকিক, অর্থাৎ অপ্রাকৃত বিষয় প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনদিনই গ্রাহ্য হয় না। সূর্য্যকিরণ দ্বারাই যেমন সূর্য্যদর্শন হয়, সেই প্রকার ভগবানের সেবা-কিরণ দ্বারাই ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশিত হন।

পরমতত্ত্ব বুঝিবার জন্য যেসকল সরঞ্জাম আমাদের আছে, তাহা এইরূপ—যথা, বুদ্ধি অর্থাৎ সূক্ষ্মার্থ-নির্ণয় নামার্থ জ্ঞান, অর্থাৎ আত্মানাত্ম বিবেক, অসম্মোহ, ক্ষমা বা সহিষ্ণুতা, সত্য বা যথাযথার্থ ভাষণ, দম বা বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, সমতা বা অন্তরিন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ ইত্যাদি সাত্ত্বিক গুণসমূহ, অভয়, সমতা, তুষ্টি ইত্যাদি রাজসিক গুণসমূহ এবং ভয়, জন্ম-মৃত্যু-দুঃখাদি তামসিক গুণসমূহ সকলই ভগবানের বহিরঙ্গা ত্রিগুণময়ী হইতে সম্ভূত। আবার সেই মায়া ভগবানের অধীন তত্ত্বশক্তি বলিয়া উপরিউক্ত সমস্ত বিভূতিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে উদ্ভূত। কিন্তু

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণের অতীত অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু। সুতরাং উপরিউক্ত বুদ্ধি-জ্ঞানাদি সত্ত্বগুণের আলোড়ন করিয়া গুণাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পৌছান যায় না। মায়াকে অতিক্রম করিতে হইলে সেই ভগবানের পাদপদ্মে প্রপত্তি ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি, *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে (গীঃ ৭/১৪)* মায়াকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়—শ্রীভগবানের প্রপত্তি। সেই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে,

*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।*
*অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্ ॥*

*(ব্রঃ সং ৫/১)*

মায়াতীত অবস্থাতেই ভগবানের মহৈশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য প্রভৃতি উপলব্ধি হয়। মায়াতীত অবস্থায় ভগবানের মুখপদ্ম নিঃসৃত নিম্নলিখিত কথাগুলি বুঝা যায়। যথা—

*অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।*
*ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥*
*মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।*
*কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥*
*তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।*
*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥*

*(গীঃ ১০/৮-১০)*

অর্থাৎ, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তি স্থান বলিয়া আমাকে জানিও—এইরূপ অবগত হইয়া শুদ্ধভক্তি সহকারে যাঁহারা আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই সকলে পণ্ডিত, আর সকলেই অপণ্ডিত ॥৮॥ অনন্য ভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে আমাতে



সম্যক্ অর্পণ করতঃ পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিকথায় কথোপকথন করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধপ্রেম অবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর-রসে রমণ সুখ লাভ করেন ॥৯॥ নিত্যভক্তিযোগ দ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞান জনিত বিমল প্রেমযোগ দান করি; তাঁহারা তাহদ্বারা আমার পরমানন্দ ধামকে লাভ করেন ॥ ১০ ॥

# ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার

প্রাকৃত-অপ্রাকৃত, ব্যক্ত-অব্যক্ত যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তির একমাত্র কারণ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই আদিকর্ত্তা, সর্ব্বকারণের কারণ পরমেশ্বর। মায়াতীত ভগবদ্ভক্তগণের যে সমস্ত চেষ্টা, তাহাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামিসূত্রে চেষ্টা করিয়া থাকেন। যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারাই সেই সেই দাস্য-সখ্য-ভাবাদি দ্বারা বিভাবিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-লীলাময় এবং সেই অপ্রাকৃত মাধুর্য্যলীলা আস্বাদনে সর্ব্বদাই লুব্ধ-মানস।

সেই সকল অনন্য ভক্তগণের ভগবৎ প্রসাদেই দুর্ব্বোধ্য ভজন রহস্য ও তদনুগ তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই উদিত হয়। তখন তাঁহাদের ভগবৎ-প্রেমজনিত শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের বিষয় শ্রবণকীর্ত্তন ভিন্ন প্রাণ ধারণ করা দুঃসাধ্য হয়। তাঁহারা স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ ভগবদ্ভক্তের সহিত ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে অবগাহন করিতে করিতে স্বরূপ প্রকারাদি আস্বাদন করতঃ মঙ্গলময় অপ্রাকৃত-লীলা বিষয় আলোচনা মুখে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি নবধা ভক্তির সাধন করিতে থাকেন।

সাধন অবস্থায় ঐ একই ভক্তির দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে ভজন সম্পাদন জন্য অনন্য সন্তোষ লাভ করেন এবং সিদ্ধ অবস্থায় সেই ভক্তির দ্বারাই স্বয়ং ভগবানের সহিত অপ্রাকৃত দাস্য-সখ্যাদি রসে রমণ করিয়া থাকেন বা বৈধী ভক্তির দ্বারা তোষণ এবং রাগভক্তির দ্বারা রমণ-সুখে তৎপর হন। সেই প্রকার অপ্রাকৃত তোষণ এবং রমণাদি-সেবায় সতত যুক্ত





ভক্তদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যদ্দ্বারা তাঁহাদের সেই ভক্ত্যঙ্গসকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ভগবৎ প্রেমরূপে আস্বাদিত হয়।

ভাবাবস্থায় সেই সেই ভক্তগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই নিজ অপ্রাকৃত ভাবসমূহের আদান-প্রদান হয়। ভগবানই ভক্তের বুদ্ধিযোগ-প্রদাতা, ভক্ত সেই বুদ্ধিযোগ অনুসারে তাঁহার সেবা করিয়া ক্রমশঃ তাঁহারই অপ্রাকৃত ধামে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই প্রকার ভক্তগণের কোনপ্রকার অজ্ঞান সম্ভব নহে।

যে-সকল মায়াবাদিগণ শুদ্ধ ভক্তগণকে প্রাকৃত ভাবুক বা অজ্ঞানী সন্দেহে অবমাননা করেন, তাঁহারা অত্যন্ত অপরাধী। শুদ্ধ ভক্তগণের পাদপদ্মে অপরাধ-ফলেই মায়াবাদী ও মিছাভক্ত সম্প্রদায় নিজেদের মূঢ়তাবশতঃ অসুর-ভাবাপন্ন হয়; ক্রমশঃ কৃষ্ণবিদ্বেষ ভিন্ন তাহাদের আর কোন জ্ঞানই লাভ হয় না; যাহা লাভ হয় তাহা কেবল ক্লেশমাত্র।

ঐরূপ মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান ব্যক্তিগণ যদি কখনও কোন সাধু-কৃপায় জ্ঞানলাভ করে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে—যাঁহারা ভগবানের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করেন, তাঁহাদের অজ্ঞান বলিয়া কিছুই নাই। মায়াবাদিদিগের বুঝা আবশ্যক যে, ভগবান্ অন্তর্য্যামিসূত্রে শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়স্থিত সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া দেন।

*তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।*
*নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥*

(*গীঃ* ১০/১১)

শুষ্ক জ্ঞানিগণ মনে রাখিতে পারেন—ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রকাশ্যভাবেই বলিতেছেন যে, *তেষাম্* অর্থাৎ সেই সেই সতত যুক্ত ভক্তগণকেই দয়া করিবার জন্য। জ্ঞানী বা যোগীদিগকে দয়া করিবার জন্য তিনি পরমাত্মারূপে হৃদয়ে অবস্থান করেন না, পরন্তু

ভক্তদিগকেই দয়া করিবার জন্য তিনি অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে জীব হৃদয়ে অবস্থান করেন। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার ভক্তগণের হৃদয়ে বুদ্ধি যোগ প্রেরণ দ্বারা যদি ক্রমশঃ তাঁহার সন্নিকটস্থ করিয়া লইতে চাহেন, তাহা হইলে সেই ভক্তগণের অজ্ঞানী হইবার অবকাশ কোথায়? নিজবুদ্ধির পরাক্রম দ্বারা জ্ঞানিগণ যে সেই পরতত্ত্বকে জানিবার চেষ্টা করেন, তাহাই মূলতঃ অজ্ঞান-অন্ধকার। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার চিজ্জ্যোতির দ্বারা যে অন্ধকার নাশ করিতে সমর্থ, শুষ্ক জ্ঞানী-সম্প্রদায় কি সেই জ্ঞানালোক দিতে সমর্থ? নিজের চেষ্টায় কোনদিনই অজ্ঞান-অন্ধকার তিরোহিত হইতে পারে না। শুষ্ক জ্ঞানী-সম্প্রদায় অপ্রাকৃত জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হন না বলিয়াই নিরীশ্বর কপিল প্রভৃতি দার্শনিকগণ সেই পরতত্ত্বকে "অব্যক্ত" বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন। সেই প্রকার অব্যক্তাত্মতা জ্ঞানিগণের যে কেবল ক্লেশই লাভ হয় তাহা আমরা গীতায় নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। যথা—

*ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।*
*অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥*

*(গীঃ ১২/৫)*

অব্যক্ত ব্রহ্মবাদিগণের যে কৃচ্ছ্রসাধন, তাহা সাধন ও সিদ্ধ উভয় অবস্থাতেই ক্লেশদায়ক। ব্রহ্মবাদিগণ চিৎজড় সমন্বয় করিতে গিয়া নানা কল্পিত মতবাদ স্থাপন করিতে বিশেষ দুঃখ পান। ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক ভাবিয়া ব্রহ্মের যে পরা ও অপরা শক্তিদ্বয় বর্ত্তমান, তাহা কুতর্ক দ্বারা এক করিবার প্রয়াস পাইয়া পণ্ডিত সমাজে হাস্যাস্পদ হয়। অবিকারী ব্রহ্মকে বিকার-অবস্থায় অধঃপতিত করিয়া সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না এবং তাহাতে কেবলমাত্র হাস্যাস্পদই হন না, পরন্তু দ্বৈতবাদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। সম্প্রদায়গত বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিতে গিয়া ব্রহ্মের শক্তি গুরুত্ব অনুভব করিয়াও স্বীকার করিতে চাহেন না।



বেদ-বেদান্ত এবং তদনুগ শাস্ত্রাদির মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া যে গৌণার্থ স্থাপন করিবার জন্য প্রাদেশিক বাক্যগুলি ব্যবহার করেন তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে, আর বেশীদূর অগ্রসর না হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে বাধ্য হন।

ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সবিশেষত্বের অপ্রাকৃত ভাব বুঝিতে না পারিয়া জড় নির্ব্বিশেষ ভাবকেই চরমভাব চিন্তা করিয়া কল্পিত ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ-রূপ যে প্রাকৃত চেষ্টা, তাহাও অত্যন্ত কষ্টদায়ক। কারণ স্রোতস্বিনী নদীর প্রবাহে বাধা দেওয়া যেমন দুরূহ ব্যাপার, নির্ব্বিশেষ পরাপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-নিরোধও সেই প্রকার দুরূহ ব্যাপার। মহর্ষি সনৎকুমার বলিয়াছেন—

*যৎ পাদ-পঙ্কজ-পলাশ-বিলাস-ভক্ত্যা*
*কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ ।*
*তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-*
*স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥*

*(ভাঃ ৪/২২/৩৯)*

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সর্ব্বস্ব ভক্তগণ ভক্তি দ্বারা যেভাবে কর্ম্মাশয় গ্রন্থিসকল নির্ম্মূল করিতে পারেন, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ তদ্রূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদনে সক্ষম নহেন। অতএব ভগবান্ বাসুদেবের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বিষ্ণুর নির্ব্বিশেষ ভাবই ব্রহ্মতত্ত্ব। বিষ্ণুর পরাশক্তি-সম্ভূত যে জীবশক্তি তাহা ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তিলাভ করিলে বিশেষ আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। শক্তিমানতত্ত্ব নিজশক্তিকে আত্মসাৎ করিতে সর্ব্বদাই সক্ষম, কিন্তু তদ্দ্বারা শক্তির নিত্যবিলাস বিলোপ হইয়া যায় না। সুতরাং এরূপ বিচার বা চিন্তা অত্যন্ত অনুপাদেয়। ব্রহ্মবাদিগণ যে সাযুজ্য মুক্তির কামনা করতঃ উহা লাভে সক্ষম বলিয়া মনে করেন,

তাহাও অত্যন্ত কষ্টদায়ক। ঐ প্রকার কৈবল্য সুখকে ভগবদ্ভক্তগণ নরক যন্ত্রণার সমতুল্য জ্ঞান করেন। জড় সবিশেষ তত্ত্বে যে হেয়তা-অবরতা আছে, তাহা নিরাশ করিতে গিয়া চিৎ-সবিশেষ পর্য্যন্ত নিরাশ করিয়া দেওয়া অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। রোগ নির্ম্মুক্তি করিতে গিয়া রোগ এবং রোগী উভয়কেই নিঃশেষ করিয়া ফেলা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সেইজন্য লোক-পিতামহ ব্রহ্মা এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন, যথা—

*শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,*
*ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।*
*তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে*
*নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥*

(ভাঃ ১০/১৪/৪)

হে ভগবন্, আপনার নিত্যানন্দময় চিৎসেবা-সুখ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবলমাত্র বস্তুজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করেন এবং শুষ্ক অতন্নিসরন করেন, তাঁহাদের ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল তুষে আঘাত করার ন্যায় কেবল ক্লেশই লাভ হয়, পরন্তু কোন শস্য বা ফল লাভ হয় না। অব্যক্তভাবে জীবের স্বরূপ-বিরোধী ও দুঃখজনক বলিয়াই সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

ক্লেশকর অব্যক্ত ব্রহ্মবাদী না হইয়া যাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাঁহারা কিন্তু কোন প্রকার দুঃখভোগ না করিয়াই এই ভব-সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যান এবং পরিশেষে ভগবানের পরম-ধামে তাঁহার নিত্য-লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামিরূপে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া জ্ঞানালোক দ্বারা যেমন ভক্তের সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করতঃ তাঁহাকেই পাইবার জন্য বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, সেইপ্রকার তিনিই চেষ্টা করিয়া তাঁহার ভক্তকে সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিলে



প্রায় ডুবিয়া মরিতে হয়, কিন্তু ভগবান্ স্বয়ংই যদি উদ্ধার করিয়া লন, তবে সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ-রূপ যে কষ্ট, তাহাও স্বীকার করিতে হয় না। ভগবানের শরণাগতিতে সংসার-সমুদ্র হইতে নিস্তার পাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ *গীতায়* এইভাবে উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

*যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।*
*অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥*
*তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।*
*ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥*

(গীঃ ১২/৬-৭)

যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী নহেন, পরন্তু ভগবানের নিত্য স্বরূপাবলম্বী এবং সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কর্ম্মকে সেই ভগবানেরই ভক্তির সম্পূর্ণ অধীন করিয়া স্বীকার করেন, এবং সেই ভগবৎ সম্বন্ধীয় অনন্যভক্তি অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম্ম তপাদি-রহিত শুদ্ধ ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবানের নিত্য-বিগ্রহ শ্যামসুন্দর মুরলীধরের ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই সকল কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত-পুরুষদিগকে ভগবান্ অতি শীঘ্রই মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করেন। ভগবানের প্রতিজ্ঞাই এইরূপ যে, যিনি যে-ভাবে তাঁহার নিকট প্রপত্তি করিবেন, ভগবানও সেইভাবে তাঁহাকে কৃপা করিবেন।

ব্রহ্মবাদিগণ যে ভগবানের নির্ব্বিশেষ ভাব কল্পনা করিয়া ব্রহ্মের সহিত একত্র মিশিয়া যাইতে চাহেন, তাহাতে ভগবানের কিছু আপত্তি থাকিলেও ক্ষতি কিছুমাত্র নাই। ভবরোগগ্রস্ত পুরুষ যদি তাহার রোগ এবং নিজেকে একত্রই রোগ-রোগী ধ্বংস করিতে চাহেন, তাহাতে আর ক্ষতি কাহার? কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তাঁহারা রোগেরই নিবৃত্তি করিতে চাহেন, কিন্তু রোগাক্রান্ত নিজ-সত্তার ধ্বংস কখনই চাহেন না;

তাঁহারা নিজ-সত্তার শুদ্ধস্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবারই চেষ্টা করেন। যাঁহারা সেই প্রকার শুদ্ধ-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভেদ-বুদ্ধি-রূপ জীবাত্মার বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করেন। ব্রহ্মের সহিত অভেদবাদীর যে গতিলাভ হয়, তাহাদ্বারা জীবের স্বরূপগত উপাদেয়ত্ব দূরীভূত হয়। মুক্তিকামীর সংসার-মুক্তিরূপ যে সুখ, তাহা ভগবদ্ভক্তের আনুষঙ্গিকভাবেই লাভ হয়। যথা—

*যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে।*
*তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥*

(নারদীয় পুরাণ)

*ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-*
*দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।*
*মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্*
*ধর্মার্থ-কামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥*

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭)

---

# ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ

*কোটি-জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই 'মুক্তি' নয় ।*
*এই কহে—নামাভাসে সেই 'মুক্তি' হয় ॥*

(*চৈঃ চঃ অঃ ৩/১৯২*)

দাসগোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা ও খুল্লতাত হিরণ্য-গোবর্দ্ধন মজুমদার পুরাতন সপ্তমগ্রামের জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের কর্ম্মচারী আরিন্দা-ব্রাহ্মণ গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি 'ঘটপটিয়া' মূর্খতা প্রকাশ করিবার জন্য নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের সহিত শাস্ত্র তর্কে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জিজ্ঞাস্য ছিল—মুক্তি কি অবস্থায় হয়? শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শাস্ত্র প্রমাণে বুঝাইয়াছিলেন যে, সূর্য্য উদয় হইবার পূর্ব্বেই যেমন তমসাচ্ছন্ন রাত্রির চৌর, প্রেত, রাক্ষসাদির ভয় নাশ হয়, সেই প্রকার শুদ্ধনাম উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ 'নামাভাসে'ই (নামাপরাধে নহে) পাপক্ষয় ও জড় হইতে মুক্তিলাভ হয়। শুদ্ধনাম উচ্চারণ মুক্তকুলই করিয়া থাকেন, সুতরাং সেই প্রকার নামের ফল—পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম। 'ঘটপটিয়া' মূর্খ আরিন্দাব্রাহ্মণ তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে শুদ্ধ বৈষ্ণবের এই কথা বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণব অপরাধ করিয়াছিলেন। উপরিউক্ত গোপাল চক্রবর্ত্তী হরিনামে অর্থবাদ করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে ভাবুক স্থির করিয়াছিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া রোষ বচনে বলিয়াছিলেন—'ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন, পণ্ডিতের গণ।'

তর্কনিষ্ঠ মায়াবাদী বা আধ্যাত্মিকগণ বুঝিতে পারেন না যে, তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণ লাভ না হইলে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয় না। সুতরাং ভগবদ্ভক্তি





লাভ হইলেই জ্ঞানালোচনার লক্ষিত বস্তু যে অজ্ঞানান্ধকার নাশ, তাহা সহজেই হয়। এ বিষয়ে আমরা 'ভক্তিকথা' প্রবন্ধে বহু প্রকারে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সাধারণতঃ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের বিচার এই যে, মনুষ্য জীবনে কেবল জ্ঞানলাভ করাই, অর্থাৎ অতত্ত্ব-বস্তুকে তত্ত্ববস্তু হইতে পৃথক করা বা অতত্ত্ব বস্তুকে নিরাশ করিয়া তত্ত্ববস্তু যে ব্রহ্ম, তাহাতেই একীভূত হইবার যে জন্ম-জন্মান্তর চেষ্টা তাহাই জ্ঞান-কথা। তাঁহাদের মতে সেই-প্রকার জ্ঞান, জ্ঞানী ও জ্ঞেয় বস্তু এই ত্রিবিধ ভেদ নাশ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া লীন হইয়া যাওয়াই সবচেয়ে বড় কথা বা মায়ামুক্তি। এই মায়ামুক্তি কথাটিকেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর 'ভব মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী শুদ্ধ ভক্ত সেই প্রকার মায়ামুক্তি যে সহজেই লাভ করেন, তাহা তিনি শাস্ত্র প্রমাণে বহুস্থানে প্রচার করিয়াছেন।

কিন্তু তর্কনিষ্ঠ মায়াবাদিগণ পঞ্চম পুরুষার্থ যে চিদ্‌বিলাস তাহা বুঝিতে না পারিয়া, ভগবদ্ভক্তগণকে ভাবুক সম্প্রদায় বলিয়া অনেক সময়ে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন। আবার অনেক সময় দেখা যায়, বাস্তবিকই এক প্রকার প্রাকৃত ভাবুক সম্প্রদায় 'মিছাভক্তি'র আশ্রয় করিয়া পরিশেষে উপরিউক্ত মায়াবাদই গ্রহণ করিয়া তথাকথিত সিদ্ধ অবস্থায় ভগবানের সহিত লীন হইয়া যাইবেন, এইপ্রকার অসদ্বাসনা পোষণ করেন। এই সকল মিছাভক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া নামে অভিহিত। ইহারা মায়াবাদীর ন্যায় ভগবান্ ও ভগবানের লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভগবানকে এবং ভগবানের লীলাদিকে মায়িক কল্পনা করিয়া ভক্তিপথের কণ্টক হইয়া যথেচ্ছাচার করেন।

এই সকল মিছাভক্তগণ রূপানুগ গোস্বামীবর্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, বাস্তবিক মায়াবাদিগণের পাণ্ডিত্য-প্রচার হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন এবং শাস্ত্রাদি আলোচনা-

বিধায় বা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত গ্রহণে আদৌ উৎসাহিত নহেন। তাঁহারা (সহজিয়া শ্রেণী) শাস্ত্র-আলোচনাকেই জ্ঞানবাদ মনে করেন, আর মূর্খের যথেচ্ছাচারকেই রাগমার্গীয় ভক্তিপথ মনে করেন।

তাদৃশ মিছাভক্তগণের চরমে মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত স্থিরিকৃত থাকায়, তাঁহারা অনেকেই মায়াবাদেরই অন্তর্ভুক্ত মূর্খ ভাবুক সম্প্রদায়, কিন্তু রূপানুগ বৈষ্ণব সম্প্রদায় নহেন। এই মূর্খ ভাবুক-সম্প্রদায় সুবিধামত কতকগুলি ঢঙ্গাদি জড়িয় ভক্তভাব আবিষ্কার করেন বলিয়া, প্রাকৃত মায়াবাদিগণও তাঁহাদিগকে নিজ সম্প্রদায়ের বহির্ভূত সম্প্রদায় বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, সুতরাং এই প্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শুদ্ধ বৈষ্ণব এবং মায়াবাদী উভয় সম্প্রদায়েরই বহির্ভূত হইয়া, শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতে 'ঐকান্তিকী হরিভক্তির ছলনাকারী' 'উৎপাতী সম্প্রদায়' বলিয়া অভিহিত হন।

*শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।*
*ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥*
*(ব্রহ্মযামল)*

অর্থাৎ—শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রিকী বিধি-নিষেধ বাদ দিয়া যে গুরুগিরি আর অবতারের বন্যা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পারমার্থিক রাজ্যের একপ্রকার উৎপাত মাত্র।

সেই প্রকার অন্যাভিলাষী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, মায়াবাদী ও মিছা ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা শাস্ত্রে যে জ্ঞানযোগের কথা আলোচনা করিয়াছেন, তাহারই মর্ম্মার্থ জ্ঞানকথা প্রবন্ধে কিছু প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব।

তত্ত্ববস্তু হইতে অতত্ত্ব-বস্তুকে নিরসন করাই জ্ঞানালোচনা, এবং সেই তত্ত্ববস্তুর যে চরম কথা অর্থাৎ ব্রহ্ম ও পরমাত্মারও যিনি অংশী, সেই ভগবদ্ বিগ্রহের সহিত নিত্যকাল সেবারত অবস্থায় যুক্ত হওয়া বা



তাঁহার সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোচনা বা চিদালোচনা, তাহাই প্রকৃত জ্ঞানযোগ।

ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ এবং পরমাত্মা যাঁহার একাংশ মাত্র, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের সেবা বাদ দিয়া কেবলমাত্র তত্ত্ব ও অতত্ত্ব বস্তুর যে 'নেতি নেতি' বিচার বা আলোচনা, তাহা কখনও জ্ঞানযোগ নহে; পরন্তু তাহাই উপরিউক্ত আরিন্দা-ব্রাহ্মণের 'ঘট-পটাদি' বিচারপূর্ণ মায়াবাদ অসদালোচনা।

*বলাই পুরোহিত তারে করিলা ভর্ৎসন ।*
*'ঘট-পটিয়া' মূর্খ তুমি ভক্তি কাহাঁ জান ॥*
*(চৈঃ চঃ অঃ ৩/১৯৯)*

অপর পক্ষে শুষ্ক জড়জ্ঞান এবং ভগবদ্ জ্ঞান উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা না বুঝিয়া যে হরিভক্তির ছলনাযুক্ত মায়াবাদ, তাহাই সহজিয়াবাদ বা রূপানুগ-বিরুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা। অতএব জ্ঞানযোগ অর্থে শুষ্ক নির্ব্বিশেষ জ্ঞানালোচনা নহে বা অচিদ্‌বিলাস-পরায়ণ (ব্যভিচারী) প্রচ্ছন্ন-মায়াবাদী মিছাভক্তগণের প্রাকৃত ভাব-প্রবণতাপূর্ণ উচ্ছ্বাসময়ী বাল-চমৎকারকারিণী প্রচেষ্টাও নহে। যথার্থ জ্ঞানযোগের দ্বারা শুষ্ক-জ্ঞানী-সম্প্রদায় বিশুদ্ধভাবে জ্ঞানালোচনা করিলে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের জড়াতীত আনন্দ-চিন্ময়-সমুজ্জ্বল-বিগ্রহের ও আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রভাবিত-চিদ্‌বিলাসের কথা বুঝিতে পারিবেন। আর শুষ্কজ্ঞানীর অনুগত জড়-রস-বিলাসী মিছাভক্তগণও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার সেবায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন।

*সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস ।*
*ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥*
*(চৈঃ চঃ আঃ ২/১১৭)*

সেই তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে আমরা জানিতে পারি যে, আমরা বস্তুতঃ জীব-তত্ত্ব এবং শরীর ও মন অতত্ত্ব-বস্তু। জীব পরাশক্তিসম্ভূত 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে পরিচিত, আর শরীর ও মন অপরাশক্তিসম্ভূত ক্ষেত্র নামে অভিহিত। জীব যেমন তাহার শরীর সম্পর্কে ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত; সেই প্রকার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শরীর সম্পর্কে ভগবানই 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে পরিচিত।

*ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত। (গীঃ ১৩/৩)*

সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারে একই তত্ত্ব। কিন্তু ক্ষেত্র বিচারে জীবের কর্ত্তৃত্ব অণু আর ভগবানের কর্ত্তৃত্ব বিরাট। অতএব অণু ও বিরাট-বিচারে জীব ও ভগবান্ পৃথক তত্ত্ব। জীব তাহার কর্ম্মফল- গত শরীর ও মনকে ব্যাপ্ত করিয়া শরীরের সর্ব্বত্রই যেমন তাহার সত্তা প্রতিষ্ঠিত রাখে, ভগবানও সেই প্রকার তাঁহার বিরাট শরীর দ্বারা জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহার সত্তা বিস্তার করেন। জীব যেমন সবিশেষ হইয়াও নির্ব্বিশেষ-ভাবে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত থাকে, সেই প্রকার ভগবানও নির্ব্বিশেষ-ভাবে বিরাটরূপ বা বিশ্বরূপ ব্যাপ্ত করিলেও তিনি নিত্যকাল সবিশেষ তত্ত্ব গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ।

*গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো। (ব্রঃ সং ৫/৩৩)*

এই বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য বুঝাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* "ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ" সম্বন্ধে বলিলেন—তিনি যে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বর্ত্তমান, তাহা সর্ব্বক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত।

'ঘট-পটিয়া' মায়াবাদিগণ বলেন যে শরীর-রূপ 'ঘটে' জীবরূপ যে নির্ব্বিশেষ আকাশ বা ব্রহ্ম আছে, সেই শরীররূপ ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে বৃহৎ নির্ব্বিশেষ মহাকাশের সাথে মিশিয়া যায়। ইহার নাম 'ঘট-পটিয়া' বিচার। কিন্তু এই 'ঘট-পটিয়া' বিচারে যে সূক্ষ্ম ফাঁকি আছে, তাহা



ধরিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। জীব—চেতন বস্তু, আর আকাশ—অচেতন বস্তু। সুতরাং দার্শনিক বিচারে চেতনের সহিত অচেতনের তুলনা হইতে পারে না। এই প্রকার চিজ্জড় সমন্বয়বাদী মায়াবাদিগণ যে বৃথা পরিশ্রম করিয়া থাকেন তাহাই শুষ্ক জ্ঞান-আলোচনা। সেই প্রকার জ্ঞানালোচনা কখনই জ্ঞানযোগ আখ্যা পাইতে পারে না। মায়াবাদীর সাযুজ্য-মুক্তির বিচারে ক্ষুদ্রচেতন জীব বা অণুক্ষেত্রজ্ঞ ও বৃহৎক্ষেত্রজ্ঞ ভগবান্ বা ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাইতে পারেন। তাহাতে বৃহৎ-চেতনের কোন লাভালাভ নাই। কিন্তু সেই প্রকার ব্রহ্ম সাযুজ্য-মুক্তির দ্বারা ক্ষুদ্রচেতনের কিভাবে আত্মঘাত হয় তাহা 'ঘট-পটিয়া'র বুদ্ধির অগোচর বস্তু।

# তত্ত্ব শুদ্ধি জ্ঞান হয় ভক্তির আশ্রয়

চেতনের স্বভাব অনুযায়ী একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই প্রকার ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে ক্ষুদ্র-চেতনের সহিত বৃহৎ-চেতনের মিশিয়া যাওয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ তাহা স্বীকার করিলেও জীবের স্বাতন্ত্র্যের কোন অর্থ হয় না। যাহারা আত্মহত্যা করিয়া স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য রাখিতে চাহেন, তাহাদের কথা পৃথক। সেই প্রকার আত্মঘাতিগণই কেবলাদ্বৈতবাদী। কিন্তু যাঁহারা নিজের বিশুদ্ধাত্মা বা নিজত্ব নিত্যকালই বজায় রাখিতে চাহেন, তাঁহারা শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদী।

সেই অপ্রাকৃত বিশুদ্ধাত্মার বিকাশ হইলে, জীব সহজেই মায়ামুক্ত অবস্থায়ও নিজ ব্যক্তিত্বের লোপ করিয়া দেন না। পরন্তু সেই প্রকার শুদ্ধ ব্যক্তিত্ব বা স্বরূপ-সিদ্ধিতে সেই পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবায় নিয়োজিত হইয়া আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত চিদ্‌বিলাসী হন। অতএব সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞানালোচনাই 'জ্ঞান' নামে অভিহিত এবং সেই প্রকার শুদ্ধজ্ঞান ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইলেই 'জ্ঞানযোগ' আখ্যা লাভ করে।

এই প্রকার ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিবার জন্য সকল দেশে সকল সময়ে দেশ-কাল-পাত্রবিচারে বহু প্রকার আলোচনা হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে ষড়দর্শনের আলোচ্য বিষয় আছে, তাহাও এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধেই 'নানা মুনির নানা মত' সম্বলিত শুষ্ক-জ্ঞানালোচনা মাত্র। সেইগুলির কোনটি জ্ঞানযোগ আখ্যা পাইতে পারে না।





কিন্তু বেদান্ত দর্শনের কথা পৃথক ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের বিশুদ্ধ ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত। এবং ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের বিচার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এযাবৎকাল বিদ্বৎ-সমাজে বেদান্ত-সূত্রের ভিত্তির উপরই মায়াবাদ এবং সাত্বত-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বর্তমান।

যে সম্প্রদায়ে বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য নাই, তাহা পণ্ডিত সমাজে অপসম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়। মায়াবাদিগণের মধ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের 'শারীরক ভাষ্য'ই প্রধান। আচার্য্য রামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষ্য ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভু-স্বীকৃত মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরম্পরা-অধস্তন শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যই প্রধান।

যাঁহারা তত্ত্বদর্শন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বেদান্ত-দর্শন বিশেষভাবে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বেদান্ত-তত্ত্ববিদ্ বলিলেই যে কেবলমাত্র শাঙ্কর সম্প্রদায়কেই বুঝায় তাহা নহে, পরন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণই অপ্রাকৃত মায়ামুক্ত বেদান্ত-তত্ত্ববিদ্ জানিতে হইবে।

সমস্ত ঋষিবাক্য, বেদবাক্য ও বেদান্ত বাক্য হইতে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চমহাভূত। অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্বের কারণ—প্রকৃতি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক প্রভৃতি দশটি ইন্দ্রিয় কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিচারে বাহ্যেন্দ্রিয়। মন অন্তরিন্দ্রিয়—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়।

নিরীশ্বর কপিলের সাংখ্য-দর্শনে এই সমস্ত তত্ত্ব বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সেই প্রকার চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টিই 'ক্ষেত্র'-তত্ত্ব। এবং সেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের পরস্পর বিনিময়ে যে বিকার-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাই প্রাকৃত ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ,

সংঘাত ইত্যাকারে পঞ্চমহাভূতের পরিণাম—দেহ। মনোবৃত্তিরূপ চেতনাভাস ও ধৃতি ঐ ক্ষেত্রেরই বিকার বুঝিতে হইবে।

'ক্ষেত্রজ্ঞ'-তত্ত্ব এই সকল ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র-বিকার তত্ত্বসমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক,—তাহা ক্রমে আলোচিত হইবে। সেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে বিংশতি প্রকার সদ্‌গুণের প্রয়োজন হয় তাহা *ভগবদ্‌গীতায়* এইভাবে বলা হইয়াছে। যথা—

*অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।*
*আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥*
*ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।*
*জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥*
*অসক্তিরনভিস্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।*
*নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥*
*ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।*
*বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ।*
*অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।*
*এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥*

(*গীঃ* ১৩/৮-১২)

অর্থাৎ জাগতিক মান-লাভে স্পৃহাহীনতা, বিদ্যা-বুদ্ধি, বা ধন-জনের দম্ভহীনতা, অহিংসা, সহ্যগুণ, গুরুবর্গের পরম্পরানুসারে সেবা, শৌচ, ধৈর্য্য, অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম, ইন্দ্রিয়াদি তৃপ্তি-স্বরূপ সুখভোগে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতির যে দুঃখ তাহার দোষ দর্শন, পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা অর্থাৎ তাহাদের সুখ-দুঃখে উদাসীনভাব, সর্ব্বদা চিত্তের সমতা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্ম জ্ঞানই নিত্য—এই প্রকার বুদ্ধি, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারূপ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা ইত্যাদি জ্ঞান-সাধনের উপকরণ।



এই সকল সদ্‌গুণ-বর্জ্জিত ব্যক্তির জ্ঞানযোগ আলোচনা করিবার অধিকার নাই। কিন্তু কুতার্কিকগণ এই সকল জড়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইবার উপায়গুলিও ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতি ক্ষেত্র-বিকারের সমতুল্য করিয়া ক্ষেত্র-বিকারই মনে করেন। কিন্তু এই সদ্‌গুণগুলি প্রত্যক্-জ্ঞান-স্বরূপ। তার্কিক-সম্প্রদায়ের বিচার গ্রহণ করিলেও এই সকল বিকার মোহ, স্মৃতি-বিভ্রম, অজ্ঞান—কাম-ক্রোধ-লোভ, প্রভৃতি অজ্ঞান স্বরূপ বিকারের সমতুল্য নহে। একপ্রকার বিকার ক্রমশঃ জীবকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যায়, আর জ্ঞান-স্বরূপ উপাদানগুলি সেই সর্ব্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করে। রোগ ও ঔষধ দুই বস্তু প্রকৃতিসম্ভূত ব্যাপার হইলেও একটি মৃত্যুমুখে লইয়া যায়, অপরটি মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করে। সুতরাং অল্প মেধাসম্পন্ন ব্যক্তির 'যত মত তত পথ' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ রোগ ও ঔষধ একই পর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া বিদ্বৎসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে না।

উপরিউক্ত বিংশতি প্রকার জ্ঞানসাধন উপাদানগুলির মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তিই একমাত্র লক্ষিতব্য বস্তু। জীবের চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত করিবার জন্যই প্রথম অষ্টাদশ প্রকারের উপাদানগুলির আবশ্যকতা আছে। চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হইয়া ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী ভক্তির উদয় হয়।

*বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন ।*
*কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥*

(শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর)

অপরপক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী ভক্তির উন্মেষ দেখা গেলে ব্যতিরেকভাবে অন্যান্য অষ্টাদশ প্রকার গুণগুলি স্বতঃই দেখা যায়—*যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।*

দশ টাকা, বিশ টাকা, একশত টাকা, প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুঁজিগুলি বহুদিন

ধরিয়া একত্রিত হইলে লক্ষ টাকার সংগ্রহ হয়। কিন্তু একসঙ্গে লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইলে আর পৃথক ভাবে দশ টাকা বিশ টাকার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না। অতএব ভগবান্ শ্যামসুন্দর মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্যভক্তি থাকিলে অন্যান্য বিষয়গুলি অবান্তর ফল স্বরূপ আবির্ভূত হয়। কিন্তু ভগবানের অব্যভিচারিণী ভক্তিকে বাদ দিয়া অপর অষ্টাদশ প্রকার সাধনাঙ্গ প্রাপ্ত হইলেও প্রাকৃত লোক সমূহের নিকট ক্ষণিক লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে চরম সিদ্ধি লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

*হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।* ভগবানের পাদপদ্ম অনাদর করিয়া এবং ভক্তি-বিষয়িণী সাধনা বাদ দিয়া কেবল মাত্র বাহ্যিক আঁকুপাঁকু ভাব দেখাইয়া অমানিত্ব অদম্ভিত্ব প্রভৃতি গুণগুলি ক্ষণ-ভঙ্গুর। সেইগুলির প্রাকৃত কিছু মূল্য থাকিলেও নিত্যত্ব কিছুই নাই। ভক্তিদেবীর সিংহাসন-স্বরূপ ঐ উনবিংশতি ব্যাপারকে জ্ঞান অর্থাৎ সবিজ্ঞান জ্ঞান বলিয়া জানিতে হইবে, তদ্ব্যতীত যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই অজ্ঞান, প্রাকৃত 'ঘট পটিয়া'—জ্ঞানের ত' কথাই নাই, তাহাও অজ্ঞান-বিশেষ।

তত্ত্ব-জ্ঞান জিজ্ঞাসা করিবার উপরিউক্ত উপাদানগুলি ব্যবহার করিলে অধ্যাত্ম-চিত্ত লাভ হয় এবং সেই প্রকার অধ্যাত্ম-চিত্ত-শুদ্ধির দ্বারাই ক্ষেত্র-জ্ঞান বা জড়-জ্ঞান হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান বা চিদ্-জ্ঞানে উপস্থাপিত হওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দে জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই বুঝায়। প্রকৃতিকে যে অনেক সময় 'ব্রহ্ম' বলা হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম 'কারণ' হইতে প্রকৃতি 'কার্য' এবং তাঁহার শক্তিও 'কারণের' সমতুল্য। কিন্তু সেই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তিনিই প্রকৃতিরূপ মহদ্‌ব্রহ্মে জীব-রূপ ব্রহ্মের বীজ গর্ভাধান করেন।



*মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।*
*সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥*

(*গীঃ* ১৪/৩)

*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* এই শ্রুতি বাক্যের সমাধান এই স্থানে, বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ব্রহ্ম-জীব এবং প্রকৃতি এক তাৎপর্য্যার্থক। বৈষ্ণবগণ এই বিচারে শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী। পূর্ব্বে আমরা যে *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্* শ্লোক আলোচনা করিয়াছি, তাহারই পরিস্ফুট অর্থ এই শ্লোকের দ্বারা জানিতে পারা যায়।

# বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন

*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ পূরণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীবিষ্ণু-পুরাণে এক বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। যথা—(১ম অঃ ২২অঃ ৫৬শ্লোক)

*একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।*
*পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥*

'একস্থানস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ বিস্তৃত, পরব্রহ্মের শক্তি সকল সেইরূপ অখিল জগৎরূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।' এই সকল বিবিধ শক্তি হইতে পরব্রহ্মকে বঞ্চিত করিয়া মায়াবাদী সম্প্রদায় যে জ্ঞানালোচনার অভিনয় করেন তাহা জ্ঞান-কথার শিশুবোধ পাঠ্য পুস্তক মাত্র। মায়াবাদিগণের জ্ঞান, শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় poor fund of knowledge' অর্থাৎ তাঁহাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ প্রযুক্ত পরমব্রহ্মের ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণতার অনুভব হয় না। সেইজন্য সেই অসম্যক্ জ্ঞানিগণকে বা নির্ব্বিশেষবাদী দার্শনিকগণকে তাঁহাদের অসম্যকতা হইতে উদ্ধার করিয়া কৃপা করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় বলিয়াছেন —

*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।*
*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥*

(*গীঃ* ৭/১৯)

মোল্লার দৌড় মসজিদ্ পর্য্যন্ত, জ্ঞান লইয়া যে জ্ঞান-কথার (?) আলোচনা অর্থাৎ নেতি নেতি বিচার দ্বারা ত্বং পদার্থ জ্ঞানের যে বিকাশ





তাহা তৎ-পদার্থের জ্ঞান হইতে অনেক দূরে। সেই প্রকার সম্যক্ জ্ঞানলাভ আসুরিক বৃত্তিতে কখনই সম্ভবপর হয় না। আসুরিক বৃত্তিতে অর্থাৎ ভগবানকে নির্ব্বিশেষ করিবার অভিপ্রায়ে যে জ্ঞান কথার বিকাশ হয় তদ্দ্বারা কোন পূর্ণজ্ঞান বা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে না। সেই প্রকার অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব বৈষ্ণবগণই পাইতে পারেন। তাহার কারণ নির্ব্বিশেষবাদিগণ যখনই ভগবানের চিদ্‌গুণের সন্ধান পাইবে তখনই তাহাদের ভগবৎ সেবার সুযোগ লাভ হইবে।

*আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।*
*কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥*

(*ভাঃ* ১/৭/১০)

সেই প্রকার চিদ্‌গুণাকৃষ্ট জ্ঞানী, মহাত্মা খুবই বিরল। যিনি বাসুদেবকে নির্ব্বিশেষ করিবার চেষ্টা না করিয়া অখিল জগৎ তাঁহারই বিবিধ শক্তির পরিণাম বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই ভগবানের চরণে প্রপত্তি করেন। নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ কখনও মহাত্মা শব্দে পরিচিত হইতে পারেন না। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যখন অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ভগবানকে ষড়ৈশ্বর্য্য চিদ্‌সবিশেষ-তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন, তখনই তাঁহারা মহাত্মা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারিবেন। মহাত্মা বৈষ্ণব আচার্য্যগণ *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—বাক্যে যাহা বুঝাইবার প্রয়াস করেন তাহা এইরূপ; যথা —

বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনে ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ ত্রিবিধ বিভাগে নিজশক্তিদ্বারা নিত্য প্রকাশমান বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। বস্তুর অদ্বয়তার ব্যাঘাত না করিয়া বস্তুশক্তির বৈচিত্র্যে ভগবান্ তিন প্রকারে লীলাবিশিষ্ট। চিৎ ও অচিৎ উভয়ের ঈশ্বর ভগবান্। তিনি অনন্ত শক্তিমান সবিশেষ বস্তু। স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়—এই বিশেষত্রয়ে তিনি নিত্য বিরাজমান। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায় বা শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-

মহাত্মাগণ বিষ্ণুপুরাণের উপরোক্ত শ্লোকের এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ভগবান্ একদেশস্থিত অগ্নিস্বরূপ। চিৎ ও অচিৎ তাঁহার বিভিন্ন শক্তিগণের সমন্বয় মাত্র এবং সেই চিদচিৎ সমস্ত জগৎ ভগবানের শক্তির পরিচয় মাত্র। সমস্ত শক্তির আধার ও নিয়ন্তাস্বরূপ ভগবান নিত্য সবিশেষ-তত্ত্ব পুরুষোত্তম—ইহাই পরিপূর্ণ জ্ঞান। সেই প্রকার পরিপূর্ণ জ্ঞান-বিশিষ্ট মহাত্মাগণই চিৎশক্তির আশ্রয়ে নিত্যকালই ভগবৎ সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন।

*মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।*
*ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥*
*সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।*
*নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥*
(*গীঃ* ৯/১৩-১৪)

পরিপূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্ট শুদ্ধচিত্ত ভগবদ্ভক্তগণ যে পদবী লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনে নিত্যযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন তাহাই 'ঘট পটিয়া' 'নেতি নেতি' বিচার সম্পন্ন কনিষ্ঠাধিকারী জ্ঞানিগণের জ্ঞাতব্য বিষয় হওয়া আবশ্যক।

*গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।*
*যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥* (*গীঃ* ৪/২৩)

*যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্মই* ভগবদ্ভজন। *যজ্ঞ* শব্দে বিষ্ণু এবং সেই বিষ্ণুসেবার আনুকূল্যে সমস্ত কর্ম্মই জড়ধর্ম্ম-মুক্ত সম্পূর্ণজ্ঞানাবস্থিত চেতন-বিশিষ্টগণের পক্ষেই সম্ভব।

*তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।*
*প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥*
(*গীঃ* ৭/১৭)



একমাত্র ভক্তিপরায়ণ জ্ঞানী ভক্তগণ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন মুক্ত পুরুষ মহাত্মাগণ যাঁরা সদা-সর্ব্বদাই ভগবৎ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদেরও সেই প্রকার চিল্লীলা-বিশিষ্ট ভগবান্ অত্যন্ত প্রিয়।

নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানী যদি কোন প্রকার সুকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হয়, তবেই তিনি ভগবানের প্রিয় হন। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদী যতক্ষণ ভগবানকে নিঃশক্তিক করিবার চেষ্টা করেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা ভগবানের প্রিয় হওয়া তো দূরের কথা, মহাত্মা নামে পরিচিত হওয়া তো দূরের কথা, মায়া দ্বারা অপহৃত-জ্ঞান হইয়া অসুর-ভাবাশ্রিত অন্যান্য মূঢ় দুরাচারগণের মধ্যে পরিগণিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ মহাত্মা নহেন, এবং ভগবানের প্রিয়ও নহেন। তাঁহারা ভগবদপরাধী সাধারণ জীব মাত্র। 'জ্ঞান' এই কথাটি প্রযুক্ত হইয়া বেদাদি শাস্ত্রে যেখানেই যাহা আলোচিত হউক না কেন, তাহার অর্থ 'সম্বন্ধ'-জ্ঞান, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান নহে। 'সম্বন্ধ' জ্ঞানের পর যে 'অভিধেয়-জ্ঞান' তাহাই মুক্তগণের পরিচর্য্যার বিষয় এবং 'অভিধেয়' জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থাই কৃষ্ণপ্রেম,—তাহাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য বস্তু।

আধুনিক নব্য আচার্য্যগণ (?) যাঁহারা নিজ চেষ্টায় ভগবানকে জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ কিছু লাভ করিয়াছেন বলিয়া সাধারণ লোকের ধারণা। তাহার কারণ এই যে, শ্রীঅরবিন্দের মৃগ্য-বস্তু নাকি এই জড়-জ্ঞান নহে। মায়াবাদিগণ জড়-জ্ঞানের সাম্য অবস্থায় পৌঁছিবার চেষ্টা করেন মাত্র, কিন্তু তাহার পর তাঁহাদের নির্ব্বিশেষ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান ব্যতীত আর কিছু পুঁজি নাই। তাহাদের জানা নাই যে রোগমুক্তিটাই সবচেয়ে বড় কথা নহে। পরন্তু রোগমুক্তির পর যে সুস্থ জীবন এবং তাহার সবিশেষত্বই যে লক্ষ্য বস্তু, তাহা তাহাদের অগম্য বস্তু। শ্রীঅরবিন্দ

এই প্রকার সীমাবদ্ধ বিচার কিছুটা অতিক্রম করিয়া, Supramental Consciousness তাঁর Life Divine আদি গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের মতে ভগবানের চিচ্ছক্তি-বিকাশের একটা ছায়া চেষ্টা মাত্র। তিনি ভগবানের চিচ্ছক্তির বিষয় স্বীকার করিয়াছেন, এই জন্যই আমরা তাঁহাকে কতকটা আদর করি। আমার মনে হয় শ্রীঅরবিন্দের গ্রন্থে এই চিচ্ছক্তির বিষয় যে আলোচনা হইয়াছে, তাহা আজকাল বহুলোকের বোধগম্য হয় না। শ্রীঅরবিন্দের ভাষা (ইংরেজী) খুব সরল হইলেও সকলে তাঁহাকে গভীরভাবে বুঝিতে পারে না। যাহারা বৈষ্ণবদর্শন, যথা—বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শন, শুদ্ধদ্বৈত-দর্শন, দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শন, এবং সর্বপরিশেষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-দর্শন সম্বন্ধে সামান্য মাত্রও আলোচনা করেন নাই; এবং বিশেষতঃ যাঁহারা কেবল মাত্র মায়াবাদাশ্রিত ব্রহ্মানুসন্ধানপর মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত, তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের কথা এক বিন্দুও বুঝিতে পারেন না। শ্রীঅরবিন্দের অনেক চিন্তাস্রোতই বৈষ্ণব-দর্শন হইতে গৃহীত, যদিও তিনি যোগী ছিলেন, সুতরাং দ্বৈতবাদী।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার Light on Yoga গ্রন্থে 'The Goal' প্রবন্ধের এক স্থানে স্পষ্ট লিখিয়াছেন ঃ—

"In order to get dynamic realisation it is not enough to rescue the Purusha from the subjection to Prakriti. One must transfer the allegiance of the Purusha from the lower Prakriti with its play of ignorant forces to the supreme Divine Shakti–the Mother."

"It is a mistake to identify the Mother with the lower Prakriti and its mechanism of forces. Prakriti here is a mechanism only which has been put forth for the evolutionary ignorance. As the ignorant



mental, vital, or physical being is not itself the Divine, although it comes from the Divine–so the mechanism of Prakriti is not the Divine Mother. No doubt something of her is there in and behind this mechanism maintaining it for the evolutionary purpose but she in herself is not the Shakti of Avidya, but the Divine Consciousness, Power, Light, Para-Prakirti to whom we turn for release and divine fulfilment"....

"If the supermind were not to give us a greater and completer truth than any of the lower planes, it would not be worth while trying to reach it. Each plane has its own truth. Some of them are no longer true on higher plane, e.g. desire and ego were truths of the mental, vital and physical ignorance–as a man there without ego or desire would be a magic automaton. As we rise higher, ego and desire appear no longer as truths, they are falsehoods disfiguring the true person and the true will. The struggle beween the powers of Light and the powers of Darkness is a truth here as measured above–it becomes less and less of a truth and in the supermind it has no truth at all. Other truths remain but change their character, importance, their place in the whole. The difference or contrast between the Personal and Impersonal is a truth of the overmind–there is no separate truth of them in the supermind, they are inseparably one. But one who has not mastered can not reach the supramen-

tal truth. The incompetent pride of man's mind makes a sharp distinction and wants to call all else untruth and leap at once to the highest truth whatever it may be—but that is an ambitious and arrogant error. One has to climb the stairs and rest one's feet firmly on each step in order to reach the summit."

অর্থাৎ যদি প্রকৃত জীবন চাহি তাহা হইলে আমাদিগকে কেবলমাত্র মায়ার কবল হইতে মুক্ত করাই একমাত্র কার্য্য নহে। আমাদের অপরা বা অচিৎ শক্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরা বা চিৎ শক্তির অধীন করিয়া দেওয়াই আমাদের লক্ষ্যবস্তু।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল সনাতন শিক্ষায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর উপদেশ করিয়াছেন যে,—

*জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।*
*কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥*
*সূর্য্যাংশ-কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।*
*স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার শক্তি হয় ॥*
*কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তির-পরিণতি।*
*চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥*
*কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।*
*অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥*
*কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।*
*দণ্ড্যজনে মায়া যেন নদীতে চুবায় ॥*
*সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।*
*সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥*
*মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।*
*জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥*

# জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই কয়েকটি পদে যে সমস্ত গূঢ় তত্ত্বপূর্ণ কথা শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিলেন তাহারই আংশিক কিছু কথা বর্ণনা করিয়া শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তাঁহার পূর্বোক্ত বিবিধ পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন, বলিয়া আমার মনে হয়। আচার্য্য পরম্পরায় বিধি-ভক্তির ক্রিয়াত্মক নিয়মানুসারে যাজন করিলে যে বস্তু সহজে লভ্য হয়, শ্রীঅরবিন্দ সেই বস্তুকে বিবিধ বাক্য-বিন্যাসে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ফলে 'বাঘ' মানে 'শার্দুল' অর্থ হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে শ্রীঅরবিন্দ-সাহিত্য সাধারণের পক্ষে দুরবগম্য হইয়া বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের নিত্য কৃষ্ণদাসত্ব স্বরূপ বিচার করিয়াছেন। জীবের নিত্য দাসত্বই তাহার স্বরূপ এবং তাহার নিত্য বা সাময়িক ভোক্তৃত্ব অভিমানই মায়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিলেন, জীব নিজ কৃষ্ণদাসত্ব ভুলিয়া অনাদি বহির্মুখ হইয়াছে, সুতরাং মায়া তাহাকে সংসারাদি দুঃখ দিতেছেন। জীবের দুঃখের মূলীভূত কারণই তাহার এই মায়িক ভোক্তৃত্ব অভিমান। যে ব্যক্তি যাহা নহে সে যদি কৃত্রিম চেষ্টার দ্বারা তাহা হইবার চেষ্টা করে তাহা হইলে সেই প্রকার কার্য্যের দ্বারা তাহার দুঃখ ভিন্ন সুখ লাভের সম্ভাবনা থাকে না। 'কাক ও ময়ূরপুচ্ছ' নামক একটি গল্প আমরা পড়িয়াছি। যিনি জগদীশ্বর, যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি জগতের একমাত্র মালিক এবং ভোক্তা হইতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি জগতের বহু বস্তুর মধ্যে অপর একটি সৃষ্ট বস্তু মাত্র সে যদি ভোক্তা বা মালিকের অভিনয় করে বা তাঁহার আসনে বসিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে দুঃখ ও ক্লেশ ভিন্ন আর কি লাভ হইতে পারে?

জনলোকে ব্রহ্মসত্র যজ্ঞে শ্রবণেচ্ছু মুনিগণের নিকট কুমারগণের অন্যতম ব্রহ্মর্ষি সনন্দন শ্রুতিগণ-কৃত ভগবৎ-স্তব বর্ণনা করিতেছেন—

*অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-*
*স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।*
*অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ*
*সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥*

(ভাঃ ১০/৮৭/৩০)

"হে ধ্রুব, যদি তনুভৃজ্জীবগণ অপরিমিত ও সর্ব্বগত অর্থাৎ ভগবানই হইত, তাহা হইলে ঐ জীব সকল তোমার শাসনাধীন বা নিয়ন্ত্রিত থাকিতে পারে না। যদি অগ্নিরূপ আপনা হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জাত জীব সকলকে (অনু ও নিত্য) বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই তাহারা তোমার অধীন বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হয় এবং তাহারা আপনা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আপনি তাহাদের অপরিত্যাজ্য কারণ ও নিয়ন্তৃ হইতে পারেন। অতএব যে সকল জীব তোমাকে তাহাদের সহিত এক করিয়া জানে, তাহাদের মত মতবাদে দূষিত।"

অতএব জীবের আত্মানুভূতি বা ব্রহ্মানুভূতি জ্ঞানই জ্ঞানের চরম কথা নহে; তাহার পরেও কথা আছে। এবং সেই পরের কথা কৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব অনুভূতি। সেই নিত্যদাসত্ব অনুভূতিই Supramental Consciousness. সেই Supramental Consciousness-এ যে কার্য্য আরম্ভ হয় তাহাই জীবের নিত্য জীবন। সেই জীবন পরা-প্রকৃতি বা চিচ্ছক্তির অধীনে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারিলে 'আনন্দ চিন্ময় রসের নিত্যানন্দ' লাভ হয় এবং তাহা ব্রহ্মানন্দ হইতে কোটি পরার্দ্ধগুণ অধিক। সমুদ্রের তুলনায় যেমন গোষ্পদ-জল, সেই প্রকার 'আনন্দ চিন্ময় রস নিত্যানন্দের' তুলনায় ব্রহ্মানন্দ।

এই আনন্দ চিন্ময় রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চিচ্ছক্তিকেই বোধহয়



শ্রীঅরবিন্দ 'Mother' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। এবং সেই চিচ্ছক্তির কার্য্য সমূহকে অচিচ্ছক্তির কার্য্যকলাপের সহিত তুলনা করা ভুল হইবে, ইহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। মাদ্রাজের নামজাদা মায়াবাদী সন্ন্যাসী স্বধামগত মহর্ষি রমণকে কোন ইংরাজ ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, ভগবান্ আর জীবে কি বিষয়ে তফাৎ? তিনি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে—God plus desire is equal to man and man minus desire is equal to God. অর্থাৎ ভগবানে বাসনা যোগ করিলে তিনি মানুষ হন এবং মানুষ বাসনাশূন্য হইলে তিনি ভগবান্ হন। আমরা বলি যে জীব কখনই বাসনাশূন্য হয় না। বদ্ধ ভূমিকায় তাহার ভোগ বাসনা এবং মুক্ত ভূমিকায় তাহার ভগবৎ সেবা-বাসনা নিত্যকালই থাকে। অতএব সে কখনই ভগবান্ হইতে পারে না এবং সেই জন্য মানুষকে ভগবান্ সাজাইবার যে বাতুলতা তাহা মতবাদে দূষিত একটা মত মাত্র; উহা কোন কার্য্যকরী কথা নহে। মায়াবাদিগণের কৃত্রিম চেষ্টা দ্বারা জীবের যে নিজ নিজ চেতন বৃত্তিগুলি নষ্ট করিবার বাসনা, সেই বাসনাটাই (বা desire-টাই) মায়াবাদীকে কোনদিনই মুক্ত করিয়া দেয় না। সুতরাং মায়াবাদীদের যে মুক্তি অভিমান তাহা তাহাদের অশুদ্ধ বুদ্ধির পরিচয়। বদ্ধ অবস্থাতেই যে সকল বাসনা বা desire আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখে তাহা বহু প্রকারে দৃষ্ট হইলেও সেগুলি গুছাইয়া একত্রিত করিলে চতুর্ব্বর্গ নামে অভিহিত হয়। কিন্তু ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত,—বাসনা কোন দিনই নষ্ট হয় না, মুক্ত অবস্থায় বাসনার সিদ্ধ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দও এই বিষয়ে কিছু লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সেই জন্য আমরা তাঁহাকে মহর্ষি রমণ অপেক্ষা অধিক আদর করি। মহর্ষি রমণ 'বাসনা' বেচারীকে জোর জবরদস্তি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জোর জবরদস্তি করিয়া গলা টিপিয়া desire-কে নষ্ট করিবার যে চেষ্টা তাহা suicidal policy. রোগ নষ্ট না করিয়া রোগী নষ্ট করাতে কোন বাহাদুরী নাই। রোগীকে

বাঁচাইয়া রোগ নষ্ট করাই ডাক্তারের বাহাদুরী। চতুর্ব্বর্গীয় জেলখানার আসামীগণ উত্তরোত্তর বাসনারই দাস হয় এবং তাহাদের স্মৃতিপথ হইতে কৃষ্ণের-নিত্যদাসত্বের আমরা বহু প্রকারে পরিচয় পাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন—

*ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।*
*মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥*
*(গীঃ ৯/৪)*

[অর্থাৎ এই সমগ্র জগৎ অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি আমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, সমুদয় ভূত আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তৎসমূহে অবস্থিত নহি।]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির পরিণতি এই সমস্ত জগৎ জুড়িয়া অব্যক্ত মূর্ত্তিতে বিরাটরূপে অবস্থান করেন। অতএব জগতের সমস্ত চরাচর বস্তু ভূতাদি তাঁহারই শক্তির আধারে অবস্থান করে। শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত শক্তির কোন অবস্থান নাই এবং শক্তি ও শক্তিমান অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচারে একতত্ত্ব হইলেও শক্তিমান স্বয়ং শক্তির বিকাশ হইতে অনেক অন্তরে অবস্থান করেন। সেই জন্য জীব তাহার বাসনার দ্বারা হয় এই ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি—মাটি, জল, বায়ু ইত্যাদি Physical World-এর সেবা করে; না হয় ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ বৈকুণ্ঠ বস্তুর—Spiritual World-এর সেবা করে। অতএব তাহার দাসত্ব নিত্যকালই বিভিন্নাকারে বজায় থাকে। মায়িক দাসত্বের দ্বারা যে কিছু অনুভূত হয়, তাহার ঐকান্তিক নিবৃত্তি করার উপায় জোর করিয়া বাসনা ত্যাগ নহে। চাকুরে বা নিত্যদাস জীব তাহার দাসত্বের বাসনা কখনও ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু মন্দ চাকুরী ত্যাগ করিয়া ভাল চাকুরীর বাসনা করিলে তাহা সে পাইতে পারে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গের দাসত্ব বাসনা না করিয়া বা সেই প্রকার বাসনার গলা টিপিয়া ধ্বংস করিবার চেষ্টা না



করিয়া বাসনার স্বরূপ প্রকাশে যত্নবান হইলেই চরম মঙ্গল লাভ হয়। শ্রীঅরবিন্দ উপরিভাগে ইংরাজী ভাষায় যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ। যথা—"প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলি এবং মন যদি আমাদের পরম সত্য না দিতে পারে তাহা হইলে সেই বিশুদ্ধ সত্তার জন্য চেষ্টা করিয়া লাভ কি?.....

মানুষ যদি অহঙ্কার এবং ইচ্ছাদ্বেষশূন্য হইয়া বাস করে তাহা হইলে সে একটা তামসিক জঙ্গম বস্তু হইয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কথা তাহা নহে। আমরা যদি প্রাকৃত অনুভূতি হইতে ক্রমশঃ অপ্রাকৃত অনুভূতির দিকে অগ্রসর হই, তবে আমাদের অবিদ্যাদূষিত প্রাকৃত ইচ্ছাদ্বেষগুলির জড়ত্ব এবং হেয়ত্ব বেশ বুঝা যায়। অপ্রাকৃত অনুভূতিতে অবিদ্যা নষ্ট হইলে প্রাকৃত ইচ্ছাদ্বেষের যে কোন মূল্য নাই, তাহাই উপলব্ধি হয়। ইচ্ছাদ্বেষাদি বৃত্তিগুলি সমস্ত বজায় থাকে কিন্তু তাহাদের প্রাকৃত স্বভাব (Character) পরিবর্ত্তিত হইয়া অপ্রাকৃত স্বভাব লাভ করে। তখন ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ একই তত্ত্ববস্তু বলিয়া উপলব্ধি হয়। যাঁহারা সেই প্রকার অধিকার প্রাপ্ত হন নাই বা সেই প্রকার অধিকারে বাস করেন নাই তাঁহাদের পক্ষে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় বা মন লাভ করা দুরূহ ব্যাপার। এই অপ্রাকৃত অনুভূতি-পর্য্যায় লাভ করাও একলম্ফে হয় না। যাহারা এক লম্ফে সেই অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করিবার চেষ্টা করে তাহারা অসম(?) উচ্চাভিলাষী। প্রত্যেককেই ধীরে ধীরে উঠিবার চেষ্টা করিতে হইবে। উপরের সিঁড়ি উঠিবার সময় একটি পা ভাল করিয়া স্থাপন করিয়া অপর পা-টি উঠাইতে হইবে। এইভাবে আমাদের সর্ব্বোচ্চ স্থানটি লাভ করিতে হইবে।"

সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের "যোগে" ইচ্ছা, বাসনা বা desire-কে ধ্বংস করিবার কথা নাই—কেবল মাত্র তাহার Character পরিবর্ত্তন করিবার কথা আছে। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'—ইহা সর্ব্বদাই সত্য। বদ্ধ জীবের পক্ষে এবং মুক্ত জীবের পক্ষে সর্ব্বদাই

কৃষ্ণদাসত্ব ছাড়া গত্যন্তর নাই। যেমন প্রজাসকল কারারুদ্ধ অবস্থায় এবং কারামুক্ত অবস্থায় সর্ব্বদাই রাজার অধীন তত্ত্ব। কারারুদ্ধ অবস্থায় তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়-চালনা কার্য্যটি ক্লেশকর কিন্তু কারামুক্ত অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনাই আনন্দদায়ক। দুই অবস্থার মধ্যে কেবল স্বভাব পরিবর্ত্তনের কথা আমরা দেখিতে পাই। সেই প্রকার নিত্য কৃষ্ণদাস জীব যখন শক্তিমান কৃষ্ণকে সেবা না করিয়া কৃষ্ণের মায়া-শক্তির সেবা করিয়া থাকে তখনও তাহার কৃষ্ণদাসত্ব নষ্ট হইয়া যায় না। কিন্তু সেই সেবার আহ্লাদ তাহার নিকট অপ্রকাশিত থাকে। কিন্তু মায়িকগুণ খর্ব্বিত হইলে কৃষ্ণসেবার সেই হ্লাদিনী শক্তির যথাযথ উপলব্ধি হয়। উভয় অবস্থাতেই সে কৃষ্ণদাস থাকে বলিয়া, জীবকে নিত্য কৃষ্ণদাস ও তটস্থা শক্তি স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

# মায়ামুক্তির উপায়

*'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'* এই শ্রুতি বাক্যের উপলব্ধি করিতে হইলে desire-কে ধ্বংস করার কথা মোটেই নাই। কিন্তু desire-এর স্বভাব পরিবর্ত্তনের কথাই উল্লেখযোগ্য। বাসনা দ্বারাই সমস্ত জগতের কার্য্যকলাপ সিদ্ধ হইয়া থাকে। বাসনার বহুমুখী কার্য্যকলাপ ভগবদ্‌গীতায় এইভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। যথা—

*বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।*
*সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥*
*অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ ।*
*ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥*
*মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা ।*
*মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥*
*এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।*
*সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥*
*অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।*
*ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥*
*মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।*
*কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥*
*তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।*
*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥*
*তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।*
*নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥*

*(গীঃ ১০/৪-১১)*

[ অর্থাৎ বুদ্ধি, জ্ঞান, ব্যাকুলতার অভাব, সহিষ্ণুতা, সত্যবাদিতা, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ ও অযশ—এই সকল প্রাণীগণের নানা প্রকার ভাব আমা- হইতেই হইয়া থাকে (৪-৫)। মরীচ্যাদি সপ্ত-ঋষি, তাঁহাদের পূর্ব্বজাত সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ, এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু, সকলেই আমার হিরণ্যগর্ভ রূপ হইতে সঙ্কল্প মাত্র উৎপন্ন, সংসারে ব্রাহ্মণাদি এই সকল তাঁহাদেরই পুত্র-পৌত্র বা শিষ্য-প্রশিষ্যরূপে পরিপূরিত আছে (৬)। যিনি আমার এই সকল বিভূতি ও ভক্তিযোগ বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, তিনি নিশ্চল মদীয় তত্ত্বজ্ঞান-লক্ষণের দ্বারা যুক্ত থাকেন। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই (৭)। আমি সকলের উৎপত্তির হেতু; আমা হইতেই সকলের সকল চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা অবগত হইয়া পণ্ডিতগণ ভক্তি সহকারে আমাকে ভজন করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা করেন না, তাঁহারা অপণ্ডিত (৮)। আমাতে সমর্পিত চিত্ত ও সমর্পিত প্রাণ ব্যক্তিগণ নিত্য পরস্পর আমার তত্ত্ব-আলাপন করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সাধন অবস্থায় ভক্তি-সুখ এবং সাধ্যাবস্থায় রমণ-সুখ লাভ করেন (৯)। সততযুক্ত, প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারী তাঁহাদিগকে আমি সেই প্রকার বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন (১০)। তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই, আমি তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিস্থ হইয়া প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকের দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকাররূপ সংসার নাশ করি (১১) । ]

সুতরাং বাসনা বা desire-এর বহুমুখী ভাবসমূহ পরম ব্রহ্মের বিভিন্ন ভাবরূপে যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা সেই সমস্ত ভগবদ্ভাব ত্যাগ না করিয়া সেই সকল ভাবের দ্বারা ভগবৎ সেবা করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্ত মহর্ষি এবং মন্বাদি সকলেই ভগবানের এই ভাবকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রজা বা বংশধরগণ সেই সকল মহাজনের পথ অনুসরণ করিলে আর desire



বেচারীকে অব্রহ্ম দর্শন করিতে পারিবেন না। মহর্ষি (?) রমণ যদি desire -কে ধ্বংস করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁর এই শ্রুতি বাক্যের যথাযথ উপযোগ করিবার ক্ষমতার অভাব বুঝিতে হইবে। যাঁহারা জগতের সমস্ত ভাবকে ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি করিয়া পরব্রহ্মের সেবায় লাগাইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই প্রকৃত 'বুধ'-ভাব-সমন্বিত মহাত্মা। তাঁহাদের কোন প্রকার অজ্ঞান থাকে না। এবং সেই প্রীতিপূর্ব্বক ভজনশীল সেবাপরায়ণ মহাত্মাগণের বাসনাদি এমন ভাবে পরিমার্জ্জিত হয় যে, তাঁহাদের অজ্ঞানতা থাকিবার কোন কথাই উঠিতে পারে না। কারণ ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদের অজ্ঞানতা নষ্ট করিয়া দেন। নিজের চেষ্টায় অজ্ঞান নাশ করিবার যে ইচ্ছা, আর ভগবান্ কৃপা করিয়া যে অজ্ঞানতা নষ্ট করিয়া দেন, এই দুই প্রকার কার্য্যকলাপের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহাও মায়াবাদীদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। মায়াবাদিগণ চিরদিনই শক্তিমান ভগবানকে শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় করিবার জন্য ব্যস্ত। রাবণাদি অসুরগণ ভগবানকে শক্তিহীন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কংসাদির ন্যায় অসুরগণ ভগবানকে নির্ব্বিশেষ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রকার চেষ্টা বা প্রয়াস অসুরগণই করিয়া থাকে। আসুরী ভাবাশ্রিতা নরাধমগণ তাহাদের ভগবানের সেবা পরিত্যাগ হেতু দুষ্কার্য্যের ফলস্বরূপ সমস্ত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ*—(*গীঃ* ৭/১৫)—একথা আমরা *ভগবদ্‌গীতায়* পাইয়াছি। বড় বড় দার্শনিক, বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় বাহাদুর ভগবানকে নিঃশক্তিক এবং নিরাকার নির্ব্বিশেষ করিবার চেষ্টা বা প্রয়াস করিয়া থাকে। তাহাদের জ্ঞানালোচনা কেবল মাত্র ক্লেশ স্বীকারই হইয়াছে।

*শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো*
*ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধ-লব্ধয়ে।*
*তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে*
*নান্যদ্ যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাম্ ॥*

[অর্থাৎ হে বিভো! যাহারা জ্ঞান-মার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গল লাভের পথ স্বরূপ ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল (অর্থাৎ ভক্তিশূন্য) জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন তাঁহাদের অন্তঃসার-শূন্য স্থূল তুষাবঘাতীর ন্যায় ক্লেশ মাত্রই লাভ হইয়া থাকে; তদ্ব্যতীত আর কিছুই হয় না।]

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশ, অযশ, এ সমস্তগুলি কোথায় দেখা যায়? যেখানে চেতনের কার্য্য আছে, সেখানেই এই সকল চেতন লক্ষণগুলিও বর্ত্তমান। ভগবান্ বলিতেছেন যে, এগুলি সবই-তাঁরই ভাব বা তাহা হইতে উদ্ভূত। তিনি নিত্যদের মধ্যে নিত্য এবং চেতনদের মধ্যে চেতন—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* (কঠ ৫/১৩)। অতএব চেতনের এই সব চেতন বৃত্তিগুলি নষ্ট করিয়া ভগবানকে এবং জীবকে মিলাইয়া দিয়া একটা জগাখিচুড়ি করা বা কাঠ-পাথর করিয়া দেওয়া খুব একটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। অচেতন করিয়া দিলে সুখ, না চেতনতা বজায় রাখিলে সুখ, তাহা মায়াবাদিগণ বুঝিতে পারে না। চেতনবস্তু চিরদিনই অচেতনের উপর দখল করিয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই একজন মহা-মহারথীর অচেতন মর্ম্মর প্রতিকৃতির (Statue) উপর কাকরূপ একটি সামান্য চেতন বস্তুও বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া থাকে। কলিকাতার গড়ের মাঠে এই প্রকার বহু বহু কৃতী ব্যক্তির Statue-র উপর সামান্য কাকরূপ চেতন বস্তুরই এই প্রকার আধিপত্য আমরা অনেক দেখিয়াছি। সুতরাং নিষ্ক্রিয় নিঃশক্তিক প্রস্তরবৎ হইয়া যাওয়া এবং পরম বস্তুকেও সেই প্রকার নির্ব্বিশেষ করিয়া দেওয়া মহা অজ্ঞানেরই পরিচয়। সেই প্রকার কার্য্যে কোনও জ্ঞান কথা আছে—ইহা আমরা স্বীকার করি না।

শ্রীঅরবিন্দকে বরং আমি আদর করি এই জন্য যে, তিনি বিদ্বৎ সমাজে একটা নূতন সংবাদ দিয়াছেন যে—বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি চেতনবৃত্তিগুলির নাশ না করিয়া তাহাদের character বা স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া অপ্রাকৃত অনুভূতিতে (Supramental Consciousness) অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তির আনুগত্যে ভগবানের সেবায় লাগাইতে হইবে। অবশ্য যাহারা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের পথ অনুসরণ না করিয়া আধুনিক নব্য ঋষিদের আনুগত্য স্বীকার করিতে ভালবাসে, তাহাদের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের এই সব কথা নূতন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা ভাগবতগণের আনুগত্যে শ্রৌত পরম্পরায় ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত, তাঁহাদের কাছে এইসব কথা মোটেই নূতন নহে—পরন্তু ইহা ধার-করা জ্ঞান মাত্র বলিয়া মনে হইবে। সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যই ঐ প্রকার এবং শ্রীগোস্বামীপাদগণ এই চিচ্ছক্তি বিলাসের যে অপূর্ব্ব সন্ধান দিয়েছেন, তাহা আর কোন যুগেই কোন আচার্য্যের দ্বারা প্রচার করা সম্ভব হয় নাই। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু তাঁর 'বিদগ্ধ মাধব' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দান সম্বন্ধে জগতের সমস্ত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এইভাবে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। যথা—

*অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ*
*সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্।*
*হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ*
*সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দন॥*

(*বিঃ মাঃ* ১/২)

[অর্থাৎ, সুবর্ণকান্তি সমূহদ্বারা দীপ্যমান শ্রীশচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল-রস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।]

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার 'Surrender and opening' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, যথা—

"The whole principle of this Yoga is to give oneself entirely to the Divine alone and to nobody and nothing else, and to bring down to ourselves by union with the Divine mother, all transcendent light, power, wideness, place, purity, truth, consciousness and Ananda of the Supramental Divine.

"Radha is the personification of the absolute love for the Divine, total and integral in all parts of the being from the highest spiritual to the physical, bringing the absolute self-going and total consecration of all the being and calling down into the body and the most material nature the supreme Ananda."

এই প্রকার বিবৃতিতে সিদ্ধান্তগত বহুধা অসামঞ্জস্য থাকিলেও নিজ চিন্তায় যতটা সম্ভব বস্তুর নির্দ্দেশ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শরণাগতি ভিন্ন সেই উন্নত উজ্জ্বল রসের কথা বুঝিবার উপায় নাই। মায়াবাদিগণের শরণাগতিরই অভাব এবং সেই জন্য নিজ চেষ্টায় অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বকে বুঝিতে গিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া যায়, —শ্রীঅরবিন্দ সেই প্রকার শরণাগতি বিবর্জ্জিত মায়াবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদিগণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ, যথা—

"To seek after the Impersonal is the way of those who want to withdraw from life, and usually they try by their own effort and not by an opening of themselves to a superior power or by the way of surrender; for the Impersonal is not something that guides or helps, but something to be attended and it leaves each man to attain it according to the way and capacity of his nature. On the other hand, by



an opening and surrender to the Mother, one can realise the Impersonal and every other aspect of truth also."

মায়াবাদিগণের নিজ চেষ্টায় যে মুক্তি পাইবার চেষ্টা, তাহা কোন দিনই কার্য্যকরী হয় না। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানে শরণাগতি ভিন্ন জড় মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই।

*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।* (গীঃ৭/১৪)

অর্থাৎ, একমাত্র আমাতেই যাঁহারা শরণাগত হন, তাঁহারাই এই মায়ার হাত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন—অন্যে নহে।

সেই শরণাগতি শিক্ষা করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তের নিকটই প্রথম শরণাগতি স্বীকার করিতে হইবে।

*"সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।*<br>
*সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥*<br>
*মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।*<br>
*জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥*

(চৈঃ চঃ মঃ ২০/১২০/১২২)

সমস্ত বেদ-পুরাণেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। *বেদৈশ্চ সর্ব্বৈ অহমেব বেদ্যঃ* এবং সমস্ত বেদ-পুরাণের নির্য্যাস স্বরূপ ভগবদ্গীতা স্বয়ং ভগবানেরই মুখপদ্ম বিনিঃসৃত ভক্তিবেদান্ত।

# সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাবা?

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে, প্রথম অধ্যায়ে এবং প্রথম শ্লোকেই পরম সত্য তত্ত্ববস্তুর নিরপেক্ষ নির্দ্দেশ নিম্নলিখিত ভাষায় নিরূপিত হইয়াছে। যথা—

*জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্*
*তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।*
*তেজোবারিমৃদাং যথাবিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা*
*ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥*

শ্রীল ব্যাসদেব নানা বেদ-পুরাণ, বেদান্ত, ইতিহাস আদি বহু প্রকার গ্রন্থ বিস্তার করিবার পরও চিত্তে শান্তি না পাইয়া যখন বিষন্ন মনে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় ব্যাসগুরু দেবর্ষি শ্রীল নারদের প্রেরণায় সমাধিযুক্ত অবস্থায় তিনি যে পরম সত্য বস্তুর নিরস্ত-কুহক তত্ত্ব দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই উপরোক্ত শ্লোকে অনুভূতিরূপে প্রকাশিত। দেবর্ষি নারদ শ্রীল ব্যাসদেবকে ভগবানের অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম তত্ত্ব, তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্যাদি প্রকাশ করিবার জন্য উপদেশ করিলেই শ্রীল ব্যাসদেব 'শ্রীমদ্ভাগবত'-নামক অমল পুরাণের বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীল ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমের সন্নিকটে শম্যাপ্রাস নামক স্থানে সমাধিযুক্ত অবস্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমকে এবং তাঁর অপাশ্রিত অবস্থায়





দৈবী মায়াকে দর্শন করিয়া জীবের সম্মোহন-অবস্থা এবং ভগবানের মায়াতীত অবস্থা সবই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই প্রকার অপ্রাকৃত অনুভূতি দ্বারা তিনি পরমতত্ত্বকে স্বরাট্ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। অর্থাৎ পরম-পুরুষ ভগবান সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। স্বাধীন অর্থাৎ তাঁহার উপর-ওয়ালা আর কেহ নাই এবং তাঁহার সমানও আর কেহ নাই। মায়িক জগতে সবার উপর-ওয়ালা ব্রহ্মাকে স্বীকার করা হয়; কিন্তু ব্রহ্মা—আদিকবি, তিনিও সেই স্বরাট্ পুরুষের অধীন তত্ত্ব; কেন না, সেই ব্রহ্মাকেও সেই স্বরাট্ পুরুষ প্রথমে বেদজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। সেই স্বরাট্ পুরুষের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে বড় বড় সুরমুনিগণও মুহ্যমান হইয়া যায়; অন্যের ত' কি কথা। ধীমহি কথাটির তাৎপর্য্য এই যে, যে-সকল ব্যক্তি গায়ত্রী-মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সেই স্বরাট্পুরুষকে বুঝিতে পারেন। গায়ত্রী-মন্ত্র কে জপ করিবে? রজস্তমোগুণের দ্বারা চালিত ব্যক্তিগণ কোন দিনই গায়ত্রী-মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না, বা কোন দিনই তাহাতে অধিকার প্রাপ্ত হন না। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ-বৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণই গায়ত্রী-মন্ত্রের অধিকারী, এবং সেই মন্ত্র জপ করিতে করিতে যখন সেই পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন, তখনই তাঁহার সেই পরাৎপর পুরুষের দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। সেই প্রকার যোগ্যতা লাভ করিলে মায়াতীত নাম-ধাম-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সহিত সেই বৈকুণ্ঠ-লোক এবং সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি অধোক্ষজ নারায়ণের দর্শন হয়,—আবার সেই অধোক্ষজ বস্তুর অহৈতুকী এবং অপ্রাকৃত সেবা-সৌকর্য্যে অধিরূঢ় ভাব লাভ করিলেই ভগবান্ বাসুদেবের দর্শন লাভ হয়। প্রাকৃত মনীষিগণ আরোহ পন্থায় যে ভগবদ্দর্শনের চেষ্টা করেন, তাহাতে কোন দিনই ভগবদ্ বস্তুর দর্শন পাইতে পারেন না। তৎ তৎ কার্য্যের দ্বারা স্বাভাবিক মুহ্যমান হইয়া ভগবানকে মানুষ বা মানুষকে ভগবান্ ভাবিয়া নিরয়গামী

হয়। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ মায়াতীত বস্তুকে চিন্মাত্র উপলব্ধি করিয়া মায়িক-বৈশিষ্ট্যের বিপরীত-চিন্তা সমুত্থিত নির্ব্বিশেষপর-ব্রহ্মচিন্তার অধীন হইয়া যান।

কিন্তু সেই প্রকার নির্ব্বিশেষ চিন্তাকে খর্ব্ব করিয়া উপরোক্ত ভাগবতের শ্লোকে—পরমসত্য-বস্তুকে ব্যক্তিত্বেই স্থাপন করিয়াছেন। সেই অপ্রাকৃত 'ব্যক্তি' ব্রহ্মাকেও জ্ঞান দিতে পারেন—এইরূপ শক্তিসম্পন্ন। ব্রহ্মা তাঁহার বেদ-জ্ঞান লাভ করিয়া ভৌতিক জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তাঁহার বৈদিক জ্ঞান অপৌরুষেয় বা মায়িক সৃষ্টির পর সে-জ্ঞান লাভ হয় নাই, পরন্তু মায়িক সৃষ্টির পূর্ব্বেই সেই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। মায়িক সৃষ্টির পূর্ব্বে যে জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, তাহাই অপৌরুষেয় বলিয়া অভিহিত হয়। এই অপ্রাকৃত জ্ঞানেরই অপর নাম সম্বিৎ-তত্ত্ব। বিষ্ণুপুরাণে সম্বিৎ, সন্ধিনী এবং হ্লাদিনী তত্ত্বের আলোচনা আছে। সেই তিন তত্ত্ব যে-শক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই শক্তিরই নাম চিচ্ছক্তি, অন্তরঙ্গাশক্তি অথবা আত্ম-মায়া। এই আত্ম-মায়ার কথা আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও দেখিতে পাই। গুণময়ী মায়া বা ভগবানের অবিদ্যারূপিণী বহিরঙ্গা-শক্তি হইতে আত্ম-শক্তি পৃথক তত্ত্ব। *পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে*—বিচারে ভগবানের শক্তি বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হয়। এই আত্মমায়া পরা-প্রকৃতি বা চিৎ-শক্তির পরিচয় আমরা জীবশক্তির বিকাশেই দেখিতে পাই। এই জীবশক্তিকে জড় শক্তি হইতে উচ্চাঙ্গের বুঝিতে পারিলেই আমরা আত্মমায়া এবং গুণময়ী মায়ার পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ হই।

আত্মমায়া বা পরা প্রকৃতিতে জড়প্রকৃতির স্বভাব-জাত মায়াময় বিকার-সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ জড়প্রকৃতিতে যে সকল ভ্রম-প্রমাদাদির সম্ভাবনা আছে, পরা প্রকৃতিতে সেই প্রকার সম্ভাবনা নাই। পরা প্রকৃতি-সম্ভূত জীব মায়িক শরীরে থাকাকাল পর্য্যন্তই জড়দেহকে দেহাত্মবুদ্ধি করিয়া মায়ামুগ্ধ হয়; কিন্তু পরাপ্রকৃতি অপসারিত হইলে জড় প্রকৃতি-



সম্ভূত দেহের পরিণাম আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। রজ্জুতে সর্পভ্রম যে দোষ, বা তপ্ত বালুকায় জলভ্রম বা জলে কাঁচভ্রম ইত্যাদি জড় শক্তিতেই সম্ভব হয়, চেতন-শক্তিতে সেই সকল ভ্রমাদি মোটেই নাই। চেতনের অবস্থান-জন্য জড়ের মূল্য ধার্য্য হয়। অতএব জড়ের যে বৈচিত্র্য, তাহার মূলভিত্তি চেতন। জড়ের বৈশিষ্ট্য চেতন বৈশিষ্ট্যের বিপরীত প্রতিফলন মাত্র। সূর্য্যের তেজ জলে প্রতিভাত হইয়া যে আর একটি আলোকের সৃষ্টি হয়, সেই আলোকেরই জন্ম-স্থিতি-প্রলয় আছে; কিন্তু সূর্য্যের আলোকের জন্ম-স্থিতি-প্রলয় নাই। এই প্রাকৃত উদাহরণের দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি যে, চেতনবস্তুর জন্ম-স্থিতি-প্রলয় নাই; পরন্তু চেতনের বিপরীত প্রতিফলন যে জড় বৈশিষ্ট্য, তাহারই জন্ম, স্থিতি এবং প্রলয় আছে—তাহা কুহকস্বরূপ; এই আছে, এই নাই। সেই 'এই-আছে এই-নাই' অথবা উদ্বেগ-সমন্বিত অসৎগ্রহ তত্ত্ব যেখানে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইয়া নাম, ধাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য-রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাই নিরস্ত-কুহক পরমসত্য বস্তু।

জীবসত্তাকে তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে। কারণ, চঞ্চল জীব কখনও-বা জড়-শক্তির অধীন, আবার কখনও-বা পরাশক্তির অধীন। কিন্তু যে অক্ষয় পুরুষ কোন দিনই সেই প্রকার শক্তির অধীন তত্ত্ব না হইয়া সর্ব্বদাই সেই শক্তির অধীশ তত্ত্বরূপে বিরাজমান থাকেন, সেই কূটস্থ পুরুষই পরমব্রহ্ম ভগবান বাসুদেব—অদ্বয় জ্ঞান পরম সত্য। সেই পরম সত্য হইতে সমস্ত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া তিনি শক্তিমান তত্ত্ব। 'স্বরাট্' এবং 'পরম' এই দুইটি তত্ত্ব একত্রে সংযোগ করিলেই পরতত্ত্ব, শাশ্বত, আদি-পুরুষ, সর্ব্বকারণের কারণরূপে পরিচিত হন। সেই অপ্রাকৃত আদি-পুরুষ যে, কোন দিনই মায়ার অধীন হন না, তাহা আমরা ভাগবতের (১/১১/৩৮) নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে প্রমাণ পাই। যথা ঃ—

*এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ ।*
*ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥*

ভগবৎ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যই এই যে, তিনি মায়িক জগতে অবতরণ করিয়াও মায়াগুণাকৃষ্ট হন না। যেমন তিনি আকৃষ্ট হন না, সেইরূপ তাঁহার ভক্তগণও মায়িক বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হন না। ভগবান্ যেমন নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ, সেইরূপ ভগবদ্ ভক্তও যে-কোন অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকুন না কেন, তিনিও নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত অবস্থায় বাস করেন। একটি সামান্য উদাহরণের দ্বারা এই কথাটি সহজেই বুঝা যায়। জড়বিদ্যার প্রগতি-স্বরূপ মায়াময় জগতে কতই বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। যেমন চলচ্চিত্র 'বায়োস্কোপ' ইত্যাদি প্রলোভনীয় বস্তু সমুদয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই প্রকার বায়োস্কোপাদি প্রলোভনীয় বস্তুতে আকৃষ্ট হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনও সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখা যায় না। অনেক তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসীকে গাঁজা বিড়িতে আকৃষ্ট দেখা গেলেও, তাহারা অন্যান্য বহু মায়িক বস্তু হইতে স্বভাবতই বিরত থাকে। সেই সকল অপরিপক্ক চেতনরাজ্যের পথিকগণ কখনও কখনও ভগবানকে মানুষ বা মানুষকে ভগবান্ বলিয়া ভুল করিয়া বসেন কিন্তু তাই বলিয়া ভগবান্ কোন দিনই মানুষ নহেন, বা মানুষ কোন দিনই ভগবান্ নহে।

আমাদের পরিচিত কোনও ব্রহ্মচারী চেতনরাজ্যের পথিক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ডঃ রাধাকৃষ্ণন এখন ভারতবর্ষের সহকারী রাষ্ট্রপতি। ব্রহ্মচারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একখানি Bhagavad-Gita নামক গ্রন্থ উপহার পাইয়াছেন। এই গ্রন্থখানি ডঃ রাধাকৃষ্ণনেরই ইংরাজী ভাষ্য এবং বাজারে ১০ টাকা মূল্যে বহুল পরিমাণে বিক্রয় হয়। ব্রহ্মচারী বইখানি পড়িয়া আমাদের নিকট আসেন; কিন্তু এই গ্রন্থ বহু গবেষণা-পূর্ণ হইলেও উক্ত ব্রহ্মচারীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ ঐ গ্রন্থে



অপ্রাকৃত অনুভূতির অভাবে বহু জায়গায় এমন সব কথা লিখা হইয়াছে, যাহা সাত্বত সমাজে কোনদিনই আদরণীয় হইবে না। এতদ্দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের উপরোক্ত শ্লোকে যে *মুহ্যন্তি যৎ সুরয়ঃ* লিখিয়াছেন, তাহাই প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণও যেখানে মুহ্যমান হন, সেখানে ডঃ রাধাকৃষ্ণন যে মুহ্যমান হইবেন, তাহাতে আর বিশেষ আশ্চর্য্য কি আছে?

ব্রহ্মচারীজী ডঃ রাধাকৃষ্ণনের ভগবদ্‌গীতায় ২৫৪ পৃষ্ঠায় ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ৩৪ নং শ্লোকের বিপর্য্যয়-অর্থ পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত অন্তরেই আমাদের নিকট আসেন এবং এই গ্রন্থের আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। অনেকটা তাঁহার অনুরোধেই (নিউদিল্লী হরিসভায় পাঠ করিবার সময়) আমরা বক্ষ্যমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঐ পত্রে ইংরাজী ভাষায় যে কথাগুলি উল্লেখ আছে, তাহা এইরূপ। যথা—

"It is not the person Krishna to whom we have to give ourselves up utterly but the Unborn, Beginningless Eternal Who speaks through Krishna." ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকের সহিত আমাদের বাদানুবাদ করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, ব্রহ্মচারীজীর অনুরোধে, তাঁহার ইংরাজী ভাষ্যের যেখানে যত প্রকার বিরুদ্ধার্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখাইতে বাধ্য হইলাম। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের প্রতি আমাদের অটুট শ্রদ্ধা আছে, কারণ তিনি যে আমাদের ভারতবর্ষের দ্বিতীয়-প্রধান ব্যক্তি তাহা নহে, পরন্তু তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত এবং হিন্দু-দর্শনের আচার্য্য। শুধু তাহাই নহে, তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী পারমার্থিক। যেহেতু, এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পণ্ডিতের সহিত শত্রুতাও ভাল, কিন্তু মূর্খের সহিত বন্ধুত্ব ভাল নহে। সে-জন্য আমরা আরও সাহসী হইয়াছি। পণ্ডিত ব্যক্তি

বিপক্ষ হইলেও তিনি বুঝিয়া প্রতিবাদ করেন; কিন্তু মূর্খ, বন্ধু হইলেও অনেক সময় কার্য্য-বিপর্য্যয় ঘটায়। অতএব ডঃ রাধাকৃষ্ণনের ইংরাজী গীতাভাষ্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে আমরা মোটেই ভীত নহি।

বাংলা দেশে একটি লৌকিক প্রবাদ আছে যে "সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাবা?"—এইরূপ প্রশ্ন যদি কেহ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি হাস্যাস্পদ হয়। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের উপরোক্ত ইংরাজী উদ্ধৃত ভাষ্যে আমরা সেই প্রকার বিরুদ্ধ কথা দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকে ব্যক্তিগত ভাবে প্রপত্তি করিতে হইবে না। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে (?) যে অনাদি অব্যয় এবং অজ-তত্ত্ব আছে, তাঁহাতে প্রপত্তি করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই ব্যক্ত হইল যে, 'শ্রীকৃষ্ণ' আর 'শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে' যে তত্ত্ব আছে, তাহা পৃথক তত্ত্ব (?)। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের বিচারে শ্রীকৃষ্ণেরও দেহ-দেহী ভেদ আছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের দেহতে প্রপত্তি না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্য্যামীকেই প্রপত্তি করিতে হইবে। এই অভিনব আবিষ্কারে আমরা ডঃ রাধাকৃষ্ণনকে উপরোক্ত রামায়ণ-পণ্ডিতের সমতুল্য মনে করি। কারণ ভগবদ্গীতার একমাত্র লক্ষ্য বস্তু পরাৎপরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রপত্তি করা ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সেই বিষয়েই প্রথম আপত্তি। ভগবদ্গীতার শেষ কথা—

*সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।*
*অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥*

এতদ্দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, কোনরূপ আপত্তি না করিয়াই তাঁহার পাদপদ্মে প্রপত্তি করা হউক। *শরণং* অর্থে শরণাগতি এবং ডঃ রাধাকৃষ্ণন এই শরণাগতি সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তাহা এইরূপ, Prapatti has the following accessories—(1) good will to all



(anukulyasya samkalpah), (2) absence of ill will (pratikulya-vivarjanam), (3) faith that Lord will protect (rakshishyatiti viswasa-palanam), (4) resort to Him as savior (goptritve varanam tatha), (5) sense of utter helplessness (Karpanyam), (6) complete surrender (atmanikshepa).

[Introductory essay of Gita, page 62].

এই ষড়্‌বিধ-শরণাগতি কৃষ্ণ সম্বন্ধে বা বিষ্ণু সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। কারণ, উক্ত ষড়্‌বিধ শরণাগতির নির্দ্দেশ বৈষ্ণবীয় তন্ত্র শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। ডঃ রাধাকৃষ্ণন *আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ* অর্থে সকলের প্রতি সম-দর্শনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সকলের নিকট শরণাগতি কি সম্ভব হয়? শরণাগতি এক ভগবানের ব্যক্তিত্বেই সম্ভব হয়। দুনিয়ার লোকের নিকট বা জীবের নিকট শরণাগতি কোন ক্রিয়াত্মক তত্ত্ব নহে। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের বহু পূর্ব্বে সমস্ত আচার্য্যগণ এবং গোস্বামিগণ *আনুকূল্যস্য সংকল্প* অর্থে *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*—কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং সকল আচার্য্যকে লঙ্ঘন করিয়া ডঃ রাধাকৃষ্ণনের কথা শুনিতে কোন পণ্ডিত রাজী হইবেন না। যখন 'faith in the Lord' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তখন ভগবানকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে মধ্যস্থ করা কিরূপ যুক্তি হইল, তাহা বুঝা গেল না। অর্জ্জুন যখন *'শিষ্যস্তে অহং', 'মাং প্রপন্নম্'*—এই সব কথা বলিয়া ভগবদ্গীতা শ্রবণ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব তখনও আলোচিত হয় নাই, এবং যখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের আধার শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই বলিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ নিরাকারে কখনও প্রপত্তি সম্ভব হয় না—ইহাই যুক্তিপূর্ণ কথা। যাহারা নির্ব্বিশেষপর, তাহারা ঐ কার্য্যে বহু কষ্ট বা চেষ্টা করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের তাহা মায়িক সবিশেষ স্ত্রী-পুত্রাদিতেই প্রপত্তি হইয়া পড়ে।

# নির্গুণ ভক্তিতে জানে আমার স্বরূপ

মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির প্রভাবে অনেক সময় দুষ্টবাদিগণ বাক্‌চাতুর্য্যের দ্বারা ভগবানকে সাধারণ লোক-চক্ষের অন্তরাল করিতে পারেন, এ কথা আমরা ভাগবতের সিদ্ধান্ত হইতে জানিতে পারি। কলির প্রভাব পণ্ডিতগণের উপর যে ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

*কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং*
*ত্রিলোক-নাথানত-পাদপঙ্কজম্ ।*
*প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং*
*যক্ষ্যন্তি পাষণ্ড-বিভিন্ন-চেতসঃ ॥*

(ভাঃ ১২/৩/৪৩)

অর্থাৎ, হে রাজন্! কলিযুগে মানবগণ প্রায়শঃ পাষণ্ডগণ-কর্ত্তৃক বিকৃতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মাদি-ত্রিলোকেশ্বরগণ কর্ত্তৃক বন্দিত পদকমল জগতের পরমগুরু ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিবে না। *আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ*—অর্থে 'শ্রীভগবানে প্রপত্তি' না বলিয়া ডঃ রাধাকৃষ্ণন সাধারণ পণ্ডিতের মতই "Good will for all" অর্থ করিয়াছেন।

ভক্তিরাজ্যে শ্রদ্ধা বা প্রপত্তিই প্রথম কথা। প্রপত্তির একমাত্র অর্থই হইতেছে—নিজেকে ভগবানের সেবক মানিয়া লওয়া। এই প্রপত্তি স্বীকার করিবার জন্য ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মত মহা মহা পণ্ডিত এবং জ্ঞানিগণকেও অনেক তপস্যা করিতে হইবে। ইহাই ভগবদ্‌গীতার সিদ্ধান্ত। ষড়্‌বিধা শরণাগতির কথা যাহা ডঃ রাধাকৃষ্ণন ব্যপদেশিক





উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবতন্ত্রের কথা। সুতরাং ঐ ষড়বিধা শরণাগতি বিষ্ণু-আরাধনা সম্পর্কেই ব্যবহৃত। শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাকারী ভক্তগণই 'বৈষ্ণব' শব্দে বিখ্যাত। 'আনুকূল্য'-অর্থে ভগবানের অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা সেবা। *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুচ্যতে।* জগতে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যিনি কৃষ্ণানুশীলন করিতেছেন না। কিন্তু কেহ অনুকূলভাবে কৃষ্ণসেবা করিতেছেন, আবার কেহ বা প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতেছেন। যাঁহারা প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতেছেন, তাঁহারাই অভক্ত, হীন ছার, আর যাঁহারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতেছেন, তাঁহারাই প্রকৃত চতুর। 'যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর'—'অভক্ত-হীন-ছার' দলের নেতৃবৃন্দ কংস, জরাসন্ধাদি বহু প্রাকৃত-পণ্ডিত।

ভগবদ্‌গীতার মূলকথাই—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি লাভ করা। একথা স্বয়ং শ্রীভগবানেরই *মুখ-পদ্মাৎ বিনিঃসৃতা;* কিন্তু সেই মূল কথাটাই উল্টাইয়া দিয়া ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলিতে চাহেন—"Surrender not to the person Krishna." ভগবদ্‌গীতাকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডিত্য দ্বারা ভগবদ্‌গীতার বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে মূঢ়তাবশতঃ মনুষ্য-বুদ্ধি করা 'বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদে'র ন্যায়। এই প্রকার 'বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ'-দর্শনকে 'সোজাসুজি প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন' ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

এই প্রকার 'বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ' প্রচারের পক্ষপাতী ডঃ রাধাকৃষ্ণন-এর মত পণ্ডিতগণকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে সম্মান করিয়াছেন, তাহা আমরা ভগবদ্‌গীতার ৭/১৫ শ্লোকে দেখিতে পাই। যথা--

*ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।*
*মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥*

প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনকারী কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুরগণ এবং প্রতিকূলভাবে ভগবদ্গীতার অনুশীলনকারী মায়িক পণ্ডিতগণ এক জাতীয়। সেই প্রকার প্রতিকূল অনুশীলনকারী অসুরগণ মায়ার দ্বারা অপহৃত-জ্ঞান। কংস, জরাসন্ধাদি সকলেই খুব বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করায় অসুর-সংজ্ঞায় গণিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও আচরণ দ্বারা অনুকূলভাবে ভগবদ্গীতার অনুশীলনই আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে পারি। যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীরঙ্গমক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে এক সরল ব্রাহ্মণকে শ্রীভগবদ্গীতা পাঠে নিযুক্ত দেখিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সরল ব্রাহ্মণকে স্বানুভবানন্দে ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে দেখিয়া এবং তাঁহার চক্ষে সাত্ত্বিক অশ্রু-পুলকাদি দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রতিবাসিগণ জানিতেন যে, উক্ত ব্রাহ্মণ নিরক্ষর; অতএব তাহাদের মতে নিরক্ষর ব্যক্তি কিভাবে ভগবদ্গীতা পড়িতে পারে, তাহা চিন্তার বিষয় হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন যে, অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম নিরক্ষরও বুঝিতে পারে, যদি তাঁহার শরণাগতি বা প্রপত্তি পূর্ণভাবে থাকে। অন্যথায় ভগবদ্গীতা বুঝিবার যোগ্যতা কাহারও নাই। সেইভাবে ভগবদ্গীতা পাঠ করিলেই জীব *স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ* হইয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে সাশ্রুনেত্রে ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কোন্ অংশ পাঠ করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ-লোচন হইয়াছেন? ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবোচিত দৈন্য সহকারে বলিলেন যে, তিনি ভগবদ্গীতার পাঠ অভিনয় করিতেছেন মাত্র, আসলে তিনি নিরক্ষর। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার গুরুর আজ্ঞায় তিনি অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা নিরক্ষর হইলেও পাঠ করিয়া থাকেন। গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া যেন-তেন-প্রকারে তাঁহার আদেশ পালন একান্ত কর্ত্তব্য মনে করিয়া পাঠ করিবার ছলনা করিতেছেন মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, যখনই তিনি ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে বসেন তখনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 'পার্থ-সারথী-রূপ' তাঁহার হৃদয়ে উদিত হন। সেই ছবিখানি দেখিলেই তাঁহার ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্যের কথা স্মরণ হয় এবং সেই স্মরণ-প্রভাবেই তাঁহার চক্ষে অশ্রু বহিতে থাকে। মায়াবাদী মহাপণ্ডিতগণ 'অদ্বয়জ্ঞান' ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া ভগবান্ হইবার জন্যই ব্যস্ত; কিন্তু এই ধৃষ্টতা পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ ভক্তের আজ্ঞাবাহী সারথী কিভাবে হইতে পারেন, তাহা তাঁহাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সমাধান হয় না। বাস্তবিকই ভগবানের সহিত জীবের নিত্যসিদ্ধ যে সম্বন্ধ, তাহাতে আরও অনেক কিছু সম্ভব হয়—এ কথা মায়াবাদীকে বুঝাইলেও বুঝে না। শ্রুতিবাক্যের যে মন্ত্র (শ্বেঃ) *যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।/তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥* এই বিচারে ভগবান্ এবং গুরুতে যাঁহার পরাভক্তি আছে, তাঁহার নিকটই শ্রুতিমন্ত্র প্রকাশিত হয়, অন্যত্র নহে। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের গীতা পাঠের অনুভূতি দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহারই গীতাপাঠ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর স্বীকৃতি জাগতিক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি কোটি Doctorate উপাধি অপেক্ষা যে বড় 'স্বীকৃতি', এ কোন্ অর্ব্বাচীন স্বীকার না করিবে? এই স্বীকৃতি দ্বারাই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইল যে, প্রাকৃত বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা ভগবদ্গীতা পাঠ্য নহে; পরন্তু অপ্রাকৃত অনুভূতিতে যাহা আচার্য্য-পরম্পরায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই একমাত্র গীতার অনুভূতি, অন্যত্র 'শ্রম এব হি কেবলম্'। ভগবান্ অপ্রাকৃত; তাঁহার বাণী অপ্রাকৃত এবং সেই অপ্রাকৃত-বস্তু অপ্রাকৃত আচার্য্য-পরম্পরাতেই প্রাপ্য; ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য।

*অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।*
*সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥*

জড়-ভাব সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না হইলে, অপ্রাকৃত কৃষ্ণের নাম, ধাম, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য কখনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয় না। সেবোন্মুখ ভক্তেরই জিহ্বাদি দ্বারা ভগবানের নাম, চক্ষের দ্বারা ভগবানের রূপ বা কর্ণের দ্বারা ভগবানের গুণ-লীলা গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

*প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন*
*সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।*
*যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণস্বরূপং*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥*
*(ব্রঃ সং)*

যাঁহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমনিবন্ধন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাই কেবল ভগবানের অপ্রাকৃত শ্যামসুন্দররূপ সদাসর্ব্বদাই হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন। সে-বিষয়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মত বড় বড় কর্ম্মবীর ধর্ম্মবীরের কোন প্রবেশ-অধিকার নাই, ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিবার অধিকার ভক্তেরই আছে, অন্যের সে অধিকার আদৌ নাই। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।* *(গীঃ ১৮/৫৫)*

অতএব ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মত পণ্ডিত ব্যক্তির জানা আবশ্যক যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ নাই। তাঁহার দেহদেহীভেদ নাই। 'অদ্বয়-জ্ঞান' শ্রীকৃষ্ণই Absolute পরতত্ত্ব—ইহাই গীতার তাৎপর্য্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে আর একটি তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া ডঃ রাধাকৃষ্ণন নিজেই দ্বৈতবাদী (?) হইয়া পড়িয়াছেন। যে-তত্ত্ব প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, সে বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাহার প্রমাণ;—ভগবদ্গীতায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।



*অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ।*
*ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব-সমন্বিতাঃ ॥*
*(গীঃ ১০/৮)*

*সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো*
*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ ।*
*বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো*
*বেদান্তকৃৎ বেদ-বিদেব চাহম্ ॥*
*(গীঃ ১৫/১৫)*

সুতরাং যাঁহারা বুধ বা যাঁহারা বাস্তবিক লেখাপড়া শিখিয়া বুদ্ধিমান হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, সমস্ত জিনিসের মূল জন্মদাতা স্বরাট্-পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই একমাত্র Beginningless আদি পুরুষ—*পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্।* যাঁহারা ভাব-সমন্বিত অর্থাৎ যাঁহাদের জড়ভাব বিদূরিত হইয়া অপ্রাকৃত ভাবের উদয় হইয়াছে, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণকে *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—সূত্রের মূলসূত্র বলিয়া জানেন। ভাবশুদ্ধি না হইলে শতসহস্র সিদ্ধিপ্রাপ্ত মুনিগণও মতিভ্রমে পতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে পারেন না।

*যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ (গীঃ ৭/৩)*

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য সবগুলিই একটি তত্ত্ব। তাঁহার সম্পর্কে কোনটিই পৃথক তত্ত্ব নহে।

*নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-বিগ্রহঃ ।*
*পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥*

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে চিন্তামণি এবং তাঁহার সমস্ত পরিবারই চিন্তামণি; তাঁহার ভিতর-বাহিরে সবটাই পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত ও তাঁহা হইতে অভিন্ন। ইহা বুধগণই বুঝিতে সমর্থ; যাহারা মায়াদ্বারা অপহৃত জ্ঞান, তাহারা বুঝিতে অসমর্থ।

অদ্বৈতবাদিগণ অদ্বয়-জ্ঞানের কথা বুঝিতে পারে না, সেই জন্য ডঃ রাধাকৃষ্ণন স্বকপোল-কল্পিত অদ্বয়জ্ঞানে দ্বৈতজ্ঞান স্থাপন করিয়াছেন। যদি ডঃ রাধাকৃষ্ণন এই কথাই বলিতে চাহেন যে, নিরাকার ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর হইতে প্রপত্তির কথা বলিতেছেন, তাহা হইলে নিরাকার ব্রহ্মও কথা বলিতে পারেন—এ কথাও স্বীকার করিতে হয়।

যদি নিরাকার ব্রহ্ম কথা বলিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার কথা বলিবার যন্ত্র—জিহ্বাদি আছে, স্বীকার করিতে হয়। অতএব তাঁহার নিরাকারবাদ স্বতঃই ধ্বংস হইয়া যায়। যে ব্যক্তি কথা বলিতে পারে, সে চলিতেও পারে—ইহাও শাস্ত্র-প্রমাণ। যিনি চলিতে পারেন, কথা বলিতে পরেন, তিনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত। অতএব তাঁহার ভোজন, শয়ন আদি সব কার্যই সিদ্ধ। সুতরাং সেই Beginningless, Eternal বস্তু যে নিরাকার নহেন, একথা ডঃ রাধাকৃষ্ণন কিভাবে অস্বীকার করিবেন।

ডঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁহার মুখবন্ধের (Introductory essay) ৬২ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিয়াছেন—

"When we are emptied of our self (?) God takes possession of us. The obstacles to this God-possesion are our own virtues, pride, knowledge, our subtle demands, our unconscious assumptions and prejudices."

অতএব তাঁহারই যুক্তি দ্বারা আমরা তাঁহাকে বলিতে পারি যে, ডঃ রাধাকৃষ্ণন নিজের অনবধানতার জন্য এবং পূর্ব্ব-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই শ্রীকৃষ্ণকে দেহ-দেহী-ভেদরূপে দর্শন করিয়াছেন। তিনি এখনও পর্য্যন্ত জড়াহঙ্কার-বর্জ্জিত নহেন (emptied of self)। সুতরাং স্বোপার্জ্জিত virtues, pride, knowledge এবং subtle demands এবং unconscious assumptions and prejudices



সবই যেমনটি তেমনটি আছে। তিনি নিশ্চয় মায়াবাদ সংস্কারের দ্বারাই চালিত হইয়াছেন—পারম্পর্য্য তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। আর একদিকে বিচার করিলে আমরা একথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারি যে, মায়াবাদের আদি-পিতা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য 'জগৎ মিথ্যা' প্রমাণ করিয়া সন্ন্যাস, বৈরাগ্য আদির বৈশিষ্ট্যের উপরই অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। তিনি মিথ্যাভূত জগতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া সময় নষ্ট করেন নাই। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যদি তাঁহার মায়াবাদ-দর্শনের আধুনিক বিপর্য্যয় দর্শন করেন, তাহা হইলে হয় ত' নিজেই লজ্জিত হইয়া যাইবেন। ডঃ রাধাকৃষ্ণন যে তাঁহার সংস্কার দ্বারা চালিত হইয়াছেন, তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। কারণ তিনি নিজেই তাঁর Introductory essay (page 25)-তে এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা—"The emphasis of the Gita is on the Supreme as the PERSONAL GOD who creates the perceptible world by His Nature (Prakriti). He resides within the heart of every being. He is the enjoyer and lord of sacrifices. He stirs our heart to devotion and grants our prayers, He is the source and restrainer of values. He enters into personal relations with us in worship and prayers."

ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য এইভাবে স্বীকার করিবার পরও যে ডঃ রাধাকৃষ্ণন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহী ভেদ করিয়াছেন ইহা পূর্ব্ব সংস্কার এবং জড়বিদ্যার ফল ছাড়া আর কি হইতে পারে? Supreme Absolute অদ্বয়জ্ঞানের দেহ-দেহী ভেদ করা, ইহা কোন্ দেশীয় অদ্বৈতবাদ?—তাহা আমরা ডঃ রাধাকৃষ্ণনের নিকট হইতে জানিতে পারি কি? ইচ্ছা-দ্বেষ দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়া স্বর্গে আসিতে হয়। সুতরাং সেই ইচ্ছা-দ্বেষ দ্বারপথে যে cult of pride and

prejudice তৈয়ারী হয়, তাহারই নাম মায়া। "কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥" ভগবান্ যখন স্বয়ং সর্ব্বদেহে বর্ত্তমান ক্ষেত্রজ্ঞ, তখন তাঁহার দেহে আবার কে বসিবে? ভগবদ্গীতায় ভগবানের ব্যক্তিত্ব বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ভগবান্ নিজেই যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহা ডঃ রাধাকৃষ্ণন নিজের জড়-বিদ্যার দ্বারা খন্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। এই প্রকার অপচেষ্টার দ্বারা জগতে বিদ্যা বিতরণের অভিনয়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণন অবিদ্যার প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মত মহান্ ব্যক্তির পক্ষে ইহা উচিত হয় নাই।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই তিনই অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব—একাত্মা ডঃ রাধাকৃষ্ণন জানেন না, বলিলে আমরাই হাস্যাস্পদ হইব। সুতরাং সেই ভগবান্ যখন আসেন তখন কিভাবে তিনি মায়িক হন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। গীতায় স্পষ্টই লিখা আছে যে, তিনি আত্মমায়া-দ্বারা আবির্ভূত হন এবং নিজ প্রকৃতি বা স্বরূপেই অবতীর্ণ হন। এবং যেহেতু তিনি নিজে যেমনটি তেমনটিই (আকৃতি প্রকৃতি এক পর্য্যায়) আসেন, সেহেতু তাঁহার দেহ-দেহী ভেদ নাই, ইহাই স্পষ্ট লিখা আছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম যে দিব্য বা প্রাকৃত বা জড়াতীত, একথাও স্পষ্ট লিখা আছে, এবং তিনি শাশ্বত, আদিপুরুষ, পরমব্রহ্ম, পরম পবিত্র—একথাও লিখা আছে। জীব-'ব্রহ্ম' মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হন—একথা স্বীকার করি; কিন্তু পরমব্রহ্ম যদি মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলে মায়াই ত' ব্রহ্ম অপেক্ষা পরতত্ত্ব হইয়া যায়?

# ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ

যদি ডঃ রাধাকৃষ্ণন অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, অজত্ব ইত্যাদি অপ্রাকৃত গুণগুলি কেবলমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই গুণ মনে করেন, তাহা হইলে তাহার উত্তর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেই পাওয়া যাইবে। অদ্বয়-জ্ঞান পরতত্ত্বের সমস্ত চিৎপ্রকাশেরই অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব এবং অজত্ব স্বতঃসিদ্ধ গুণ। যথা—

*ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।*
*ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত-ধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥*
(গীঃ ১১/১৮)

যেখানে পরমব্রহ্মকে অক্ষর পরমব্রহ্ম শব্দে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইখানেই পরম ব্রহ্ম *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*- কেই বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষর জীবতত্ত্বের সহিত সমান বলিয়া কোথাও সাব্যস্ত হন নাই। ডঃ রাধাকৃষ্ণন কেন, বড় বড় আধিকারিক দেবতাগণও, যথা শিব-বিরিঞ্চি-ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সকলেই ক্ষর-তত্ত্ব অর্থাৎ জীবকোটির মধ্যে পরিগণিত। তাঁহারই বিভিন্ন শক্তিদ্বারা তিনি এই অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছেন। অগ্নি যেমন এক স্থানে স্থিত হইয়াও তাহার বিভিন্ন শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, সেইভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব, নিত্যত্ব, অব্যয়ত্ব এবং অজত্ব অক্ষুণ্ণ ও বজায় রাখিয়া জীবকোটি, বিষ্ণুকোটি, মায়াশক্তি ও চিচ্ছক্তি এবং তটস্থাশক্তি আদি বহু প্রকারে নিজেকে বিস্তার করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহার পূর্ণত্বের হানি হয় না। *পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়*

*পূর্ণমেবাবশিষ্যতে* ইহাই উপনিষদের বিচার। তিনি শাশ্বত পুরুষ এবং তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য সমস্তগুলিই নিত্য শাশ্বত অব্যয়-তত্ত্ব। *'পুরুষঃ'* শব্দে ভোক্তা। ভোক্তা কখনও নিরাকার, নপুংসক হইতে পারেন না। তিনি নির্গুণ হইয়াও গুণ-ভোক্তা। তিনি মায়িক ত্রিগুণ-বর্জ্জিত হইয়াও চিদ্গুণের ভোক্তা।

ডঃ রাধাকৃষ্ণন *'অক্ষরঃ'* শব্দে অব্যয় অর্থ করিয়াছেন। অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আদিপুরুষ অক্ষর পরম ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত করিয়াছেন; সুতরাং ডঃ রাধাকৃষ্ণন কোন্ বিচারে শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহী-ভেদ করিতে পারেন—তাহা বুঝা যায় না। ডঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁহার পুস্তকে (পৃঃ ২৭৫) অর্জ্জুনের নাম দিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই পরমব্রহ্ম এবং ভগবান্, তিনিই অদ্বয়-জ্ঞান ভগবান্ ইত্যাদি।

উক্ত ২৭৫ পৃষ্ঠায় ডঃ রাধাকৃষ্ণন অর্জ্জুনের নাম দিয়া 'আমতা-আমতা' করিয়া কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই কথাগুলি গোঁজামিল দিয়াছেন। যথা—"Arjuna states that Supreme (Shri Krishna) is both Brahman, Iswara, Absolute God." ডঃ রাধাকৃষ্ণন যদি তত্ত্ব বস্তুটির বিষয়ে এত অসম্পূর্ণ জ্ঞান রাখেন যে, ভগবান্ মানে ব্রহ্ম হইতে পৃথক, তাহা হইলে তিনি গীতা কি ভাবে পাঠ করেন তাহা বলা কঠিন। তাঁহার মতে ভগবান্ বা পরমেশ্বর কৃষ্ণ মায়িক, ব্রহ্ম নন। সেজন্য এই প্রকার অর্থকারিগণকে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এইভাবে ধিক্কার দিয়াছেন। যথা—

*"ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার।*
*এ অর্থ না জানি' মূর্খ অর্থ করে আর॥"*

(*চৈঃ চঃ আঃ ২/৬০* )

কিন্তু আমরা পরম্পরা-সূত্রে অর্জ্জুনকে বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকেই ডঃ রাধাকৃষ্ণন অপেক্ষা অধিক সমীচীন স্বীকার করিব।



কারণ, এই যুগে অর্জ্জুনই সাক্ষাৎভাবে ভগবদ্গীতা শুনিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থও স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অর্জ্জুনের পরম্পরা-সূত্রে যাঁহারা গীতা বুঝিবেন তাঁহারাই বাস্তবিক গীতা পাঠ করিয়া থাকেন—"আর সব মরে অকারণ"। আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বা ভগবদ্গীতায় কি বলিতেছেন সে-বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভগবানের অঙ্গকান্তি ইহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ; যেমন সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যের অঙ্গকান্তি। সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্যের অধীন তত্ত্ব, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ও অধীন-তত্ত্ব মাত্র। যথা—

*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।*
*শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥*

(*গীঃ* ১৪/২৭)

'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের আধার'—একথা গীতায় স্পষ্টভাবে লিখা থাকিলেও ডঃ রাধাকৃষ্ণনের তাহা যেন মনঃপূত হয় নাই। তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

"For I (Shri Krishna) am the abode of Brahman, the immortal and the imperishable eternal law and absolute bliss."

শ্রীকৃষ্ণ যদি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের আধারই হন, তাহা হইলে নিরাকার ব্রহ্ম হইতে তিনি যে অনেক বড় এবং শ্রেষ্ঠ, একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ঘরের ভিতরই 'মশারি' থাকে, কিন্তু মশারির ভিতর ঘর থাকে না; টেবিলের উপর দোয়াত থাকে, দোয়াতের ভিতর টেবিল থাকে না। এই সহজ কথা ত' বালকও বুঝিতে পারে; কিন্তু ডঃ রাধাকৃষ্ণন সে-বিষয়ে কেন 'আমতা-আমতা' করিতেছেন, বুঝা কঠিন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণ শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, আদি, শাশ্বত পুরুষ, পরম

ব্রহ্ম—একথা ভূরি ভূরি প্রমাণের সহিত ভগবদ্‌গীতায় সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি *'উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ"*—ন্যায়ে তাঁহার বাক্‌চাতুর্য্যে সেই সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবে বিদ্যার পরিবর্ত্তে অবিদ্যা প্রচার করিয়াছেন। এই কার্য্য আমরা আদৌ অনুমোদন করি না। ব্যতিরেকভাবে হউক, অন্বয়ভাবেই হউক, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মের আধার, সে-বিষয়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণন পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলেও তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। যদি শ্রীকৃষ্ণ Absolute God বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার ভিতরে আবার কোন্ বস্তু থাকিতে পারে যদ্দ্বারা ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলিতে পারেন যে,—It is not the personal Krishna to whom we have to give ourselves up etc.

আসল কথা, ভগবানের কৃপা না হইলে যে ভগবৎ-তত্ত্ব বুঝা যায় না, ডঃ রাধাকৃষ্ণনের পুস্তকে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। মায়াবাদী ভগবানের চরণে মহা অপরাধী; সুতরাং তাহাদের নিকট কোনদিনই ভগবান্ প্রকাশিত হন না—*নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ* (*গীঃ* ৭/২৫) ইত্যাদি প্রমাণ। মায়াবাদী যে অপরাধী তাহা সমস্ত আচার্য্যগণই বলিয়াছেন; পরন্তু, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু এই নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার মায়াবাদিগণকে সোজাসুজি অপরাধী সংজ্ঞিত করিয়াছেন। *মায়াবাদীভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ*। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থে মায়াবাদী সম্বন্ধে মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ। যথা—

*প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী ।*
*ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য কহে নিরবধি ॥*
*অতএব তার মুখে না আইসে 'কৃষ্ণ'-নাম ।*
*কৃষ্ণের 'নাম', কৃষ্ণের 'স্বরূপ' দুইত সমান ॥*
*নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ ।*



*তিনে ভেদ নাহি তিন চৈতন্য-স্বরূপ ॥*
*'দেহ-দেহী' 'নাম-নামী' কৃষ্ণে নাহি ভেদ ।*
*জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ ॥*
*অতএব কৃষ্ণের নাম-দেহ-বিলাস ।*
*প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥*
*কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ ।*
*কৃষ্ণের স্বরূপ সম, সব চিদানন্দ ॥*

(*চৈঃ চঃ মঃ* ১৬/১২৯-৩৫)

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের অনুকরণকারী মায়াবাদিগণ—'গোঁড়ামী' করিয়া জীবকে পরমব্রহ্ম ভগবানের অংশ বলিয়া স্বীকার করেন না। এবং সেই অংশই যে মায়া দ্বারা আবৃত হয়, পূর্ণব্রহ্ম হন না বা পূর্ণব্রহ্মই পরমপুরুষ—একথা মায়াবাদীরা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের 'ঘটাকাশ-পটাকাশ'-ন্যায়ের বিকৃত বিচারে জীব মুক্ত হইয়া গেলে, সেই ব্রহ্মের সহিত একত্রে মিলিত হইয়া যায় এবং সেই মুক্ত অবস্থায় কাহারও ব্যক্তিত্ব থাকে না। এই বিচারে পরমব্রহ্ম আদি পুরুষ তাঁহার স্বীয় বিগ্রহ যখন এই জগতে প্রকট করেন তখন সেই সকল মূঢ়গণ ভগবানকেও সাধারণ জীব মনে করিয়া তাঁহার দেহ-দেহী-ভেদ করিয়া অপরাধী হন। অতএবং ডঃ রাধাকৃষ্ণন যে শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহী-ভেদ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি যতই পণ্ডিত হউন না কেন, তিনি 'মায়াপহৃত-জ্ঞান' এবং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বিচারে মহা অপরাধী ব্যক্তি। অপরাধী ব্যক্তি কখনই কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্ত হয় না। অপরাধী ব্যক্তিগণই ভগবদ্‌গীতায় *'মূঢ়াঃ'* বলিয়া কথিত হইয়াছে, যেহেতু তাহারা কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে মানুষের ন্যায় জ্ঞান করতঃ তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ করে। মায়াবাদীর ভগবদ্বিদ্বেষ প্রচার-ফলে, আজ জগতে নিরীশ্বরগণের উৎপাতে সমস্ত জগৎকে নরক-সদৃশ করিয়াছে। এই

অপরাধিগণের কবল হইতে জীবকে উদ্ধার করাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারবৈশিষ্ট্য। যাঁহারা সে-বিষয়ে নিশ্চেষ্ট, তাঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে অপরাধী। মায়াবাদিগণ যতই আধ্যাত্মিকতার ছলনা করুক না কেন, তাঁহাদের মত ভৌতিকবাদী আর দ্বিতীয়টি নাই। তাহাদের বৈরাগ্য—ফল্গু-বৈরাগ্য জগৎকে বিপথগামী করিতেছে। বাক্-চাতুর্য্যে লোককে মোহিত করিয়া তাহারা কেবল মাত্র ভৌতিক লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক হইয়া পড়িতেছে। ভৌতিক উন্নতিই জগতের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে; চেতনের সংবাদ, চেতনের বিশ্বাস তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। এই প্রকার ছল-ধর্ম্মগুলিকে শ্রীমদ্ভাগবত কৈতবধর্ম্ম বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কৈতবধর্ম্মে যাহারা আকৃষ্ট, তাহারা বঞ্চক ও বঞ্চিত-সম্প্রদায়। তাহাদের আধ্যাত্মিকতা একটা সখের বাক্-চাতুর্য্য মাত্র,—কোথায় মুক্তি, কোথায় ভক্তি। এই সকল আধ্যাত্মিক ধুরন্ধরগণ কোটি জন্মেও কৃষ্ণকে বুঝিতে পারিবে না।

মায়াবাদিগণ যখন ছলনাবশে ভগবানের নাম কীর্ত্তন বা ভাগবত পাঠের দ্বারা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করে, তখনও তাহারা অপরাধবলে ব্রহ্ম, চৈতন্য, পরমাত্মা বলিলেও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। ভগবদ্গীতায় সর্ব্বত্রই *'শ্রীকৃষ্ণ উবাচ'* বলিয়া কথিত আছে, মায়াবাদিগণ কৃষ্ণনামটি বাদ দিয়া আর সব বলিতে প্রস্তুত আছে। ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা সবই কৃষ্ণের উদ্দেশ্যক হইলেও কৃষ্ণই পরমব্রহ্মের মুখ্যনাম, একথা সমস্ত শাস্ত্রেই স্বীকৃত। অতএব মায়াবাদিগণ যদিও কখন গোবিন্দ, মাধব, কৃষ্ণ, হরি, মুরারি ইত্যাদি বলে, তাহাকে মুখ্যনাম বা অভিন্ন ভগবান্ স্বীকার না করিয়া তাৎকালিক সাধনোপায় মাত্র মনে করে। সেই প্রকার নাম উচ্চারণও যে নামাপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, সে-কথাও তাহারা স্বীকার করে না। নামাপরাধকালে নাম-নামী অভিন্ন না জানিয়া কৃষ্ণের দেহ-দেহী-ভেদ করিয়া আরও অপরাধী হয়।



*অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।*
*পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥* (*গীঃ ৯/১১*)

—এই শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে ডঃ রাধাকৃষ্ণন যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ যথা— (Page 242) "The deluded despise me clad in human body not knowing My higher nature as Lord of all existence." সুতরাং Lord of existence যে ব্যক্তি, তাঁহার clad in human body অর্থে মায়িক চক্ষে বা প্রাকৃত চক্ষে মনুষ্য-মাত্র, কিন্তু তত্ত্ব-চক্ষে বা শাস্ত্র-চক্ষে পরমেশ্বর সর্ব্বকারণ কারণ। যদি deluded বা বিভ্রান্ত লোকেরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে,—ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই দোষে ডঃ রাধাকৃষ্ণন কি দূষিত হন নাই? তিনি Lord of existence-কে সাধারণ জীবের সহিত তুলনা করিয়া কিভাবে অপরাধী হইয়াছেন তাহা তিনি নিজেই অনুভব করুন। এত বড় পণ্ডিত হইয়াও যাহারা deluded হয়, তাহারাই—*'মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ'* ভগবদ্-বিদ্বেষী বা আসুরী-ভাবাপন্ন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ সকলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও ডঃ রাধাকৃষ্ণন যদি কৃষ্ণকে সাধারণ জীব মনে করেন বা অসাধারণ মনুষ্য মনে করেন, তাহা হইলে তিনি বিভ্রান্ত deluded ছাড়া আর কি হইতে পারেন? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অপেক্ষা কাহারও অধিক জ্ঞান নাই। শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞান যাহা বিজ্ঞান-সমন্বিত তাহা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছেই জানিতে হইবে। তিনি কি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরায় শ্রীল জীব গোস্বামীর বিচারধারা আলোচনা করিয়াছেন? আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর "ষট্ সন্দর্ভ" বিশদভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার মত পণ্ডিতগণকেই বুঝাইবার জন্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার

গুরুবর্গের দ্বারা শক্তি-সঞ্চারিত পুরুষ। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। ঐরূপ দার্শনিক পৃথিবীর আর কোথাও নাই বা ছিল না বা হইবে না। আমরা আশা করি, যে-হেতু ডঃ রাধাকৃষ্ণন নিজেই দার্শনিক, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর বাক্য অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ডঃ রাধাকৃষ্ণন শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিতে গিয়া কিভাবে যে perplexed হইয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজ লিখিত গ্রন্থের ভাষায় প্রমাণিত হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভারতবর্ষের এক ঐতিহাসিক অসাধারণ মনুষ্য করিতে চাহেন, কিন্তু ভগবদ্গীতায় সে অবকাশ নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

"In the Gita, Krishna is identified with the Supreme Lord, the unity that he is behind the manifold universes, the changeless truth behind all appearances, transcendent over all and immanent in all. He is the manifested Lord, making it easy for the mortals to know, for those who seek the imperishable Brahman reach Him no doubt, but after great toil. He is called Paramatma."

তাঁহার বিভ্রান্ত হইবার কারণ তিনি এইভাবে লিখিয়াছেন, যথা—

"How can we identify a historical individual with the Supreme God? The representation of an individual as identical with the universal self is familiar to Hindu thought. In the Upanishads, we are informed that the fully awakened soul which apprehends the true relation to the Absolute–sees that it is essentially one with the latter and declares itself to be so." (Essay, page 30)



Essentially one অর্থাৎ জীব ও ভগবানের একত্ব উপলব্ধিই শেষ কথা নহে। অবশ্য শঙ্করাচার্য্য এই পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিবার জন্যই আসুরিক ভাবাপন্ন লোকসকলকে এরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরে সেই চেতনের রাজ্য *চেতনশ্চেতনানাম্* দর্শন আছে। চেতন-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ণ চেতনের যে দর্শন, তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত চেতনাভিজ্ঞান অপূর্ণ, অসম্যক্ এবং অবিশুদ্ধ বুদ্ধির পরিণাম। সেই প্রকার অপূর্ণ খণ্ড-চেতনের জ্ঞানদ্বারা পুনরায় জড়াভিজ্ঞানের বৈচিত্র্যেই অধঃপতিত হইয়া বড় বড় দার্শনিকগণ 'জগৎ মিথ্যা'র প্রলোভনে দার্শনিক পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া রাজনৈতিক-বীর, কর্ম্মজড়-বীর, ধর্ম্ম-অর্থ-কামপরায়ণ-বীর ইত্যাকার বহু সজ্জায় সজ্জিত হন।

ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সেই পূর্ণ-চেতনের সহিত পরিচয় নাই বলিয়া সেই পূর্ণ-চেতন কৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া deluded হইতেছেন। ভারতীয় দার্শনিকের যেমন ভগবানের সহিত একত্ব বিচার আছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পৃথকত্ব বিচারও আছে। একই বস্তু সমকালেই একত্ব ও পৃথকত্ব বিচারে প্রতিষ্ঠিত এবং সেই বিচারই বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত অথবা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব নামে বিবৃত হইয়াছে। যদি সে বিচার প্রবল না হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণকে সমস্ত ভারতবাসী ঘরে ঘরে পূজা করিতেন না। তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া কোথাও পূজিত হন না; পরন্তু ভগবান্ বলিয়াই পূজিত হন; এবং সেই ভগবত্তার মধ্যস্থ প্রামাণিক-গ্রন্থ গায়ত্রী ও বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবতম্*। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের অপেক্ষা বহু বড় বড় দার্শনিক এবং মায়াবাদীর আক্রমণ সত্ত্বেও ভারতের সর্ব্বত্র কোটি কোটি কৃষ্ণ-মন্দির যুগযুগান্তর হইতে এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া কৃষ্ণকে মনুষ্য-বুদ্ধিকারিগণকে ধিক্কার দিতেছে এবং ভবিষ্যতেও সমস্ত জগতের লোক সেইভাবে ধিক্কার দিবেন। সমস্ত বিষ্ণুমন্দিরই আচার্য্যগণের অনুমোদিত, সুতরাং ডঃ রাধাকৃষ্ণনের

খাতিরে ভারতবাসিগণ পাশ্চাত্য দার্শনিক বিচারের সহিত কখনও Compromise বা মিটমাট করিতে পারেন না।

ভারতের ঐতিহাসিক ব্যোমে অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক তারার উদয় হইয়াছে। সেই সকল বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র রাম ও কৃষ্ণকে ভারতীয়গণ কেন ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহার নিরপেক্ষ বিচার করিবার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণকে ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ অপেক্ষা অধিক বলবান বলিয়া মনে করি। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া ব্রজলোক-নিবাসী, স্বর্গলোক-নিবাসিগণও মুহ্যমান হন। সুতরাং মর্ত্ত্যলোকনিবাসী ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ বা তাঁহার মত অনেক লোকই মুহ্যমান্ হইবেন—একথা ত' শ্রীমদ্ভাগবতই *মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ* মন্ত্রেই স্বীকার করিতেছেন। চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত 'ভূলোক' ত' সপ্তম শ্রেণীর নগণ্য বিভূতিসম্পন্ন একটি বসুধা মাত্র।

পরন্তু এই নগণ্য বসুধার মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান; কারণ ভারতবর্ষের মনীষিগণই পূর্ব্বকাল হইতে পারমার্থিক বিচার সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্বকালে তাঁহারা অন্যান্য উত্তম বিভূতিসম্পন্ন বসুধাগুলির সহিতও যোগাযোগ রাখিতে সমর্থ ছিলেন। বলা যায় না, হয় ত' ভবিষ্যতে Sputnik বিক্ষেপাদির দ্বারা আবার যোগাযোগ হওয়া সম্ভব হইবে। কিন্তু আমাদের ভারতে এমনই দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের কথা শুনিতে রাজী নহি। শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিব, কিন্তু তাঁহার কথাগুলি যাহাতে স্বীকার করা না হয়, তাহার জন্য কৌশলে বহু বাক্যজালের বিস্তার করিব। ইহাই ভারতের দুর্ভাগ্যের পরিচয়। প্রকৃত ভগবানকে উড়াইয়া দিয়া 'নকল' ভগবানের উৎপাত বিস্তার করিবার জন্য ভারত এখন উদ্বাস্তু হইয়া পড়িয়াছে—ইহাই ভারতের দুর্ভাগ্যের পরিচয়।

# কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং

পরাৎপরতত্ত্ব যিনি, তিনি যে নিরাকার নির্ব্বিশেষ নন, একথা জননেতাগণের মস্তিষ্কের মধ্যে কিছুতেই স্থান পায় না। শাস্ত্রে আমরা বিরাট্ বিরাট্ বিলাস-মূর্ত্তির পরিচয় পাই, যেমন কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু মূর্ত্তিমান্। কিন্তু সেই কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুরও আদি-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ — একথা বাস্তবিক তাঁহাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে স্থান পাওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু কৃষ্ণ-কৃপা হইলে এই হৃদয়-কাঠিন্য বা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য অনায়াসেই দূরীভূত হয়। এবং তিনিই যে দ্বিভুজ মুরলীধর হইয়া মথুরায় আবির্ভূত হইয়াছেন—বুঝিতে পারা যায়।

কৃষ্ণ-কৃপা লাভ না করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণকে বুঝিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মত পণ্ডিত হইলেও নিশ্চয়ই মতিভ্রমে পতিত হইবেন। তিনি *বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ* কেবল পণ্ডিত হইলেই কৃষ্ণকে বুঝা যাইবে না। শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও তাঁহার পাণ্ডিত্য-লীলার দ্বারা এ কথার প্রমাণ বুঝাইয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে নামজাদা গ্রাম্য-কাহিনী-লেখক বঙ্কিমবাবু বা ডঃ ভাণ্ডারকার প্রভৃতিও মুহ্যমান হইয়াছেন। কৃষ্ণকে বুঝিতে হইলে ভগবদ্গীতা যেমন রাস্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ* সেই রাস্তায় জানিতে হইবে, অন্য রাস্তায় নহে। অথবা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই আবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুরূপে আসিয়া যে-ভাবে কৃষ্ণকথা বুঝাইয়াছেন, সেইভাবেই কৃষ্ণকে বুঝা যাইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরাসূত্রে ষড়গোস্বামিগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বৃন্দাবনে বসিয়া বিরাট্ আলোচনা করিয়াছেন। সে-সব কথা এখনও জগতে ঠিক ঠিক প্রচার হয় নাই।

ইহা প্রচার না হওয়ার কারণ, তাঁহাদের বিচার-পদ্ধতি দার্শনিকগণের নয়ন-গোচর হয় নাই এবং তজ্জন্য আমরাই যে দায়ী, একথা স্বীকার করি। শ্রীল রূপ-রঘুনাথের কথা জগতে প্রচার করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে বিরাট্ রূপ দেখাইয়াছিলেন, সেই 'রূপ' ভগবানের পরমভাব নহে। পরন্তু, দ্বিভুজ-মুরলীধর নরাকারই তাঁহার পরমভাব। তাঁহার আনন্দঘন সচ্চিদানন্দ রূপ নরাকার বলিয়া তিনি সাধারণ নর বা মনুষ্য নহেন। এবং তিনি কোন ঐতিহাসিক অতিমনুষ্যও নহেন। মানুষের যে 'রূপ' বা 'আকার', তাহা ভগবানের স্বরূপের নকল হইতে পারে; তাই বলিয়া, মানুষ ভগবান্ নহে বা ভগবান্ মানুষ নহেন। 'বাইবেল' আদি গ্রন্থেও লেখা আছে যে, মানুষকে ভগবানের মত 'রূপ' করিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। তাই বলিয়া ভগবান্ মানুষ নহেন। অতএব এই সকল তত্ত্ব যাঁহারা যথাযথ বুঝিতে পারেন তাঁহারা জড়শরীর পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের কাছেই চলিয়া যান—একথা আমরা ভগবদ্গীতাতেই প্রমাণ পাই। অর্থাৎ তাঁহার পরমভাব যাঁহারা বুঝেন তাঁহারাই অমৃতত্ব প্রাপ্তির অধিকারী হন। সেই প্রকার অধিকারের অধিকারী জীবমাত্রই হইতে পারে—যদি সে ইচ্ছা করে। সেই অধিকার প্রাপ্ত হইলেই পরম-সিদ্ধিলাভ হয়। এই পরম-সিদ্ধিলাভ হইলে আর জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির অস্থায়ী-জগতে ফিরিয়া আসিতে হয় না। সুতরাং সেই ভাবের 'প্ল্যান্' করিয়া যাঁহারা জীবনাতিপাত করেন, তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা সাধন করিয়া থাকেন, "আর সব মরে অকারণ"।

এই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির স্থানকে অজর অমর করিবার যে প্ল্যান—তাহারই নাম মায়া। জড়জগতে সুখে থাকিবার প্ল্যান করাই একটা মহা ধাপ্পাবাজী। যে প্ল্যানের (plan) দ্বারা ভবিষ্যতে শূকর,



কুকুর প্রভৃতি যোনিতে জন্ম হইবার ব্যবস্থা হয়, সেই প্ল্যান (plan) বেশি কার্য্যকরী, না যে প্ল্যানের দ্বারা "Back to Godhead" যাওয়া যায়, সে প্ল্যানটা (plan) ভাল? ভগবানের সঙ্গে থাকিয়া দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি বিভিন্ন রসে যে আমাদের সেবার অস্তিত্ব আছে সেই লীলাই প্রকট করিয়া আমাদের আকর্ষণ করিবার জন্য, *"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"*—মন্ত্র শিখাইবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু দয়া করিয়া আসিয়াছিলেন—একথা যাহারা বুঝিল না বা বুঝিবার চেষ্টা করিল না, তাহাদের মত আর 'বঞ্চিত' কে আছে? "সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার।"

ভগবানের এরূপভাবে অবতরণ সম্বন্ধে ডঃ রাধাকৃষ্ণন অনভিজ্ঞতা বশে এইভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—"An avatar is a descent of God into man and not an ascent of a man into God" অর্থাৎ অবতার অর্থে ভগবান মানুষের রূপ ধারণ করিয়া আসেন; কিন্তু মানুষ কখনও ভগবান নহে। মানুষের রূপধারণ করিয়া আসেন—একথার তাৎপর্য্য এই যে, অবতারগণের শরীর সব পঞ্চভৌতিক। 'মানুষ ভগবান্ হইতে পারেন না।' একথা তিনি কি ভাবে বলিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। তবে আজকাল মানুষকে ভগবান্ সাজান একটা সহজ ও সাধারণ ব্যাপার হইয়াছে। শুধু অবতার কেন, সব মানুষই যে ভগবান্ একথাও চলিতেছে। কিন্তু আমরা উপস্থিত সে-সব কথার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া ডঃ রাধাকৃষ্ণনকে বলিতে ইচ্ছা করি যে, জীবতত্ত্বে যখন ভগবান শক্তি সঞ্চার করিয়া নিজকার্য্য সাধন করেন তখন তাহা শক্ত্যাবেশ অবতার বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু এই প্রকার শক্ত্যাবেশ অবতারই শেষ কথা নহে। ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। 'স্বয়ংরূপ',

# মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বাংশ বৈভবের দ্বারা বিষ্ণুতত্ত্ব বা অনন্ত কোটি বিষ্ণু-অবতার প্রকট করেন এবং বিভিন্নাংশ দ্বারা অনন্ত কোটি জীবতত্ত্ব প্রকট করেন। বিষ্ণুতত্ত্ব সকলেই ভগবান্, কিন্তু জীবতত্ত্ব ভগবান্ নহে, ভগবানের তটস্থাশক্তি তত্ত্ব। জীবতত্ত্ব সনাতন ও পরাশক্তি তত্ত্ব। অর্থাৎ জীবকোটি নিত্যকালই ভগবানের শক্তিতত্ত্ব আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন, কিন্তু কোনও সময়ই ভগবৎ-তত্ত্ব বলিয়া বা বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া মান্য হইবেন না—ইহা শ্রীভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত। এই বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব বিষ্ণুতত্ত্বের ক্ষুদ্রাংশ অণুচৈতন্য মাত্র—যেমন বৃহৎ অগ্নির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসমূহ। অংশ কোন দিনই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না অথবা অংশ কোনদিনই পূর্ণের সমতা লাভ করিতে পারে না। অংশ ও পূর্ণকে এক করিয়া মানা মায়াবাদীর একটি দুষ্ট-মত মাত্র—ইহাই ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত। অংশ জীবের বদ্ধদশা ঘুচিয়া গেলে ভগবানে উপাদেয়ভাবে প্রবেশ করে। অর্থাৎ ভগবানের আনন্দ-চিন্ময়-রসরূপ নিত্যলীলায় প্রবেশ করতঃ ভক্তগণ নিত্যযুক্ত উপাসনায় নিযুক্ত থাকিয়া ভগবানের চিদ্ ঐশ্বর্য্যের বা মাধুর্য্যের সহযোগী হইয়া নিত্যকালই সেবাসুখ অনুভব করেন। এই সেবাসুখ আনন্দের তুলনায় মিথ্যা সাযুজ্য মুক্তি ব্রহ্মানন্দ সমুদ্রের সহিত গোষ্পদের তুলনা বিশেষ—ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। জ্ঞানিগণের কল্পিত সাযুজ্য মুক্তি অসম্ভব বিধায় ভক্তগণ কোনদিনই উহা প্রার্থনা করেন না। তাহাদের ঐ সাযুজ্য মুক্তির অর্থ—জীবের ক্ষুদ্র চেতনতা বৈচিত্র্য নষ্ট করিয়া দেওয়া বা spiritual suicide করা। ডঃ রাধাকৃষ্ণন বাইবেল সম্বন্ধে যে বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—





"The doctrine of the incarnation agitated the Christian world a great deal. Arioes maintained that the son is not the equal of the Father but created by Him. The view that they are not distinct but only different aspects of one Being is the Theory of Sabellues. The former emphasised the difference of the Father and the Son and the latter then in oneness. The view that finally provided was that the father and the son were equal and of the same substance. They were however distinct persons."

—এই কথার সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচার অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত আছে বলিয়া আমরা ইহা স্বীকার করি। Son of God যীশু প্রভু ভগবানের বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব হইলেও substantially অর্থাৎ বস্তু-তত্ত্ব-বিচারে 'চিৎ' অর্থাৎ একই বস্তু; কিন্তু পিতা ও পুত্রের তুলনায় জীবতত্ত্ব ভগবৎ-তত্ত্বের সহিত কখনও এক নহে। ভগবান্ এবং জীবসমূহ সকলেই পৃথক পৃথক ব্যক্তি—এ বিচার আমরা স্বীকার করি। যেমন জীব-তত্ত্বের ব্যক্তিত্ব আছে, সেই ভাবেই অত্যন্ত উপাদেয়ভাবে ভগবানেরও পূর্ণ ব্যক্তিত্ব আছে। তাঁহাকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ বলিলে পূর্ণতার হানি করা হয় মাত্র। ব্রহ্ম-সংহিতায় ভগবানের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব এইভাবে বিঘোষিত হইতেছে; যথা—

*রামাদি-মূর্ত্তিষু কলা-নিয়মেন তিষ্ঠন্*
*নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।*
*কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥*

রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি অনন্তকোটি বিষ্ণুতত্ত্ব সকলেই ভগবান্, কিন্তু তাঁহারা সকলেই কেহ কেহ অংশ, বা অংশের অংশ, কলাভাবে

নিত্যকালই বর্ত্তমান আছেন। এই সকল ভগবানে তত্ত্বের পূর্ণত্ব বজায় আছে। তাঁহারা কাহারও খেয়ালের অধীন নহেন; নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার বলিলে তাঁহারা তাহা হইবেন না। তাঁহারা নিত্যকালই আছেন এবং সেই নিত্যস্বরূপেই সময় হইলে সূর্য্যের মত উদিত হন বা অস্তমিত হন। যখন উদিত থাকেন, তখন 'প্রকট লীলা' আর যখন অনুদিত থাকেন বা আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত থাকেন তখন 'অপ্রকট লীলা'। তিনি ছিলেন না, কিন্তু ভক্তের খেয়ালমত হাজির হইলেন বা শরীর ধারণ করিলেন—একথা '*অবুদ্ধয়ঃ*' অর্থাৎ অজ্ঞগণই বলিয়া থাকেন, ইহাই ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মসংহিতার উক্ত শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পরমপুরুষ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অর্থাৎ গোবিন্দই আদি পুরুষ, অন্যান্য বিষ্ণুতত্ত্বসমূহ তাঁহার অংশ এবং কলা। কিন্তু ভগবদ্ বিগ্রহগণ কেহই জীবকোটির অন্তর্গত নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই সিদ্ধান্ত মান্য করিয়া ব্যাসদেব '*এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*'—এই বিচার স্থির করিয়াছেন। '*কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ*' অর্থে অবতারগণ ত' আসেনই, পরন্তু স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণও অবতারী ও অবতারের মত আসেন। এ সকল কথা ভগবদ্ভক্তগণই বুঝিতে সক্ষম। ইহা বিদ্যা বা টীকা-টিপ্পনীর দ্বারা বুঝা যায় না।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মনুষ্য বা অতি-মনুষ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ পরাৎপর তত্ত্ব, অদ্বয়-জ্ঞান, পূর্ণতত্ত্ব। তিনি নিরাকার নির্ব্বিশেষ আদৌ নহেন। কিন্তু তিনি অপ্রাকৃত আদিপুরুষ সচ্চিদানন্দ নিত্য বিগ্রহ।

তিনি যে আদিপুরুষ পরমব্রহ্ম নিত্য—শাশ্বত-বিগ্রহ, একথা ত' ভগবদ্ গীতাতেই অর্জ্জুন দ্বারা স্বীকৃত আছে। শ্রীকৃষ্ণের উপাদেয় ব্যক্তিত্ব দেবতাগণও বুঝিতে সক্ষম নহেন; ডঃ রাধাকৃষ্ণন তাহা কিরূপে বুঝিবেন? 'আদিপুরুষ' অর্থে তিনি সকল পুরুষাবতারের অবতারী।



বেদে যে পুরুষসূক্ত গ্রথিত আছে, তাহা কারণোদকশায়ী পুরুষাবতারগণ সম্বন্ধে কথিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষাবতারেরও আদিপুরুষ অর্থাৎ পুরুষাবতারগণও তাঁহার অংশ কলাবিশেষ; ব্রহ্ম সংহিতায় নির্দ্দিষ্টভাবেই বলা হইয়াছে। অতএব ডঃ রাধাকৃষ্ণন যে তত্ত্বকে eternal, beginningless বলিয়া মান্য করিয়াছেন, সেই eternal তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ, তিনি তাহা ধরিতে পারেন নাই।

তাঁহার এই আদিপুরুষত্ব অর্জ্জুন ত' স্বীকার করিয়াছেনই, কিন্তু পূর্ব্বে অন্যান্য প্রখ্যাত মুনি-ঋষিগণও যথা—ব্যাসদেব, নারদ, দেবল, অসিত আদি সকলেই একবাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আদিপুরুষ পরমব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমস্ত মহাজনগণ, আচার্য্যগণ, ঋষিগণ এবং আজও পৃথিবীর অনন্ত কোটি মনুষ্যগণ একবাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'ভগবান্' স্বীকার করা সত্ত্বেও ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মত একজন বিখ্যাত পণ্ডিত কেন তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন—এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন শ্রীপাদ আলবন্দারু যামুনাচার্য্য প্রভু। তিনি "স্তোত্ররত্নে" লিখিয়াছেন—

*ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ*
*সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।*
*প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থবিদাং মতৈশ্চ*
*নৈবাসুর-প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥*

"হে ভগবান্, তোমার অবতারতত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ঋষিগণ প্রবল সাত্ত্বিকশাস্ত্র দ্বারা তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরমসাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারে, কিন্তু রাজস-তামস-গুণবিশিষ্ট অসুর-প্রকৃতির জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।" বড় বড় পণ্ডিতগণ এইরূপ ভুল করেন বলিয়াই ভগবান্ গীতাশাস্ত্রেই (৪র্থ অধ্যায়) গীতা পাঠ করিবার বা গীতা জানিবার জন্য পরম্পরা বিচার

করিয়াছেন। পরম্পরা স্বীকার না করিয়া যাঁহারা নিজ স্বকপোল-কল্পিত অর্থ করেন তাঁহাদের বিফল পরিশ্রম দেখিয়া আমরা এককালীন দুঃখ এবং হাস্য দুইই করিয়া থাকি। উক্ত চতুর্থ-অধ্যায় হইতে আমরা স্পষ্টই জানিতে পারি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই পরম্পরা পুনরুদ্ধার করিবার জন্যই কুরুক্ষেত্রে কোটি কোটি বৎসর পরে আবার গীতার কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগের কথা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছিলেন। ভগবদ্গীতা কোন নতুন পদ্ধতির দার্শনিক বিচার নহে। ভগবান্ যেমন নিত্যকালই আদি-পুরুষরূপে বর্ত্তমান, সেই ভাবেই ভগবদ্গীতাও নিত্যকালই ভগবদ্বাণীরূপ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। ভগবান্ যেমন নিত্যকালই নব-যৌবনসম্পন্ন সেই প্রকার তাঁহার অমৃতবাণীও নিত্য নবায়মান চির-নূতনত্বে পরিপূর্ণ। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা সেইভাবে ভগবদ্গীতার নূতন অর্থ বাহির করিতে পারেন। তদ্দ্বারা নিজের জড়বিদ্যার চাতুর্য্য দেখাতেই পারেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সকল মায়ার বৈভব মাত্র। ভগবদ্গীতার প্রকৃত অর্থ তাহার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। ভগবদ্গীতার অর্থ একমাত্র ভগবানের পারম্পর্য্য দ্বারাই সাধিত হয়। ভগবদ্গীতার মুখ্য অর্থই সাত্বত সম্প্রদায় স্বীকার করেন, গৌণ অর্থ বাক্চাতুর্য্য বিস্তারকারিগণেরই আদরণীয়।

বাক্চাতুর্য্য বিস্তারকারী পরম্পরাশূন্য বিপথগামী ব্যক্তিগণের ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমরা সংক্ষেপে পারম্পর্য্যসূত্রে ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য নিম্নে দিবার চেষ্টা করিলাম। যথা—

১। পরম-তত্ত্ববস্তু সর্ব্বকারণের কারণ ভগবত্তত্ত্বই *'জন্মাদ্যস্য যতঃ'* সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনিই অনন্ত বৈচিত্র্যময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, বৈকুণ্ঠাদির মূলকেন্দ্র। এবং তিনি শাশ্বত পুরুষ, অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম, সবিশেষ তত্ত্ব। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহার অঙ্গজ্যোতি বা প্রভামাত্র, এবং তিনি অদ্বয়জ্ঞান। পরমাত্মা তাঁহার অংশবৈভব এবং অনন্তজীব ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী পুরুষ।



২। জীবগণ তাঁহার অনন্ত চিৎ-কণাংশ বিশেষ। সেই জীব চিদংশে এক হইলেও অংশ ও অংশী বিচারে নিত্যকালই ভেদ বর্ত্তমান। তজ্জন্য তাহারা ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—তটস্থাশক্তি।

৩। এই তটস্থাশক্তি জীবকোটির বৈকুণ্ঠাদিধামে অথবা মায়িক জড়-বৈভব অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে বাস-যোগ্যতা নিত্যকালই আছে। অনাদি কর্ম্মফলে সেই জীব ভবার্ণব-জলে নিপতিত হয় এবং বিজাতীয় রাজ্যে আব্রহ্ম-ভুবনাদি ভ্রমণ করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ ত্রিতাপ-যন্ত্রণায় অভিভূত হয়।

৪। জড়বৈভবরূপা প্রকৃতিতেই বদ্ধজীবগণ আবদ্ধ আছে। সেই প্রকৃতির ধর্ম্ম—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। সৃষ্টি-স্থিতিতে সেই প্রকৃতি ব্যক্ত হয়, আর প্রলয়ে অব্যক্ত হয়। অতএব এই মায়িক-বৈভব ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে ভগবানের অপরা প্রকৃতি।

৫। এই অপরা প্রকৃতির ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বভাবের অতীত আর একটি যে পরাপ্রকৃতি বৈভব আছে, তাহাই 'পরব্যোম' অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠাদির নিত্য সনাতন ধাম। তাহা নিত্যকালই ব্যক্ত; সেখানে অব্যক্ত ভাব নাই অর্থাৎ সেখানে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদির কার্য্য নাই।

৬। যে সকল নিত্যবদ্ধ জীবগণ এই অপরা প্রকৃতির সন্তান বলিয়া অভিমান করেন, পুরুষের খবর রাখেন না, তাঁহারাই দৈবীমায়া মহাকালী, চণ্ডিকা বা দুর্গাদেবীর ত্রিশূলের অধীন তত্ত্ব। এই সকল ত্রিশূলতাপে জর্জ্জরিত জীব বা অসুরগণ মহামায়ার অন্ধকারে বা কালী মূর্ত্তিতে বিমোহিত। তাহাদের উদ্ধার করিবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যা-বেদাদি শাস্ত্রের নিষ্কর্ষ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মানব সযত্নে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রথমতঃ পাঠ করিয়া বিষ্ণুপাদপদ্মে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া পরম মুক্তিলাভ করে এবং আব্রহ্ম ভুবনের ভয় শোক পদ হইতে নিবৃত্ত হয়।

৭। বদ্ধজীবের জন্ম-মৃত্যু জরা-রোগাদি ত্রিতাপ যন্ত্রণাই ভবরোগ বলিয়া বিখ্যাত। এই রোগে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া রোগের নিরাকরণের জন্য অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বা ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তির জন্য তপস্যা করে। তাহা

হইতে উচ্চস্তরস্থিত ভগবদ্ভক্তগণ সনাতনত্ব উপলব্ধি করিয়া সনাতনত্বের নির্ব্বাণ না করিয়া নিত্য সনাতন-ধামে প্রবেশ-অধিকার লাভ করিবার জন্য সনাতন ধর্ম্মের-আচরণ ও প্রচার করেন। জীবমাত্রই সনাতন, অতএব সনাতন-ধর্ম্মে সকল জীবের স্বগত অধিকার আছে।

৮। মহৎ তত্ত্ব বা অপরা প্রকৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে ব্যক্ত হয়, যাহার নাম (১) অব্যক্ত (২) আকাশ (৩) বায়ু (৪) অগ্নি (৫) জল (৬) মাটি (৭) মন (৮) বুদ্ধি (৯) অহঙ্কার (১০) রূপ (১১) রস (১২) শব্দ (১৩) গন্ধ (১৪) স্পর্শ (১৫) চক্ষু (১৬) কর্ণ (১৭) নাসিকা (১৮) জিহ্বা (১৯) বাক্ (২০) পাণি (২১) পাদ (২২) পায়ু (২৩) উদর (২৪) উপস্থ ইত্যাদি।

৯। অদ্বয়জ্ঞান আদিপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার একদিনে অর্থাৎ ২০০০×৪৩০০০০০ সৌর বর্ষান্তরে একবার অবতরণ করেন তাঁহার ভক্ত ও অভক্ত উভয়কেই কৃপা করিবার জন্য। ভক্তগণকে দর্শন দিয়া তাঁহাদের রক্ষা করেন আর অভক্তগণকে বিনাশ করিয়া 'ক্লেশজ মুক্তিপদ' দান করেন। ভগবদ্গীতা সেবারূপ মুক্তিদাতা অদ্বয়জ্ঞান ভগবত্তত্ত্ব এবং তাহা উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায় পারম্পর্য্যসূত্রে আচার্য্য উপাসনা। যাহারা আচার্য্য উপাসনা না করিয়া বৃথা পরিশ্রম করে, তাহাদের সকলই পণ্ডশ্রম হয়।

১০। সেই আচার্য্য-ত্যক্ত মূর্খগণ অথবা মূঢ়ব্যক্তিগণই পাণ্ডিত্যের সজ্জায় ভগবান্‌কে মানুষ আর মানুষকে ভগবান্ সাজায়।

১১। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান কোন দেশ বা জাতি বিশেষের প্রাকৃত পৈতৃক সম্পত্তি নহেন। তিনি সকল কুলেই বর্তমান, সকল জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, পরমপিতা। তিনি সকলকেই উদ্ধার করিতে আসেন, অতএব তাঁহার বাণী ভগবদ্গীতা সকল দেশে সকল সময়েই জগতের সকলের জন্য প্রচার্য্য বিষয়। এই কার্য্য যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা ভগবানের অতি প্রিয় আর কেহ নাই।

১২। আসুরী ভাবসম্পন্ন মূর্খ জনগণ প্রকৃতির মোহিনী শক্তিতে আবদ্ধ হইয়া বৃথা আস্ফালন করিয়া অনেক 'প্ল্যান' করিতেছে। তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া চেতন বাণী শুনাইবার একমাত্র মন্ত্রশক্তি ভগবদ্গীতা।



১৩। এই সকল মূর্খ ব্যক্তিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারের দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, তাহাদের 'প্ল্যান' নিত্যকালই ধ্বংস হইতে থাকিবে; কারণ যে-ভূমিকায় তাহারা 'সুখের লাগিয়া' ঘর বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে সেই ভূমিকাই মায়ামরীচিকা—বায়স্কোপের ছায়াচিত্র। আসল চিত্র বা কার্য্যক্রম ছায়াচিত্র নহে, তাহা অন্যত্র। সেইখানে ফিরিয়া যাইবার জন্য যে লেখনী পরিচালিত হয়, তাহার নাম "Back to Godhead."

১৪। অতএব বাস্তবিক সভ্যতার পরিচয় তখনই হইবে যখন আমরা "Back to Godhead" প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া ভগবানের কাছে আমাদের নিত্য গৃহে ফিরিয়া যাইয়া সকল পরিশ্রমের পরিসমাপ্তি ঘটাইব।

১৫। মায়িক জগতে মহাপাপিগণ যেমন জড় শরীর প্রাপ্ত না হইয়া সূক্ষ্ম শরীরে ভূত-প্রেত যোনিতে অন্তরীক্ষে অবস্থান করে, সেই প্রকার পরব্যোমের চিদাকাশে নিরাকারবাদী ভগবানের সেবায় বঞ্চিত হইয়া মুক্তপ্রায় হইয়াও বা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াও আবার মায়িক জগতে পতিত হয়। অতএব নিরাকার নির্ব্বিশেষবাদীর ক্লেশ-সাধনা সনাতনধর্ম্ম নহে।

১৬। অব্যক্তাসক্তচিত্ত নিরাকার বা নির্ব্বিশেষবাদিগণ ভগবানের দেহ-দেহী ভেদকরণরূপ অপরাধের জন্য অবিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জন্ম-জন্মান্তর পর্য্যন্ত সনাতন ধাম হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে যদি শুদ্ধচিত্তে ভগবানের আনন্দ-চিন্ময়-রসের নাম-লীলা শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহারাও ভগবানের অপ্রাকৃত গুণে মুগ্ধ হইয়া ভগবদ্-ভক্ত হইয়া যায়। এই চিন্ময় লীলায় প্রবেশ করিবার জন্য যে প্রাথমিক শরণাগতির আবশ্যকতা আছে, তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য ভগবদ্গীতা ভক্তি-রাজ্যের প্রবেশিকা গ্রন্থ। শুদ্ধভক্তগণ সেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—এরূপ বুঝিতে হইবে। ওঁ তৎ সৎ ওঁ

বুদ্ধিযোগ

*যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।*
*আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥*
(ভাঃ ১০/২/৩২)

অস্যার্থ—

"হে পদ্মপলাশ-লোচন ভগবান্! যাঁহারা আপনার পাদপদ্মের অনুসন্ধান না পাইয়া নিজেকে মুক্ত অভিমান করিয়া বর্ত্তমান থাকেন তাঁহাদের বুদ্ধি কদাচিৎ শুদ্ধ নহে। তাঁহারা বহু তপস্যা দ্বারা এমন কি ব্রহ্মপদ পর্য্যন্ত উঠিয়াও আপনার পাদপদ্মের অনাদর-জনিত পুনরায় স্খলিত হইয়া অধোগতি লাভ করেন।" সুতরাং শ্রীভগবানের অনুগত ভৃত্যগণ যে যোগারহিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন তাহা পাতঞ্জলি ঋষির অষ্টসিদ্ধি ভুক্তিযোগ নহে বা প্রাথমিক ইন্দ্রিয়সংযমকারী আসন ধ্যান প্রাণায়াম পদ্ধতি নহে। পরন্তু তাহা গীতোপদিষ্ট শ্রেষ্ঠযোগ ভগবদুপলব্ধি। তাঁহার যোগক্রিয়া নিজের কোন ইষ্টলাভের জন্য নহে পরন্তু জগতে ভগবানেরই ইচ্ছাপূর্ত্তির অন্যতম উপায়। সেই বুদ্ধিযোগেই সমস্ত জগতের পরম মঙ্গল নিহিত আছে।

ভগবদ্গীতায়—

*তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ ।*
*কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥*
*যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।*
*শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥*
(গীঃ ৬/৪৬-৪৭)

কর্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী ইত্যাদি সকলের অপেক্ষা যোগীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সকল যোগিগণের মধ্যে যে যোগী অন্তরাত্মা দ্বারা সর্ব্বদাই



দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত ভগবদ্ ইচ্ছা পূর্ত্তির জন্য ভজনশীল তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী। উপরন্তু ভগবদ্বাক্যানুসারে শ্রীভগবদ্ভক্তগণ কর্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী এবং অন্যান্য যোগিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী। কারণ তাঁহার যোগ-পদ্ধতির একমাত্র উদ্দেশ্য যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত হউক। ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য হইলেই জগতে অধোক্ষজ ভাবের অবতারণা হইবে এবং তাহা সম্পাদিত হইলেই ইহজগতের সকল ব্যাপারেই ভগবদ্ভাব দেখা যাইবে। তাঁহার যোগের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র মুক্তি বা ভক্তি কামনা নহে, পরন্তু ভক্তি। তিনি জানেন ব্রহ্মভূত মুক্ত অবস্থা না হইলে পরাভক্তি লাভ হয় না, সুতরাং পরাভক্তিলাভ হইলে আনুষঙ্গিক ভাবেই মুক্তিলাভ হইয়া যায়। সেই প্রকার ভগবদ্ভাবের অবস্থা লাভ হইলেই বিশ্ব পরিপূর্ণ সুখময় হইয়া যাইবে, অতএব ক্ষুদ্র নিজসুখ বা আনন্দের কথা কি আছে?

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন যে, "জীবের স্বরূপ হয় নিত্যকৃষ্ণদাস" সুতরাং জীব মাত্রেই স্বরূপতঃ মুক্ত। তাঁহার বদ্ধদশা ভগবদ্ বিস্মৃতিজনিত কল্পিত মাত্র। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, জীব মাত্রেই তাঁহার বিভিন্নাংশ। বদ্ধজীবগণ মায়া-প্রদত্ত মন ও পঞ্চ প্রকার ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। অনাদি কর্ম্মফলে জীবের বদ্ধদশা উপস্থিত হইলেও সেই প্রকার বদ্ধদশায় জীব চিরদিন কেন থাকিবে? ভগবৎ কৃপা হইলেই জীবের বদ্ধদশা এক মুহূর্ত্তেই নষ্ট হইয়া যাইবে। আর তাঁহার ইচ্ছা না হইলে জীব নিজ ইচ্ছায় কোন দিনই বদ্ধদশা হইতে মুক্তি পাইতে পারে না। মুক্তাভিমানী ভগবৎ কৃপাকে বাদ দিয়া যে মুক্তির জন্য কঠোর তপস্যা করেন তাহা কোনদিনই জীবকে স্বাধীন করিয়া দিতে পারিবে না। সুতরাং ভগবৎ কৃপা লাভ করাই সকল প্রকার মুক্তির কারণ—যদিও ভগবান্ কাহারও কর্ম্ম বা কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মফল সংযোগ করিয়া দেন না। যথা ভগবদ্গীতায়—

*ন কর্ত্তৃত্বং না কর্ম্মানি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।*
*ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥*

তথাপিও ব্যতিরেকভাবে তাঁহারই আওতায় জীবের বদ্ধদশাযুক্ত মায়িক ভোগ সুখ-দুঃখ, শীতোষ্ণ, পাপপুণ্য ইত্যাদি অনুভব হইয়া থাকে। এইভাবে যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া জীবের কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া যাইতেছে। ব্যতিরেকভাবে যখন সে সমস্তই ভগবদ্ ইচ্ছায় সম্পাদিত হইতেছে, তখন দুঃখ করিবার কিছুই নাই। তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলে সে সমস্তই মুক্তি হইয়া যায়। অতএব ভগবৎ পরায়ণ ব্যক্তিগণ কোনদিনই সেই সকল সুখ দুঃখ গ্রহণ করেন না বা তদ্দ্বারা বিচলিত হন না। যাঁহারা ভগবৎ বিশ্বাসী বুদ্ধিমানব্যক্তি তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করেন, যথা—হে ভগবান্! আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মবিপাকজনিত যে সামান্য দুঃখ পাইতেছি তাহাও আপনার কৃপা। কারণ আপনার আজ্ঞা হইলে সহজেই এই সকল দুঃখ বিলাপের অবসান হইয়া কার্য্যকলাপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। যথা—

*তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।*
*হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥*
*(ভাঃ ১০/১৪/৮)*

শ্রীভগবানের ভক্তবৃন্দ প্রনিহিত অমলচিত্তে ভক্তিযোগ দ্বারা অবগত হইয়াছেন, সেইপ্রকার যুগপরিবর্ত্তনের জন্য ভগবানের আজ্ঞা আসন্ন হইয়াছে, স্বতন্ত্রলীলা পুরুষোত্তম ভগবান্ তাঁহার ভৌমলীলার জন্য যে নির্দ্দিষ্ট প্রবেশ পৃথিবীতে স্থির রাখেন তাহাই আমাদের ভারতবর্ষ। সুতরাং ভারতবাসিগণ সেই ভগবদাজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

*ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার ।*
*জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার ॥*



বাস্তবিকই মনুষ্যজাতির পরোপকার করিবার জন্য ভারতবাসীই একমাত্র যোগ্য। ভারতবাসিগণ যদি সেই যোগ্যতার পরিচয় না দিয়া মায়া-মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া কেবলমাত্র পাশ্চাত্য-জড়ভোগময় চাক্‌চিক্যে মুগ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহারা কৃপণ আখ্যালাভ করিয়া ইহজগৎ হইতে চলিয়া যাইবেন। সূর্য্য যেমন রাত্রিকালে ভগবদিচ্ছাতেই অন্ধকারাবৃত হইয়া যায় বা সূর্য্য সর্ব্বদাই উদিত থাকিলেও রাশিচক্রের গতাগতি অনুসারে রাত্রিকালে আমাদের চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যান, সেই প্রকার ভারতবর্ষের যে অমূল্য জ্ঞানালোক বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত পুরাণাদি, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন, তাহা ভগবদিচ্ছায় রজস্তমঃ গুণাধিক্যে চক্ষুরন্তরালে তাৎকালিক অপসারিত হইলেও আবার সেই সকল জ্ঞানালোক শ্রীভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণের কৃপায় ও ভগবদিচ্ছায় আবার প্রকাশিত হইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন।

*পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম ।*
*সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥*

কে বলিতে পারে যে বুদ্ধিযোগী ভগবদ্ভক্তগণ সেই মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের বন্যা আনিয়া জগৎকে প্লাবিত করিবেন না। ভগবদিচ্ছায় সমস্তই সম্ভব হইতে পারে। ভগবদিচ্ছা হইলে সমস্ত নরনারীই নারায়ণীভাবে জাগরিত হইয়া আবার নারায়ণপরা হইয়া যাইবে। কারণ—

*নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।*
*স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥*

স্বর্গ নরক এবং ভারতবর্ষে তুল্যার্থদর্শী নারায়ণপরা ব্যক্তিগণ কিছুতেই ভীত হন না। সেই প্রকার নারায়ণপরা হইলেই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখাদি-অভাব-শোক প্রভৃতির হাত হইতে অনায়াসেই

অব্যাহতি পাওয়া যায়। জগৎ হইতে যখনই সত্ত্বগুণলব্ধ জ্ঞানালোক অন্তর্হিত হইয়া কেবলমাত্র রজস্তমোগুণের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয়, তখনই তত্ত্বজ্ঞানী নির্জ্জন ভজনে মনোনিবেশ করেন, তাঁহাদের আত্মোন্নতি কার্য্যই তখন প্রধান হয়। আরও আনুষঙ্গিক ভাবে কতকগুলি শিষ্য সেবকগণের উন্নতি করিয়া থাকেন। কিন্তু ভগবদিচ্ছা হইলে জগতের মঙ্গল প্রচারকল্পে আবার সেই যোগিগণ প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। জগতের মঙ্গলের জন্য আবার সেই রাজর্ষি জনকাদি এবং অজাতশত্রু ও কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি রাজাদিগের শাসন-পদ্ধতির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীভগবানের সমস্ত লীলাই নিত্য। ভৌমজগতেও তাঁহার লীলা নিত্যকালীন।

*অদ্যাপিও নিত্য লীলা করে গৌর রায়।*
*কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥*

সূর্য্য যেমন আমাদের চক্ষের অন্তরালে যাইলেও পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে প্রকাশিত থাকেন, সেই প্রকার শ্রীভগবানের ভৌমলীলাও অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথাও না কোথাও প্রকট থাকে। যথা ব্রহ্মসংহিতায়—

*রামাদি-মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*
*নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।*
*কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো*
*গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥*

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগের সমষ্টি ব্রহ্মার একদিনেই বহুবার (১০০০) চক্র পরিবর্ত্তন করে। যথা—গীতায়,

*'সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ'* ॥ (গীঃ ৮/১৭)



ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দ মন্বন্তর হয় এবং একাত্তর চতুর্যুগে একবার মনুর পরিবর্ত্তন হয়। উপস্থিত আমরা বৈবস্বত মনুর অধীনে অষ্টবিংশতি চতুর্যুগের অন্তর্গত যে কলিযুগ তাহাতে বাস করিয়াছি। এই বিশেষ কলিযুগেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার সম্ভব হয় এবং সেই কলিযুগেই ভগবৎ-প্রেম-ধর্ম্মের প্রচার হইয়া থাকে। শাস্ত্রদৃষ্টিতে আমরা ইহাই দেখিতে পাইতেছি। ভরসা হয়, মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সেই বিশ্বব্যাপী ভগবৎ প্রেম-ধর্ম্মের প্রচার শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। সাত্ত্বিকভাবের প্রাচুর্য্য যখন থাকে তাহাই সত্যযুগ বলিয়া অভিহিত। আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে জীবগণের সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধি হইয়া যখন স্বরূপ উপলব্ধিতে মনুষ্য জন্ম সাফল্য লাভ করে তখনই সত্যযুগের সুখ শান্তি লাভ হয়। গুণময়ী প্রকৃতিতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। যখন যে গুণের প্রাবল্য হয় তখনই সেইভাবে জগৎ পরিদৃষ্ট হয় এবং সেইভাবেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি প্রভৃতির পর পর আবির্ভাব। কলিকালে মনুষ্যের তামস-গুণ প্রবৃদ্ধি হওয়ায় প্রাকৃত ত্রিতাপ যন্ত্রণার বহুমুখী প্রসার হইয়াছে। এখন মনুষ্য অল্পায়ু, মন্দভাগ্য, মন্দবুদ্ধি, অলস এবং রোগ শোকাদি দ্বারা সর্ব্বদাই মুহ্যমান। কিন্তু তাই বলিয়া কলিকালকে ঘৃণা করিতে হইবে না। কলিকালে কলিহত জীবকে দয়া করিবার জন্য মহাবদান্য অবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়াছেন। এই কলিযুগে ভগবান যেভাবে জীবকে দয়া করিয়াছেন, এমনটি আর কোন দিনই করেন না। বিদগ্ধ মাধব গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

*অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ*
*সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।*
*হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ*
*সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥*

সুবর্ণকান্তি সমূহদ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন তোমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিলাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান কলিযুগ ধন্যাতিধন্য, কারণ এই কলিযুগেই ভগবানের স্বভক্তি সম্পত্তি লাভ করিবার সুযোগ আছে। শ্রীভগবদ্ভক্তের বুদ্ধিযোগ বলে তাহাই জগতে প্রকটিত হইবে, এরূপ আশা ভরসা আমরা করিয়া থাকি। শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব গোস্বামী কলির বহু প্রকার দোষ দর্শন করিয়াও কলিকালে যে পরম সুবিধা আছে, সে বিষয় তিনি বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

*কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।*
*কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥*
*কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।*
*দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥*

(ভাঃ ১২/৩/৫১-৫২)

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন, হে রাজন্! কলিকালে দোষ সমূহের মধ্যে এক মহান গুণ বর্ত্তমান আছে। তাহাই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন; যদ্দ্বারা মুক্তসঙ্গ হইয়া জীব পরাগতি লাভ করিতে পারিবে। সত্যযুগে যে বিষ্ণুকে ধ্যানধারণার দ্বারা প্রাপ্তব্য, ত্রেতাযুগে তাঁহাকে যজ্ঞাদি দ্বারা প্রাপ্তব্য, দ্বাপরে তাঁহাকে অর্চ্চনাদি দ্বারা প্রাপ্তব্য এবং কলিকালে তাঁহাকে হরিকীর্ত্তনের দ্বারা প্রাপ্তব্য। *"কৃষ্ণস্য কীর্তনাৎ"* এই পরিভাষায় আমরা শ্রীকৃষ্ণের মুখ-পদ্ম হইতে গীত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে গ্রহণ করিতে পারি। গীতার প্রচার হইলেই কলিযুগে ভগবৎ প্রেমের ভিত্তি স্থাপন হইবে এবং সেই ভিত্তির উপরই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদত্ত উজ্জ্বল রস স্বভক্তি সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।



এই প্রকার লাভেই ভগবদ্ভক্তগণের বুদ্ধিযোগের সিদ্ধি পরিলক্ষিত হইবে। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের কিছু কিছু কণামাত্র অধুনা ইতস্ততঃ দেখা গেলেও, সমস্ত উপনিষদ্—গাভীর ঘনীভূত দুগ্ধ শ্রীগীতোপনিষদ্, তাঁহার দোগ্ধা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং দুগ্ধপায়ী স্বয়ং শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয়। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধক্ষেত্রে যদি অর্জ্জুন মহাশয় গীতোপনিষদরূপ দুগ্ধ পান করিবার সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা এমন কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত নাই যে তাহার জন্য সময় হইবে না। শ্রীগীতোপনিষদের সুষ্ঠু প্রচার হইলেই আমাদের বাস্তব যোগসিদ্ধি লাভ হইবে। ভগবদ্ভক্তগণ প্রবর্ত্তিত বুদ্ধিযোগ সিদ্ধি হইলে মহাবদান্য অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবদ্প্রেম-ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিস্তারলাভ করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় এখনই সেই শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবাসিগণ ভগবদ্ভক্তগণের শীতল ছায়ায় সকলে একত্রিত হইয়া *"কৃষ্ণস্য কীর্তনম্"* শ্রীগীতোপনিষদ প্রচার করুন। তাহাতেই জগতের সাম্যসিদ্ধিলাভ হইবে। গীতোপনিষদের বাণীকে স্বরূপ দিবার জন্যই জগতে আজ বহুমুখী উত্তম উত্তম ধ্যান-ধারণার সমাবেশ দেখা যাইতেছে; কিন্তু কিভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু আমরা জানি জগতের সকল বিবদমান কথাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ভগবৎ-প্রেমেই সামঞ্জস্য হইবে।

মনুষ্য-জাতির সেই প্রকার অনুকূল ভাবধারার কিভাবে পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহার অনুসন্ধান ভারতবর্ষেই আছে। যিনি যেখানে যেভাবেই থাকুন না কেন সকলেই—গীতোপনিষদরূপ *"কৃষ্ণস্য কীর্তনম্"* শ্রবণ করিলেই নিজের ভাবধারা পরিবর্ত্তন করিয়া অনুকীর্ত্তন দ্বারা অজিত ভগবানকে জিত করিতে পারিবেন। অধুনা আমরা যে দিকেই আঁখি ফিরাই না কেন সর্ব্বত্রই দ্বন্দ্বমোহরূপ অন্ধকারই দেখিতেছি। ইহাই কলিযুগের প্রভাব বিস্তার। কিন্তু আমাদের বড় ভরসা আছে যে জীবমাত্রেরই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে

উদয় হইলেই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী নির্দ্দিষ্ট *কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গের পরং ব্রজেৎ* কার্যাকরী হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং যে শুভ পরিবর্ত্তনের মহান সূচনা দেখা যাইতেছে তাহা প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরাত্মা হইতেই আবির্ভাব হইবে। সেই অন্তরাত্মা হইতে যে ভাবের উদয় হইবে তাহাই শ্রীভগবদ্ ভক্তগণের বাস্তব যোগসিদ্ধি। সেই প্রকার পরিবর্ত্তন কোন প্রকার রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা সম্ভব হইবে না। এই প্রকার যোগসিদ্ধিকেই ভগবদ্‌গীতায় বুদ্ধিযোগ, ভক্তিযোগ বা পূর্ণযোগ বলা হইয়াছে। সমস্ত প্রকার যোগ, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতির প্রত্যবায় বা বিনাশ আছে কিন্তু এই বুদ্ধিযোগের প্রত্যবায় বা বিনাশ নাই। এমন কি এই যোগের স্বল্পমাত্র সাধন হইলেও বহু বৃহৎ ভয়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ইহাই গীতোপনিষদের উপদেশ। যথা—

*এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।*
*বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥*
*নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।*
*স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥*

(*গীঃ* ২/৩৯-৪০)

এই বুদ্ধিযোগই বাস্তবযোগ যদ্দ্বারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ভগবানের দর্শন হইলে মুক্তিদেবী মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সেবা করেন এবং ধর্ম্মার্থকাম প্রভৃতি কিঙ্করের ন্যায় সময় প্রতীক্ষা করেন। শ্রীভগবদ্ভক্তগণই সেই প্রকার যোগসিদ্ধির মূর্ত্ত বিগ্রহ। ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গের ফল তাঁহাদের বাস্তব যোগসিদ্ধির করতলগত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকে অতিক্রম করিয়া যে পঞ্চম পুরুষার্থ আছে তাহারই নাম ভগবদ্ভাব (Super consciousness) এবং সেই ভাব যাহার উদয় হইয়াছে তিনিই ভগবদ্ভক্ত (Super man) এই প্রকার কৃষ্ণভক্ত কোটি ভক্তগণের মধ্যেও দুর্ল্লভ।



এইরূপ সংবাদ আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম হইতে জানিতে পারি। ইহাই সর্ব্বযোগসিদ্ধির চরমফল জানিতে হইবে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে হঠযোগ রাজযোগ বা ত্রিমার্গযোগাদি কোন কার্য্যেই লাগে না। সেই সকল শারীরিক যোগাদির উপরে যে পুরাতন নিষ্ঠা বা অধ্যাত্মযোগ তাহাই সেই বুদ্ধিযোগসিদ্ধির উপায়। অধ্যাত্মযোগ দ্বারাই অদ্বয়জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, যদ্দ্বারা জগতের সকল বস্তুই ভগবানে এবং ভগবানেই সমস্ত বস্তু দর্শন হয়। যথা—

*মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।*
*ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥*

(*গীঃ* ৭/৭)

এই উপলব্ধির দ্বারাই সমস্ত মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত বস্তু, সমস্ত ঘটনা, সমস্ত দেবতা, সমস্ত দানব, সমস্ত গন্ধর্ব্বগণ একমাত্র ভগবৎ সূত্রেই মণিগণের ন্যায় গ্রথিত বলিয়া উপলব্ধি হয় এবং সেই প্রকার চিদ্দর্শনের দ্বারাই সেই পরাৎপর পুরুষ্ বা পুরুষোত্তমের শ্রীচরণে শরণাগতি আনয়ন করে। যথা—

*যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।*
*স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥*
*ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।*
*এতদ্ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥*

(*গীঃ* ১৫/১৯-২০)

শ্রীপুরুষোত্তমের পাদপদ্মে শরণাগতি হইলেই স্থাবর-জঙ্গম আর দর্শন না হইয়া সর্ব্বত্রই শ্রীপুরুষোত্তমের মূর্ত্তিই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং সেই প্রকার শরণাগতি ষড়বিধ লক্ষণের দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। যথা—

*আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।*
*রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ॥*
*আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতি।*

ভগবানের শরণাগত ভক্তের ভগবানের নিকট কিছুই সংগুপ্ত থাকে না। ভগবৎ সেবা ব্যতীত তাঁহার অন্যাভিলাষ জ্ঞানকর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা অনুশোচনা ধ্যান ধারণা কিছুই থাকে না। তখন চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইয়া সকল ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। হৃদয় দ্বন্দ্বমোহ নির্ম্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণৈক শরণ হইয়া যায়। কৃষ্ণৈক শরণ অবস্থায় নিজেকে বিক্রীত পশুর ন্যায় ভগবানের পাদপদ্মে আত্মনিক্ষেপ হইয়া যায়। তখন ভগবানই বুদ্ধিযোগ দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় সকল শরণাগত ভক্তকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। যথা—

*তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।*
*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥*
*তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।*
*নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥*

(গীঃ ১০/১০-১১)

এরূপ শরণাগতি বা নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় ভগবৎ ইচ্ছাক্রমে সমস্ত জিনিসই অন্বয় ব্যতিরেক ভাবে সহজেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই প্রকার শরণাগতি অসম্যক্ হইলেও যতদূর সম্ভব হইয়াছে তাহাতেই সমস্ত যোগক্রিয়ার সাধন সম্পূর্ণ এবং পর্য্যাবসান হইয়া যায়।

*'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ'*—এই অবস্থায় স্বয়ং ভগবানই তাঁহার শরণাগত ভক্তের প্রতি সদয় হইয়া সাধনার সিদ্ধ যোগাযোগ করিয়াছেন। তাঁর ঐশী শক্তির কার্য্য আরম্ভ হইলে আমাদের কৃত্রিম চেষ্টা অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ কার্য্যকরী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এবং সেই অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা আমাদের যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহাও অচিন্ত্য শক্তিরই পরিচয়। এই প্রকারে ভগবচ্ছক্তি কার্য্যকরী হইলে রাজযোগের সাম্য, উন্নত স্তরের প্রাণায়াম, সমাধি, কৃচ্ছ্রসাধনা, তপ, বৈরাগ্য এই সকল উপায়গুলি প্রত্যেকটিই



বহু বলশালী হইলেও, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শরণাগতিরূপ ঐশী শক্তির নিকট অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া যায়। উক্ত প্রকার রাজযোগাদি যতই বলবান হউক না কেন, তাহা সমস্তই মনুষ্য চেষ্টা মাত্র। সেই সকল উপায় ঐশীশক্তি সম্পন্ন ভগবৎ শরণাগতির নিকট কিছুতেই সমতা লাভ করিতে পারিবে না। এই প্রকার শরণাগতিরূপ ঐশী শক্তি ভগবানেরই ইচ্ছাতে ব্যক্তিগত হিসাবে অথবা যাবৎ প্রয়োজনানুসারে কার্য্যকরী হয় বলিয়া তাঁহার অসীমত্ব হানি হয় না।

এই প্রকার শরণাগতির প্রথম লক্ষণ যাহা তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। অর্থাৎ ভগবৎ কৃপাপ্রাপ্তির অনুকূল বিষয়ের সংকল্প। তদ্দ্বারা নিজেকে ভগবদিচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া। এই শরণাগতি কোন হেতু-মূলক নহে। কোন প্রকার অভিলাষ যথা—ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামনা শূন্য। "ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত" ইত্যাদি বিকার। কেবলমাত্র ভগবদিচ্ছা পালনের জন্যই সংকল্প। শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন—

*অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে ।*
*অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥*

শরণাগত ব্যক্তি ভোজন ও আচ্ছাদন সংগ্রহের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও যদি প্রাপ্ত না হন অথবা যদি লব্ধ সামগ্রী বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেও ব্যাকুলিত না হইয়া মনোমধ্যে হরিকেই স্মরণ করিবেন। ভগবানের পাদপদ্মে যিনি যাহা প্রার্থনা করেন, ভগবান্ যথাসম্ভব তাঁহাকে তাহাই দান করেন সত্য। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার পাদপদ্মে আত্মনিক্ষেপরূপ শরণাগতি করিয়াছেন অর্থাৎ কিছুই প্রার্থনা করেন না, তাঁহাদিগকে ভগবান্ তাঁহাদের যাহা আবশ্যক তাহা ত' দিয়া থাকেন। অধিকন্তু তিনি নিজেকে পর্য্যন্ত সেই শরণাগত-ভক্তকে দান করেন। যথা—

*অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে ।*
*তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥*

(গীঃ ৯/২২)

অনন্যচিত্ত ভক্তগণই শরণাগত ভক্ত। ভগবৎ-শক্তি কিভাবে কার্য্য করিতেছে তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারেন। অনেক সময় ভগবানের কৃপা হয়তো বহু আর্ত্তির পর আবির্ভূত হয় বলিয়া বিচলিত হইতে হইবে না। ভগবান্ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, এই সুদৃঢ় বিশ্বাস সর্ব্বদাই পরিপোষণ করা দরকার। আমরা যে অবস্থায় বর্ত্তমান আছি সেই যুগে এবং সেই অবস্থায় সম্পূর্ণ ভগবৎ বিশ্বাসী হওয়া আমাদের সম্ভব না হইলেও, ভগবৎ বিশ্বাসের ফল কখনই নিষ্ফল হইবে না। প্রথম অবস্থায় কিছু ইতস্ততঃ থাকিলেও পরে পরে আমরা বুঝিতে পারিব যে, ভগবান আমাদের সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন। সেই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলেও আমাদের দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। এবং চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে অথবা সন্দেহ উপস্থিত হইলে সাধুদিগের সঙ্গ করা আবশ্যক। শ্রুতিশাস্ত্রে পারদর্শী এবং পরমব্রহ্মে নিষ্ণাত সাধুগণ তাঁহাদের উক্তি ও আচরণ দ্বারা আমাদের সর্ব্বপ্রকার সন্দেহই দূর করিতে পারেন এবং চিত্তচাঞ্চল্য হইতে রক্ষা করিতে পারেন। সাধুসঙ্গক্রমে ভগবানের বীর্য্যসূচক হৃৎকর্ণরসায়ন্ কথা সকল আলোচিত হইলেই ভগবানে শ্রদ্ধারতি ভক্তি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধন হয়, শ্রদ্ধা হইতেই শরণাগতি প্রথমে আরম্ভ হয় এবং পরে সাধুসঙ্গ দ্বারা তাহা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। দৃঢ়তা লাভের পর ভজনোৎকর্ষ সাধন হয় এবং পরে চিত্ত চাঞ্চল্য সন্দেহাদি দূরীভূত হইয়া ভগবৎপ্রেমরূপ মহান্ পুরুষার্থ লাভ হয়। এই পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গই একমাত্র অবলম্বন।

*সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।*
*লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥*



*সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্ ।*
*মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥*

(ভাঃ ৯/৪/৬৮)

সাধুগণের হৃদয়ে সর্ব্বদাই ভগবান্ অবস্থান করেন বলিয়া সেই পবিত্রতাবলে সাধুগণ পাপমলিন-তীর্থে সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন যে,—

*'মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি'* । (গীঃ ১৮/৫৮)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাগত ভক্তগণ সকল প্রকার দুরপনেয় বিপদ হইতে তাঁহারই কৃপাদ্বারা রক্ষিত হয়। সেই কর্ম্ম-জ্ঞানযোগ এবং তপস্যার ফলই ভগবানের শরণাগতি।

*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।*
*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥*

(গীঃ ১৮/৬৬)

যেখানে ভগবান্ স্বয়ং রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করেন, সেখানে আর ভয়ের কথা কি আছে? যিনি সর্ব্বশক্তিমান অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভরণপোষণকারী, তিনি যদি আমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলে আমার শরণাগত হইবার কি আপত্তি হইতে পারে? আমরা যদি ভগবানের শক্তি উপলব্ধি করিতে পারি তিনিও তাঁর শক্তির পরিচয় দিতে পারেন। আমার শক্তি বুদ্ধি দ্বারা আমি আমার নিজের কতটুকু সুখ-সুবিধা করিতে পারি? কিন্তু যাঁহার ইঙ্গিতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্য্য সাধিত হইতেছে, সেই শক্তির দ্বারা আমি নিশ্চয়তার সহিত সংরক্ষিত হইলে আর আমার চিন্তা করিবার কি থাকিতে পারে? সুতরাং তাঁহারই পাদপদ্মে আমাদের বিক্রীত হইয়া যাওয়াই সকল বাস্তব যোগসাধনের

চরম ফল। এই শরণাগতিও যেমন একদিন সম্ভবপর হয় না, সেই ভগবানের কৃপাও একটা ভৌতিক ব্যাপারের মতো হাজির হয় না। অনেক সময় ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্ত অলৌকিক ব্যাপার সাধন করিলেও আমাদের সেই প্রকার অলৌকিক ব্যাপার আশা করা উচিত নহে। আমাদের প্রপত্তি যে পরিমাণে ভগবানের পাদপদ্মে উপস্থাপিত হইবে, তাহা অপেক্ষা বহুগুণ পরিমাণে ভগবদ্ কৃপা আমরা পাইব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সমস্ত কৃপা আমাদের উপর একেবারে বর্ষিত হইলে আমরা বহু অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগিগণের মত পতিত স্খলিত হইয়া নিরয়গামী হইয়া যাইব। ধৈর্য্য ধরিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য করিলে ভগবৎকৃপা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

শ্রুতিতে যে মন্ত্র আছে, যথা—*দ্বাসুপর্ণা সজুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে*—ইত্যাদি সেই বিচারে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে যে বিচার আছে যথা,—

*সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ*
*যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।*
*একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-*
*মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥*

(ভাঃ ১১/১১/৬)

অর্থাৎ দেহরূপ বৃক্ষে দুই স্বজাতীয় পক্ষী (পরম পুরুষ ভগবান্ এবং জীবাত্মা) বাস করিতেছেন। একটি পক্ষী সংসার বৃক্ষের ফল ভোগ করিতেছে, অপর পক্ষী ফল ভোগ না করিয়াও নিজ চিচ্ছক্তি বলে বলবান্ হইয়া আছেন। জীবাত্মা পুরুষ শরণাগত হইয়া পরমপুরুষ ভগবানের প্রদত্ত ফল ভোগ করিবেন। তিনি বলেন ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া কালীই অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি হইয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হন।



সেই অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি কার্য্য স্বয়ং যজমান হইয়া অবস্থান করিবে এবং সমস্ত কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিবে।

এই প্রকার ভগবদ্ভক্তির কার্য্য উত্তরোত্তর উন্নত স্তরে সম্ভাবিত হয়। *পরাস্যশক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে।* প্রত্যেক জ্ঞান-ভূমিকায় তাঁহার যে শক্তি কার্য্য করে পরোক্ষ ভূমিকায় সেই শক্তি অন্যভাবে কার্য্য করে। সেই প্রকার অপরোক্ষ অধোক্ষজ এবং অপ্রাকৃত ভূমিকায়ও ভগবচ্ছক্তি বিবিধ প্রকারে কার্য্য করে। একই শক্তির ভূমিকানুযায়ী বিবিধ পরিচয়। তৎ তৎ ভূমিকায় পূর্ণ অধিকার লাভে এই সকল শক্তির কার্য্য বিশেষভাবে বোধগম্য হয়। প্রত্যক্ষ ভূমিকায় দেহ হইতে ইন্দ্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এবং সেই বুদ্ধি অপেক্ষা যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাই জীবাত্মার স্বরূপ বা সত্যাধার বা শুদ্ধ সত্ত্ব। শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত হইলে অধোক্ষজ অনুভূতির সেবালাভ হয় এবং সেই প্রকার সেবাতেই চিচ্ছক্তির আহ্লাদিনী অংশ বিরাজিত। শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মনীষিগণের মতে ইহাই বিজ্ঞানানন্দ এবং সেই বিজ্ঞানানন্দ অবস্থাই যীশুখৃস্টের প্রচারিত Kingdom of Heaven ভগবদ্ধামের উপলব্ধি। আমাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় যে জড়ীয় আনন্দ তাহাতে জাগৃতি থাকিলে ঐ প্রকার চিদানন্দের সুষুপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু সেই চিদানন্দের আবির্ভাব হইলেই বাস্তব যোগসিদ্ধি লাভ হয় এবং এই বিজ্ঞানানন্দ বা চিদানন্দ বিষয়ে আকৃষ্ট হইলেই ভগবদ্ধামে বাস হয়। লৌহ যেমন অগ্নিসংযোগে দাহিকা শক্তি প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার আমাদের প্রত্যক্ষানুভূতির ভূমিকায় অবস্থান কালেও বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগ দ্বারা চিদানন্দ বা বিজ্ঞানানন্দ উপলব্ধি হইলেই আমাদের জড় সুষুপ্তি এবং চিজ্জাগৃতি লাভ হইয়া যায়। ভগবদ্গীতায় এই চিজ্জাগৃতির উপায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

*ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।*
*নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥*

*অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।*
*অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥*

(গীঃ ১২/৮/৯)

ভগবান্ পীতবাস বনমালী শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতেই মনোনিবেশ করিলেই নির্ব্বিশেষ দুঃখ মোচন হইয়া যাইবে। তাঁহাতে মনোনিবেশ অর্থে তাঁহারই নববিধা ভক্ত্যঙ্গ কার্য্যে মনোনিবেশ করা। এই প্রকার মনোনিবেশ কার্য্যে প্রথম অবস্থায় অকৃতকার্য্য হইলেও অভ্যাস যোগদ্বারা তাহা সম্ভব হইবে। সেই প্রকার অভ্যাস যোগেরই অন্যতম নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাখ্য নববিধা ভক্তি যাজন। এই অভ্যাস যোগ সিদ্ধির দ্বারাই ভগবদ্ভাব (Super Consciousness) জাগরিত হইলেই আমরা কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব।

শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির মতে যোগের তৃতীয় স্তরে সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। জ্ঞানযোগ দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি সত্তায় সর্ব্বত্র-ব্যাপী নির্ব্বিশেষ সদাত্মার শান্ত লক্ষণ দৃষ্টিতে ভগবানের নাম, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই নির্ব্বিশেষ সত্তায় সদাত্মা ব্যতীত আর সবই মায়িক বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু এই জড় নির্ব্বিশেষ বা ব্রহ্মোপলব্ধির পরও আমাদের আরও আগুয়ান হইতে হইবে এবং সেই অগ্রগতিতে পশ্চাৎপদ না হইলে আমরা সেই সদাত্মার অধিযজ্ঞ সত্তার অনুভব করিতে পারিব এবং তদূর্দ্ধ্ব তাঁহার চিৎবিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্যের সম্যক্ পরিচয় পাইব। সেই চিৎসবিশেষ পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারিলেই আমরা উপনিষদ্ ও গীতা-উপদিষ্ট অপ্রাকৃত অনুভূতিময় জীবনের সন্ধান পাইয়া তাহাতে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব। তখন সমস্ত বস্তুই সেই পরমাত্মা এবং সমস্ত বস্তুতেই পরমাত্মার অধিষ্ঠান দেখিব।

*'আত্মানং সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বভূতানি চাত্মনি'।*



এই প্রকার বিচারে যে মহাত্মা, এই প্রকার সকল বস্তুতেই বাসুদেবের সম্বন্ধ দর্শন করিতে পারিবেন তিনি সুদুর্ল্লভ। *'বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভ'* *'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'* ইত্যাদি বিচার। এই প্রকার অধ্যাত্মযোগের চরম উৎকর্ষ তখনই সাধিত হইবে যখন আমরা অনুভব করিতে পারিব যে, সেই পরাৎপর পুরুষেরই লীলাশক্তির পরিচয় এই অখণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। নারদমুনি শ্রীব্যাসদেবকে উপদেশ করিয়াছিলেন, যথা—

*'ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো*
*যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ ।*
*তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে*
*প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্ ॥'*

(ভাঃ ১/৫/২০)

তখন সদাত্মার জড় নির্ব্বিশেষ অপসারিত হইয়া চিৎ-সবিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পাইবে। সেই চিৎ-সবিশেষ ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ যিনি অনাদির আদি গোবিন্দ, সর্ব্বকারণের কারণ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইতেও পরাৎপর-তত্ত্ব।

*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ ।*
*অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্ ॥*

সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের অঙ্গজ্যোতিই চিন্মাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং তাঁহারই অপাশ্রিতা মায়াই জড় সবিশেষ অসৎ অনিত্য জগৎ। অতএব এই অনিত্য জগৎ-তত্ত্ব ভগবানেরই শক্তির পরিণাম, অতএব নাশময়। সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তাঁহার নিত্যধাম গোলোকে বাস করিয়াও অখিলাত্মভূত রূপে প্রকাশিত। সুতরাং তাঁহারই একাংশে এই অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করিতেছে। যথা—ব্রহ্মসংহিতায়—

*আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি-*
*স্তাভির্য এব নিজরূপ তয়া কলাভিঃ।*
*গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো*
*গোবিন্দমাদিপুরুষম্ তমহং ভজামি ॥*
*গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য*
*দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।*
*তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥*

সেই গোবিন্দই *'পুরুষঃ বরেণ্য আদিত্য বর্ণস্তমসঃ পরস্তাৎ।'* যেহেতু তিনি তাঁহার পুরুষোত্তম লীলা দ্বারা সকলকেই আকর্ষণ করিতেছেন, সেই হেতু তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ববাদীসম্মত। অন্যান্য নাম ও নামী তাঁর অংশকলাদির মধ্যে পরিগণিত। *'এতেচাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'* শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ আদি ও অনাদি পুরুষোত্তম। তাঁহারই অনন্ত শক্তির পরিচয় এই জগৎ। তাঁহারই স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার পরিচয় সচ্চিদানন্দময় এই জগৎ। প্রাপঞ্চিক জগৎ যাহাকে আজ আমরা মায়িক বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, সেই প্রপঞ্চকেই ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইয়া আমরা একদিন তাঁহার সম্বন্ধ দেখিতে পাইব। সুতরাং প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে হরি সম্বন্ধীয় বস্তুগুলি তখন ভোগ বা ত্যাগের বস্তু বলিয়া দর্শন হইবে না; ইহাই অধোক্ষজানুভূতির ফল। তখন আমরা ব্রহ্মসংহিতার এই মন্ত্র বুঝিতে পারিব। যথা—

*অগ্নির্মহী গগনম্ মরুদ্দিশশ্চ*
*কালস্তথাত্মমনসীতি জগৎত্রয়ানি।*
*যস্মাদ্ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যং চ*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥*



অধোক্ষজ অনুভূতিতে দৃঢ়চিত্ত হইলে আমাদের শোক মোহ ভয়াদি অনায়াসেই দূরীভূত হয়। *'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশাৎ।'* কৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন বস্তু আছে, এই প্রকার মায়িক অনুভূতিতেই শোক মোহ এবং ভয়ের আবির্ভাব। সুতরাং অধোক্ষজ অনুভূতির দ্বারাই জগৎ পূর্ণ সুখময় বলিয়া প্রতিভাত হয় *'বিশ্বপূর্ণং সুখায়তে।'* জড়ানুভূতি ত্রিগুণাত্মক মনোধর্ম্মের কার্য্য এবং তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। জড়ানুভবে যাহা গুণ, সংহতি এবং সঙ্কলিত এক প্রকার অবস্থার সমাবেশ হয়, তাহাই চিদনুভূতির দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সম্বন্ধে লক্ষীভূত হয়। অগ্নিমহী গগনাম্বুমরুৎ দিক কাল আত্মা মন ইত্যাকার যাহা কিছু চিদচিৎ সবিশেষ নির্ব্বিশেষ বস্তু আছে তাহা সকলই কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। তিনিই অনন্ত শক্তি ও চিদ্গুণ দ্বারা নিষ্ফল ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান। এই প্রকার অবস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমাদের পাপপুণ্য, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-মোহ চিদ্-রসে অপসারিত হইয়া যায়। তখনই উপনিষদের *'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনঃ।'* যিনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার আর ভয় করিবার বস্তু জগতে কিছুই থাকে না। ঈশোপনিষদে এই প্রকার মন্ত্র আছে। যথা—

*যস্মিন্ সর্বানি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।*
*তত্র কো মোহো বা শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥*

আত্মানুভূতির দ্বারা যখন বুঝিতে পারা যায় যে, সমস্ত বস্তুই পরমাত্মায় অবস্থিত, তখন আর মোহ কোথায়, শোক কোথায়? সমস্ত বস্তুই তখন একত্বে দৃষ্ট হয়। সমস্ত জগৎই এক অপূর্ব্ব দর্শনে দৃষ্ট হয় (unity in diversity)। সে অবস্থায় সবই সুখময়, জ্ঞানময়, আনন্দময়, নিত্য শাশ্বত পুরাণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

কেবল চেতন বস্তুতে যেই আমরা নারায়ণের সত্তা অনুভব করিব তাহা নহে পরন্তু অচেতন বস্তুতেও তাঁহার বিশদ পরিচয় পাইব। জড়া-

নুভূতির দ্বারা যে আমরা অজ্ঞানান্ধকারে মুহ্যমান আছি তাহা গুরুকৃপায় জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা উন্মীলিত হইলে সমস্ত বস্তুই ভগবৎ সম্বন্ধে চিন্ময় উপলব্ধি হইবে। অন্নময়, প্রাণময়, মনময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় সকল কোষেই সচ্চিদানন্দ অনুভূতি হইবে। অন্বয়ব্যতিরেক ভাবে আচ্ছাদিত চেতন, মুকুলিত চেতন, বিকশিত চেতন বা প্রস্ফুটিত চেতন ক্রমবিকাশে আনন্দময় হইবে। সবই ভগবৎ সেবার উপকরণ সূত্রে আনন্দময় হইবে। ফুল ফল বৃক্ষ লতা মাটি ধাতু ইত্যাকার যে কোন বস্তু আছে তাহা সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণ জানিয়া চিন্ময় উপলব্ধি হইবে। তখন হরি সম্বন্ধীয় বস্তু ভিন্ন অন্যদর্শন থাকিবে না এবং এই কথাই ঈশোপনিষদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—

"*ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চজগত্যাং জগৎ*"—এই জগৎ এবং এই জগতের সমস্ত বস্তুই ভগবানের বাসের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ হইবে।

ভগবানের অস্তিত্ব কেবলমাত্র সর্ব্বভূতেই দর্শন করা শেষ কথা নহে, পরন্তু তাঁহার অস্তিত্ব আমরা সকল ঘটনায়, সকল কার্য্যে, সকল চিন্তায় সকল অনুভূতিতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে দেখিতে পাইব। সেই প্রকার সুদর্শন হইবার জন্য দুইটি বস্তুর বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমতঃ আমাদের সমস্ত কর্ম্মফলই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করা আবশ্যক এবং দ্বিতীয়স্তরে কেবলমাত্র কর্ম্মফল নহে পরন্তু কোন কর্ম্মই ভগবৎ-সেবা বাদ না দিয়া করা। সর্ব্বদাই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, ভগবানই সমস্ত কর্ম্মের ভোক্তা ও প্রভু। যথা—গীতায়—

*অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।*
*ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥*

(*গীঃ* ৯/২৪)



*যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।*
*যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম্ ॥*

(*গীঃ* ৯/২৭)

প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে ভগবৎ সেবার উপকরণ ত্যাগ করিয়া, ফল্গু বৈরাগ্য দেখাইয়া কোনই লাভ নাই। জগতে যত প্রকার বস্তু আছে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য, তাহার কিছুই আবশ্যক নাই। কিন্তু সে সমস্ত বস্তুই ভগবানের সেবায় আবশ্যক, এই প্রকার চিন্ময়ভাব (Super Consciousness) প্রণোদিত হইয়া যে-কার্য্য করা যায়, তাহাই যুক্ত বৈরাগ্য অর্থাৎ ফল্গু-বৈরাগ্যের বিপরীত। ভগবান এই কার্য্য সমাধান করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন, যেমন তিনি অর্জ্জুন মহাশয়কে আদেশ করিয়াছিলেন সেই প্রকার, সুতরাং ইহাই আমার কর্ত্তব্য, কর্ম্মফল তাহার যাহাই হউক না কেন, সমস্তই শুভ জানিতেই হইবে। যথা—গীতায়—

*শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।*
*সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥*

(*গীঃ* ৯/২৮)

আমার নিজের কি আবশ্যক তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া ভগবান্ আমার দ্বারা কি সেবা লইবেন তাহাই জানিয়া লওয়াই বাস্তব যোগসিদ্ধি। আমার ব্যক্তিগত ভাবে কি ভাল কি মন্দ, কি ভুল বা কি নির্ভুল, কি আবশ্যক বা কি অনাবশ্যক, সেই সকল দ্বৈত বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্গীতায় মহাবীর অর্জ্জুন মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণে কেবলমাত্র জানিতে চেষ্টা করা যে, ভগবান্ আমার দ্বারা কি সেবা গ্রহণ করিবেন। সেই প্রকার ব্যবসায়াত্মিকা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম আচরণের দ্বারাই আমাদের সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হইয়া সমস্তই শুভফল প্রসব করিবে, সে বিষয়ে আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত শ্রদ্ধা নিতান্ত আবশ্যক।

'শ্রদ্ধা' শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥
(*চৈঃ চঃ ম ২২/৬২*)

আমাদের অন্ততঃ এতটুকু বিশ্বাস থাকা আবশ্যক যে সর্ব্ব-শক্তিমান ভগবান্ অথবা ভগবানের যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াত্মিকা একশক্তি সমস্ত জগতের কার্য্যাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই শক্তিমান্ ভগবান্ অথবা সেই শক্তি আমার ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র শক্তির অপেক্ষা কোন অংশেই হেয় নহে। সুতরাং ব্যক্তিগত বা আমাদের সমষ্টিগত সুবিধা অসুবিধার জন্য আমাদের সহিত ভগবানের পরামর্শ না করিলেও কোন অসুবিধা নাই।

কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? *গহনা কর্মণো গতিঃ।* যথা গীতায়—

*কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ ।*
*তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥*
*কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ ।*
*অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥*
(*গীঃ* ৪/১৬-১৭)

কর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতিশয় দুর্গম। কেহ কেহ বলিবেন কর্ত্তব্য কর্ম্ম অর্থে সৎকর্ম্ম। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি সৎকর্ম্ম বলিতে কি বুঝিবেন? সৎ শব্দে ব্রহ্মবস্তু। সুতরাং সেই প্রকার কর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্মকর্ম্মই সৎকর্ম্ম বলিয়া সূচিত হয়। কেহ হয়তো বলিবেন সৎকর্ম্ম অর্থে যদ্দ্বারা আমার নিজের, আমার সমাজের, আমার দেশের বা সমস্ত মনুষ্য-জাতির কল্যাণ হয় তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই প্রকার উৎকৃষ্ট ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা দেশের জন্য বা দশের জন্য ভাল কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহারা জনসাধারণের উপকারী ভাল লোক হইতে পারেন, বা সে সকল তাৎকালিক ভাল কর্ম্ম চিত্ত বিক্ষিপ্ত অপর সাধারণগণের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ হিসাবে ভাল কর্ম্ম বলা যাইতে পারে, কিন্তু



তাই বলিয়া তাহাকে বুদ্ধিযোগ অথবা কর্ম্মযোগও বলা যাইতে পারে না। তাহাতে মনুষ্য-জাতি একপ্রকার অন্যাভিলাষ অতিক্রম করিয়া অন্য প্রকার অন্যাভিলাষে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু অন্যাভিলাষ বর্জ্জিত হইতে পারে না। তাহা অন্যাভিলাষশূন্য জ্ঞানকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত শুদ্ধভক্তি বা ভগবৎসেবার অনুকূল হইতে পারে না। ব্যক্তিগত অন্যাভিলাষ অপেক্ষা সমষ্টিগত অন্যাভিলাষ আরও ভয়াবহ। সমষ্টিগত অন্যাভিলাষ দ্বারা জগতের যত অহিত হয়, ব্যক্তিগত অন্যাভিলাষ দ্বারা তত ক্ষতি হয় না। ব্যক্তিগত অন্যাভিলাষ পরিপূর্ণ না হইলে যে পরিমাণ দুঃখের উদ্ভব হয়, সমষ্টিগত অন্যাভিলাষ পরিপূর্ণ না হইলে তাহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে দুঃখের কারণ হয়। অতএব অন্যাভিলাষ পূর্ণ জ্ঞানকর্ম্ম, কর্ম্মের শুভাশুভ ফল হইতে কোন দিনই রক্ষা করিতে পারিবে না। শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগী হইবার ইচ্ছা না করিলেও তাহা আসলে সত্ত্ব, রজ, তম কর্ত্তৃত্বাভিমানে কৃত হইবেই এবং তজ্জনিত কর্ম্মানুরোধ, ব্যগ্রতা, ব্যর্থতা, পরিচ্ছিন্নতা অবশ্যই বর্ত্তমান থাকিবে। অতএব সেইগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে পারে না। ত্রিগুণাতীত ভগবৎ কর্ম্মই কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে।

নিজ ব্যক্তিগত শুভাশুভ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিয়াই শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয় যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিমূলক সামাজিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থানুসন্ধান কার্য্যের বিপক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুই প্রকার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। এক প্রকার নির্দ্দেশ বদ্ধজীবের জয়মুক্তিমূলক, আর এক প্রকার নির্দ্দেশ মুক্তজীবের পরাভক্তিমূলক শরণাগতি সূচক। বৈধ শাস্ত্রনির্দ্দেশগুলি মুক্তকুলের নির্দ্দেশ বলিয়া তাহা বদ্ধজীবের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটব দোষ চতুষ্টয় বিবর্জ্জিত। আমাদের ভ্রম প্রমাদাদি দোষ চতুষ্টয়যুক্ত ইচ্ছাদ্বেষজাত যুক্তি আগ্রহ এবং সংস্কার প্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়া সেই সকল শাস্ত্র-নির্দ্দেশ বর্ত্তমান। সুতরাং সেই সকল শাস্ত্র-নির্দ্দেশ

দ্বারা আমরা কেবলমাত্র আত্মসংযমই যে করিতে শিখিব তাহা নহে, পরন্তু আমাদের সাত্ত্বিক অহঙ্কার পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া আমাদিগকে *মুক্তিপদে দায়ভাক্* করিয়া দিবে।

ভ্রম-প্রমাদশূন্য বৈদিকশাস্ত্র সমূহই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া পরিগণিত। বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্, বেদান্ত, পুরাণ, মহাভারতাদি ইতিহাস এবং বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতম্ অমল পুরাণ যাহাতে মনুষ্যজীবন যাপনের সুচারু নির্দ্দেশ বর্ত্তমান, সেই সকল শাস্ত্রানুশীলনে সকল মনুষ্যেরই অধিকার আছে। স্মৃত্যাদি শাস্ত্রও পরে মনুষ্য সমাজের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বর্ণাশ্রম বিচারও এই সকল শাস্ত্র বিচারের অনুমোদিত।

কিন্তু আধুনিক আসুরিক বর্ণাশ্রম বিচার শাস্ত্রানুকূল নহে। গুণ কর্ম্ম বিচার না করিয়া অনধিকারীকে অধিকার দিয়া জন্মগত বিচার দ্বারা যে আসুরিক বর্ণাশ্রমের প্রচলন দেখা যায় তাহা কদাচিৎ শাস্ত্র-উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে না। শাস্ত্র-উদ্দেশ্য দৈব বর্ণাশ্রম স্থাপন করা এবং তদ্দ্বারা মনুষ্য সমাজকে মুক্তির পথে লইয়া যাওয়া।

কিন্তু সেই মহান শাস্ত্র-নির্দ্দেশগুলিকে অপস্বার্থ মূলে ব্যক্তিগত ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাদি কৈতব প্রধান ধর্ম্মের নামে অপব্যবহার করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার নহে। অপর দিকে সেই শব্দব্রহ্মের অনুশীলন দ্বারা মনুষ্য জীবনের সাফল্য লাভ করা যায়। আমাদের সেই সাফল্য লাভ করিবার জন্য এবং মুক্তিপদ লাভ করিবার জন্য কেবল মাত্র প্রাথমিক চেষ্টা করাই কার্য্য নহে, পরন্তু যদ্দ্বারা আমরা এই জীবনেই সাফল্যলাভ করিতে পারি সেই শাস্ত্রজ্ঞ গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্রানুশীলন করা একান্ত কর্তব্য। যে সকল মুক্ত পুরুষগণ ভগবানের পাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত শাস্ত্র-নির্দ্দেশকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন। *'শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে'*ই প্রকৃত পরমহংসাধিকার অবস্থা। শ্রীগীতায় বলা হইয়াছে,—



*'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।*
*অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥'*

*(গীঃ ৩/২৭)*

এই বিচারে জগতে যাহা কিছু কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে তাহা সমস্তই গুণময়ী প্রকৃতি দ্বারাই সম্পাদিত হয়। কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মাগণ নিজেকে কর্ত্তাব্যক্তি বলিয়া মনে করে। অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, করণ, প্রচেষ্টা এবং দৈব এই পাঁচটি কারণ সংযোগে যে কোন কার্য্য সিদ্ধিলাভ করে। উপরোক্ত পাঁচটি কারণের মধ্যে দৈবই সর্ব্ব প্রধান। এই দৈব শব্দে দৈবীমায়া ভগবচ্ছক্তিই বুঝিতে হইবে। সুতরাং শ্রীভগবানের ইঙ্গিতেই সেই প্রকৃতি বা দৈবীমায়া কার্য্য করিয়া থাকেন। *'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্'*—আমাদের নিজ স্বভাব অনুযায়ী এই দৈবীমায়া আমাদের সাহায্য করিয়া থাকেন মাত্র। সত্ত্ব রজঃ তমঃ স্বভাবে বহিরঙ্গাশক্তি সাহায্য করেন আর শুদ্ধ-সত্তায় (Transcendental existence) অন্তরঙ্গাশক্তি সাহায্য করেন। উভয় অবস্থাতেই জীবের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকভাবে সাহায্য করেন। অন্বয়ভাবে জীবের ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির বিবিধ সাহায্য পাইবার জন্য প্রস্তুত করিতে পারে মাত্র। জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য এই পর্য্যন্তই কার্য্যকরী হয়। সুতরাং যে মুহূর্ত্তে জীব নিজেকে ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট স্বরূপের বৃত্তি সেবা প্রার্থনা করিবেন, তখনই সে কর্ম্মবন্ধন বিমুক্ত হইয়া "জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস" এই মন্ত্রের সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইবে। কৃষ্ণদাস্য আর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দাস্য, এক বস্তু নহে। অতএব যে প্রভুত্ব করিবার জন্য আমরা সর্ব্বদাই লালায়িত তাহা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ প্রভুত্ব একমাত্র কৃষ্ণদাস্যেই নিহিত আছে। সেই প্রভুত্বে মায়ার বৈভব অষ্টসিদ্ধি যোগাদি সমূহের তুলনায় গোষ্পদ বলিয়া পরিগণিত। সেই প্রকার নিত্যসিদ্ধ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার

হইলেও একমাত্র শরণাগতির দ্বারা তাহা সম্ভবপর হয়। শরণাগতিরূপ ভগবৎ সম্বন্ধ জীবের নিত্যকালই আছে। তাহা কোন আরোপিত ব্যাপার নহে। কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত জাগরিত করাই বাস্তব যোগসিদ্ধি।

*নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সাধ্য কভু নয়।*
*শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥* (চৈঃ চঃ)

যথা ভগবদ্‌গীতায়—

*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।*
*ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥*

(গীঃ ১৮/৬১)

ভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্য চিচ্ছক্তি বলে সর্বহৃদয়েই অবস্থান করিতেছেন এবং ত্রিগুণময়ী মায়ার দ্বারা জীবকে দেহরূপ যন্ত্রারূঢ় করিয়া সর্বত্র ভ্রমণ করাইতেছেন। শ্রীভগবানে শরণাগত জীব স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া আর ত্রিগুণাত্মক কার্য্যে কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না। তিনি গুণাতীত অবস্থায় *'গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত এব'* বিচারে অবস্থিত হইয়া গুণকার্য্যগুলি নিরপেক্ষভাবে অবলোকন করেন মাত্র। প্রাথমিক অবস্থায় পূর্বাভ্যাসবশতঃ ভগবৎ সেবা অবস্থাতে পাপ-পুণ্যের ভয় দেখিয়া বিচলিত হইতে পারেন কিন্তু যেহেতু শরণাগতিরূপ সম্পূর্ণভাবেই ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ সম্ভব হইয়াছে, সেই হেতু ভগবানই সেই সকল পাপপুণ্যের নির্দ্দহন করিয়া দেন। যথা ভাগবতে—

*যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ*
*সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্॥*
*তেদুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং।*
*নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে॥*

(ভাঃ ২/৭/৪২)



সর্বপ্রকারে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে অনন্তস্বরূপ ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি দয়া করেন, তাঁহারাই এই দুস্তরা দৈবমায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। শৃগাল, কুকুর ভক্ষ্য এই প্রাকৃত শরীরে যাহাদের আমি ও আমার বুদ্ধি আছে তাহাদের ভগবান্ দয়া করেন না। এই বিষয়ে ভগবানের নিজবাক্য আরও অধিক আশাপ্রদ; যথা—গীতায় *"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি"* এই প্রকার তাঁহার অভয় বচন যে তাঁহার ভক্তের কোনদিনই নাশ নাই। শ্রীভগবানের কৃপাতেই ভগবানকে বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয় স্তর হইতে তৃতীয় স্তরে অধিরূঢ় হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে—

*অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়*
*প্রসাদ লেশানুগৃহীত এব হি।*
*জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো*
*ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বণ॥*

ভগবানের পদসেবক প্রসাদ লেশানুগৃহীতই ভগবানের মহিমা প্রকটিত ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। অন্য কেহ চিরকালই নিজ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। ভগবৎ শরণাগত পুরুষই যে কেবল ত্রিগুণাতীত অবস্থায় থাকেন তাহা নহে; তাঁহার নিকট প্রকৃতিও তখন ত্রিগুণাতীত হইয়া যায়। সত্ত্ব, রজ, তম গুণগুলি তখন বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত "কাম কৃষ্ণার্পণে দ্বেষ ভক্তদ্বেষীজনে," ইত্যাকার ত্রিগুণাতীত পরিচয়ে পরিচিত হয়।

যথা গীতায়—

*মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।*
*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥*

(গীঃ ১৪/২৬)

সত্ত্বগুণ তখন চিৎপ্রকাশ ও জ্যোতি বলিয়া পরিচিত হয়। তমোগুণ তখন শান্ত ও সমতায় পরিণত হয়, এবং রজোগুণ সম্ভূত কামনা তখন কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। ভগবৎ সম্বন্ধে কামনা তপস্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া ভগবৎ সেবার উৎসাহ ধৈর্য্য এবং তত্তৎ কর্ম্ম প্রবর্ত্তকরূপে প্রকাশিত হয়। শান্ত ভক্তিতে সেই প্রকার উৎসাহের অভাব দেখা না গেলেও তাহা ভগবৎ প্রেমাস্পদরূপে চিদানন্দময় হয়। অসীমের সেবাপরায়ণ কার্য্যগুলিও অসীমতত্ত্ব, সুতরাং তাহাও তপস্যার মধ্যে পরিগণিত। সেই প্রকার অপ্রাকৃত অবস্থিতিতে আমরা বুঝিতে পারিব যে এক অপরিমেয় ভগবৎ শক্তি যদিও তাহা আমাতে অবস্থিত নহে, তথাপিও তাহা আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অনুভব, সমস্ত দেহ, সমস্ত মন, সমস্ত জ্ঞান অধিকার করিয়া আমাকে চালিত করিতেছে; তাহাতে আমার ব্যক্তিগত কর্ম্মচেষ্টা প্রবিলীন হইয়া *'পদ্মপত্রমিবাম্ভসা'* ন্যায় হইয়া যাইবে। তখন অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বে আমার মন, আমার হৃদয়, আমার কার্য্য সকলই ভগবদভিন্ন হইয়া যাইবে। আমি তাঁহারই একজন অনুগত *'সনাথজীবিত'* ঐকান্তিক নিত্য কিঙ্কর, নিঃশেষ মনোরথ এবং প্রশান্তচেতা হইয়া ভগবৎসেবায় চিদানন্দ সর্ব্বদাই অনুভব করিব। ইহাই অপ্রাকৃত *"তচ্চিত্তভাব'*। সেই প্রকার পূর্ণ শরণাগতির উপদেশ গীতায় এইভাবে প্রাপ্ত হই।

*ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।*
*নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥*

*(গীঃ ৩/৩০)*

এই প্রকার মহান্ এবং সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থার জন্য কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অভ্যাসযুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

যথা—নিস্পৃহতা, নির্দ্বন্দ্বতা এবং নিরহঙ্কারিতা। এককথায় দ্বৈতাহঙ্কারবর্জ্জনত্ব। দ্বৈত অহঙ্কার ঐকান্তিক শরণাগতির বিপক্ষে



শত্রুবিশেষ। নির্দ্বন্দ্ব হইলেই স্বাভাবিকভাবে নিস্পৃহ হইয়া যায় এবং নির্দ্বন্দ্ব না হইলেই ইচ্ছাদ্বেষ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। ভগবানের শরণাগতি প্রসূত অবস্থায় ইচ্ছাদ্বেষ সমুত্থিত আসক্তি, বিরক্তি, ক্ষুধাতৃষ্ণা, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, হানি লাভ, পাপ পুণ্য, যুক্তি অযুক্তি, ন্যায় অন্যায়, মানা অপমান, সত্য মিথ্যা ইত্যাকার দ্বৈত জগতের সমস্ত বস্তুই ভগবৎ সম্বন্ধে চিদানন্দময় হইয়া যায়। ভারতবর্ষেই বিশেষ করিয়া এই প্রকার আনন্দময় সাধুগণের দর্শন হয় যাঁহারা উপরোক্ত ইচ্ছাদ্বেষ বিমুক্ত হইয়া বর্ত্তমান আছেন। ভগবদ্দর্শন এবং ভগবৎ সম্বন্ধ সম্যক্ উপলব্ধির ফলেই এই দ্বন্দ্ব-মোহ নির্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্তি হয়। হরি সম্বন্ধীয় বস্তুজ্ঞানই এই অবস্থার প্রধান উপায়।

ভগবদ্ভক্তের এই বস্তুজ্ঞান এবং বস্তু সম্বন্ধ সহজভাবে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষিগণের এই অবস্থা সম্ভবপর নহে। ভগবৎ সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তগণ সমস্ত বস্তু, সমস্ত ঘটনা ভগবৎ-প্রেরিত চিন্ময় দর্শন করেন, সুতরাং তাঁহার *মানাপমান, সুখ দুঃখ, নিন্দাস্তুতি* প্রভৃতি সমস্তই উদাসীনবৎ তুল্যার্থ নিরপেক্ষ দর্শনযোগ্য হয়। ভগবৎ সেবার অনুকূল সঙ্কল্প বা শরণাগতির চরম ফলই এই প্রকার অধিকারে অবস্থান। পরাভক্তির (Super Consciousness) কনিষ্ঠাধিকার এই প্রকার। যথা গীতায়—

*ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি ।*
*সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥*

অহং মম বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বস্তু দর্শন হইলেই আমাদের জীবনে দ্বন্দ্ব মোহরূপ অজ্ঞানশৃঙ্খল বন্ধন হয়। সেই প্রকার অহঙ্কারযুক্ত জীবন হইতেই মুক্তি লাভ করিতে হইলে যে সকল সাধনা আরম্ভ হয় সেই সমস্ত সাধন-পদ্ধতি সত্ত্বরজস্তমঃ প্রভৃতি ত্রিগুণাতীত না হইলে ভগবৎ সেবাবস্থা (Super Consciousness) লাভ হয়

না। নির্ম্মল সত্ত্বগুণের দ্বারা অনাময়-জ্ঞান প্রকাশ হইলে চিদচিৎ বিজ্ঞানজনিত সুখাসুখদ্বারা জীব বদ্ধ হইয়া যায়। রাগাত্মিকা রজোগুণ দ্বারা জগতের ভোগতৃষ্ণা প্রবৃদ্ধি হইলে কর্ম্মিসম্প্রদায়ের সহিত জীব কর্ম্মী হইয়া বদ্ধ হইয়া যায়। মোহাত্মক তমোগুণ দ্বারা অজ্ঞানাচ্ছাদিত হইলে ভ্রমপ্রমাদ আলস্য নিদ্রা প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হইয়া জীব অত্যন্ত নিম্নস্তরে আবদ্ধ হইয়া যায়। সামান্যতঃ সত্ত্বগুণদ্বারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া জীব যথাযথ বদ্ধ হইয়া যায়। রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে সত্ত্বতমঃ ক্ষীণ হইয়া যায়। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে রজস্তমঃ ক্ষীণ হইয়া যায়। এইভাবে বিবিধ গুণগুলি কখনও প্রবৃদ্ধি লাভ করে আবার কখনও ক্ষীণ হইয়া যায়। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে শরীর হইতে সর্ব্বপ্রকারেই নির্ম্মল জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায়। রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে দুর্দ্দমনীয় কর্ম্মস্পৃহা, লোভ এবং কর্ম্ম-প্রবৃত্তি দেখা যায়। আর তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে অজ্ঞান আলস্য প্রমাদ নিদ্রার আধিক্য প্রকাশিত হয়। সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উর্দ্ধগতি লাভ করেন, রজোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মাঝামাঝি থাকেন, কিন্তু জঘন্যগুণ বিশিষ্ট তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ ক্রমেই অধোগতি লাভ করে।

অতএব গুণগত সাধন-পদ্ধতিতে নিজগুণগত অহঙ্কারজনিত সত্ত্বরজস্তমগুণ তাড়িত হইলে নির্গুণ অবস্থায় যাইবার বহু বিপদ আছে। গুণাতীত না হইতে পারিলে সাধক নিজেকে সত্ত্বরজস্তম তাড়িত হইয়া ভুলক্রমে নিজকৃত (*গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ*) গুণসাম্য কর্ম্মগুলিই ভগবানের অনুপ্রণোদিত কার্য্য বলিয়া জগতে ঘোষণা করিবে। নিজেকে বড় ভক্ত অভিমান করিয়া অন্যকে হীন জ্ঞান করিবে। নিজ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া ভগবান কর্ত্তৃক নিজে দৃষ্ট না হইয়া ভগবানকে দেখিবার জন্য মনোরথ দ্বারা চালিত হইবে। বৃথা অভিমানে রজোগুণ দ্বারা চালিত কার্য্যগুলি ভগবদ্ চালিত কার্য্য বলিয়া ভুল করিবে। কেবলমাত্র জ্ঞান গরিমার দ্বারা, আরোহ পন্থার দ্বারা ভগবৎ কৃপা লাভ করিবার যাহাদের



চেষ্টা, তাহারাই ভগবানের কৃপাবতরণের জন্য সম্যক্ শরণাগত না হইয়া এই প্রকার দুর্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া থাকেন। *অবিস্মৃতি কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষীণোতি অভদ্রানি চাশং তনোতি* এই প্রকার বিচার দ্বারা অর্থাৎ সর্ব্বদাই ভগবদ্ স্মৃতি দ্বারা অনুক্ষণ তত্তৎ স্পৃহাদ্বারা ভগবৎ কৃপা সর্ব্বদা যাচ্ঞা করিলে হৃদয়স্থিত ভগবান্ তাঁহার নিজ কৃপারূপ জ্ঞানদীপ ভাণ্ডের দ্বারা সাধকের সমস্ত অসুবিধা ও অজ্ঞান দূর করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—

*তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা ।*
*অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি ॥*

অনেক সময় এই তৃণাদপি শ্লোকের ত্রিগুণাতীত্ব বুঝিতে না পারিয়া তমোগুণ বিতাড়িত কৃত্রিম সুনীচত্বভাব দেখাইবার জন্য নিজেকে দুর্ব্বল, দীনহীন, কাঙ্গাল প্রভৃতির অভিনয় করিয়া যে একটা আঁকু পাঁকু ভাব দেখান হয়, তাহা কখনই অভিপ্রেত হইতে পারে না। বেদবাণীর *অহং ব্রহ্মাস্মি* এই প্রকার চেতনের অহঙ্কারই তৃণাদপি সুনীচত্বের অন্যতম অর্থ। চিদচিৎ যে এক নহে তাহাই এই শিক্ষার আদর্শ। আমরা ভগবদ্ভক্তিদ্বারা প্রভাবিত হইলে আমাদের যে স্বরূপের অহঙ্কার তাহাই আমাদের ভগবদুপলব্ধি করাইতে পারে। অজ্ঞানী কর্ম্মী সঙ্গীদের বুদ্ধি ভেদ না করিয়া লোক সংগ্রহের জন্য যে ভগবদ্ ভক্তের অপ্রাকৃত চেষ্টাসমূহ দেখা যায়, তাহা কখনই কর্ম্মী জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষিগণের প্রাকৃত চেষ্টার সাম্য নহে। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, *উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাংকর্ম্ম চেদহম্* অর্থাৎ আমি নিজে কর্ম্ম না করিলে সমস্ত জগৎকে উৎসন্ন দিব। সুতরাং ভগবৎ প্রণোদিত অপ্রাকৃত চেষ্টায় যাহাদের উদ্যম নাই তাহারা রজস্তম প্রণোদিত নিষ্ক্রিয় পর্য্যায়ভুক্ত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? সত্ত্বরজস্তমো ত্রিগুণাতীত অবস্থায় কিভাবে কি প্রকারে আচরণ ও লক্ষণ দেখা যায়,

সে সম্বন্ধে অর্জ্জুন মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তৎ তৎ লক্ষণসমূহের বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার মূল তাৎপর্য্য নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা স্পষ্ট বুঝাইয়া ছিলেন, যথা—

*মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।*
*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥*
*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।*
*শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥*

(*গীঃ* ১৪/২৬-২৭)

যিনি অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবানের নিত্যসেবা বিধান করেন, তিনি ত্রিগুণকে সম্যকভাবে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভগবানের অঙ্গজ্যোতিরূপে ভগবানেই প্রতিষ্ঠিত। ভগবানই সেই পরাৎপর অমৃত শাশ্বত ঐকান্তিক সুখ ও ধর্ম্মের একমাত্র অধিষ্ঠান।

ভক্তিযোগ পন্থা নিম্নলিখিত তিন প্রকারে অভিব্যক্তি দেখা যায়, যথা—

(১) শরণাগতির প্রথম সোপান অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প, (২) আত্মজ্ঞানদ্বারা ভগবদ্‌সেবকরূপে ভগবৎ সেবা সম্পাদন, (৩) উচ্চাধিকারে সর্ব্বত্রই ভগবদ্ দর্শন এবং ভগবানেই সকল বস্তু দর্শন। এইভাবে পূর্ণ শরণাগতি দ্বারা আত্মনিক্ষেপরূপ ভগবদ্বিশ্বাস পরিবর্দ্ধনকরণ।

ভগবদনুশীলনের অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প হইলে ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি নিজ চিচ্ছক্তি বলে সমস্ত সাধনই পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন। আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে ভগবানের অনুস্মৃতি এবং ভগবানের অনুমতি। আমরা ব্রহ্মে উপশমাশ্রিত গুরুদেবের নিকট যে আদেশ প্রাপ্ত হই তাহাই ভগবানের শ্রবণ কীর্ত্তনাদ্য স্মরণ পদ্ধতি অবলম্বন



করেন তাহাই ভগবানের অনুস্মৃতি। এই প্রকার অনুমতি ও অনুস্মৃতিদ্বারা চালিত হইলে আমরা ভগবৎসেবা কার্য্যে কখনই বিপথগামী হইব না, মায়াকল্পিত বিভীষিকায় ভীত হইব না, ভগবৎকর্ম্মে বিচলিত হইব না, পরন্তু আমরা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা গুরোপদিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্যে নির্ভীক হৃদয়ে আগুয়ান হইব। বিধিমার্গে যে শরণাগতি হয় তাহা ব্যতিরেকভাব, কিন্তু রাগমার্গে যে শরণাগতি হয় তাহাই স্বরূপভাব, অন্বয়ভাবে শরণাগতি হইলে ভগবদ্ অনুমতি পালনে উৎসাহ ধৈর্য্য এবং তৎতৎ কর্ম্ম প্রবর্ত্তন সৎবৃত্তি এবং সাধুসঙ্গ দ্বারা উত্তরোত্তর সেবা সৌকর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ধৈর্য ও উৎসাহের দ্বারা স্বতঃপ্রণোদিত নিরন্তর ভগবৎ স্মরণ হয়।

স্মৃতি বিভ্রমদ্বারা যোগভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু ভক্তযোগীর সে ভয় নাই। শরণাগত ভক্তযোগীকে ভগবান্ সর্ব্বদাই রক্ষা করেন। ভক্তযোগী স্খলিত হইলে আবার ভগবদ্ বলেই উঠিতে পারিবে। অবিস্মৃতি জন্য ভগবদ্ভক্তের সমস্ত অসুবিধা নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং শরণাগতিই বাস্তব যোগসিদ্ধি এবং তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও নিরঙ্কুশ পথ।

'সনৎ সুজাতীয়' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে যোগসিদ্ধির জন্য চারিটি বস্তুর প্রয়োজন, যথা—(১) শাস্ত্র, (২) উৎসাহ, (৩) গুরু এবং (৪) কাল। তিনি যে শরণাগতির পথ দেখাইলেন তাহাই শাস্ত্রসিদ্ধ। উৎসাহ শব্দে অনুমতি ও অনুস্মৃতি বুঝিতে হইবে। শরণাগতের চৈত্যগুরু ভগবান্ স্বয়ং অত্যন্ত প্রিয় দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। '*যুদ্ধস্ব মামনুস্মর*'। ভগবানই আমাদের চৈত্যগুরুরূপে সহায় হইয়া বুদ্ধিযোগ দান করেন যদ্দ্বারা আমরা তাঁহাকে বুঝিতে পারি। মনীষিগণ বলেন যে, "এই প্রকার শরণাগতির দ্বারা তোমরা নিজে নিজেই বুঝিতে পারিবে যে, ভগবান্ স্বয়ং তোমাদের জন্য কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও কত বৃহৎ পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন।" এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, একটি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমত্তা এবং প্রেমাস্পদ আমারই সাহায্যে নিযুক্ত

আছেন। অতএব অব্যর্থ কালের জন্য চিন্তা করিবার কিছুই নাই। আমরা অপ্রমত্ত, ধীর এবং উৎসাহসম্পন্ন হইয়া যোগ সাধনা করিব। কালের উপযোগিতা যথেষ্ট আছে। আমার এই জাতীয় সত্তাকে ক্রমশঃ চিন্ময় সত্তাতে পরিণত করিবার জন্য এক বৃহৎ শক্তি নিয়োজিত আছে। আমাদের কোটি কোটি পূর্ব্বজন্মের সংস্কারমাত্র কিছুকালেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। সুতরাং কালের জন্য বিক্ষিপ্ত হইব না। প্রাণায়াম ধ্যান-ধারণা আসনাদি দ্বারা যে যোগসিদ্ধি হয় তদ্দ্বারা শীঘ্রই ফল লাভ হয় বটে এবং মনে হয় আমরা কিছু না কিছু করিতেছি, কিন্তু সেই প্রকার মনুষ্য চেষ্টার দ্বারা জড় সিদ্ধি তৎপরতা আসিলেও তাহা মনুষ্য-চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা ভগবৎ-শক্তির কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভগবচ্ছক্তি অনেক সময় সূক্ষ্মভাবে কার্য্য করিলেও তাহা পরিশেষে এমন জায়গায় আনয়ন করে যাহা মনুষ্য শক্তির অচিন্ত্য। প্রাকৃত পন্থাগুলি বুদ্ধিমান মনুষ্য নির্ম্মিত প্রণালী, খাল প্রভৃতির ন্যায় এবং সেই সকল প্রণালীতে হয় ত' সহজেই যাতায়াত করিতে পারি কিন্তু তাহা সীমাবদ্ধ, একস্থান হইতে অন্যস্থানে গতাগতির সুবিধামাত্র। '*আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।*'' ভগবচ্ছক্তির যে পথ তাহা আপূর্য্যমাণ অচল প্রতিষ্ঠ সমুদ্র বিশেষ। তাহা আদি ও অন্তহীন এবং তাহাতে আমরা যে কোন স্থান হইতে যে কোন স্থানে যাইতে পারি। মহাসমুদ্রে বিচরণ করিতে হইলে যে কয়েকটি বস্তুর বিশেষ প্রয়োজন তাহা এইরূপ, যথা—একটি অর্ণবযান, একজন কর্ণধার, অর্ণবযানচক্র এবং তাহা চালাইবার অনুকূল বায়ু। কিন্তু আমাদের জানা আবশ্যক যে এই সুকল্প নরদেহই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত অর্ণবযান। শ্রীগুরুদেবই উপযুক্ত কর্ণধার, শাস্ত্রই উত্তম চক্র এবং শ্রীভগবানের কৃপাই অনুকূল বায়ু। এরূপ অবস্থাতেও আমরা যদি এই ভবসমুদ্র পারাপার না হই তাহা হইলে আমরা আত্মঘাতী ব্যতীত আর কি হইতে পারি? শ্রীভগবানের



কৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দিকে আমাদের সর্ব্বদাই চাহিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতিতে আমাদের কিছুই বলিবার নাই এবং তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় অভিন্ন ভগবদ্-বিগ্রহ করুণাবতারই শ্রীগুরুদেব। '*তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*' এই উপনিষদবাণী অবলম্বন করিয়া আমাদের আদৌ গুরু পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সাধুগুরু এবং শাস্ত্রবাক্য এক তাৎপর্য্যপর। যিনি সাধু তিনিই গুরু, কারণ সাধু ও গুরু শাস্ত্রনিষিদ্ধ কোন কার্য্যই করেন না। শাস্ত্রই তাঁহাদের চক্ষু। সুতরাং সাধু গুরু শাস্ত্রকে বাদ দিয়া কোন সাধনই সম্ভাব্য নহে। ইউরোপীয় পাশ্চাত্য দেশসমূহের চিন্তাধারার বশবর্ত্তী হইয়া সাধু গুরু শাস্ত্রবাক্যের অবহেলা করা কোন মতেই উচিত নহে। ইউরোপীয়গণ অক্ষজ চিন্তাধারাকেই উচ্চস্থান প্রদান করেন এবং নিজ নিজ স্বকপোল কল্পিত মনোধর্ম্ম দ্বারা চালিত হওয়াকেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মনে করেন। তর্কই তাঁহাদের প্রধানতম অস্ত্র, যদিও অধিক স্থলে তর্কযুক্তি কিভাবে করিতে হয় তাহাও তাঁহাদের অজানা থাকে। অধুনা একপ্রকার 'ফ্যাশন'বাদ আরম্ভ হইয়াছে যে, কোন বিষয় তলাইয়া না বুঝিয়াও পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অনুভূতির তত্ত্ব বিষয়গুলি লইয়া বৃথা বিতণ্ডা করা। যাহারা এইরূপ তার্কিক তাহারা জানে—তার্কিক অন্য বড় তার্কিকের নিকট হারিয়া যায়। বড় হইতে বড় সর্ব্ব বিষয়েই আছে। সুতরাং সেই প্রকার তর্কদ্বারা বস্তু লাভ হয় না। কেবল তর্ক করিয়া 'ফ্যাশনবাদের' অনুগত মায়াবাদ অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়া বাহাদুরী করা আর আন্তরিক অপ্রাকৃত অনুভূতির জ্ঞান লাভ করা অনেক তফাৎ। যে সমস্ত বিষয় অচিন্ত্য বিজ্ঞানের অনুভূতিগম্য সেই সকল বিষয় তর্কের ফ্যাশনবাদে জানিবার চেষ্টা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার কি অর্থ আছে? *অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তং তর্কেণ যোজয়েৎ*। ভগবদ্ কৃপা না হইলে সেই সকল অচিন্ত্য বিষয় চিরকাল বিচার করিয়াও জানিবার, উপায় নাই। প্রত্যক্ষের পর

পরোক্ষ বা অপরোক্ষ বিষয়ের আলোচনা করিবার আবশ্যক আছে, কিন্তু তাহা অধোক্ষজ এবং অপ্রাকৃত অনুভূতির কিঙ্করীরূপে কার্য্যকরী হয়। সে বিষয়ে লক্ষ্য না থাকিয়া কেবলমাত্র পরোক্ষ বিষয় চিন্তা করা শুষ্কজ্ঞানীর স্থূল তুষাবঘাত মাত্র। যেমন স্থূল তুষাবঘাতের দ্বারা তণ্ডুল লাভ হয় না, কেবলমাত্র ক্লেশই লাভ হয়, সেই প্রকার অধোক্ষজ অপ্রাকৃত অনুভূতিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ পরোক্ষ বা অপরোক্ষ আলোচনায় ব্যস্ত থাকায় কেবল বৃথা ক্লেশ লাভ হয়। এই সকল শুষ্ক আলোচনার দ্বারা জড় পাণ্ডিত্যের অভিনয় ভাল হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা পারমার্থিক কোন সাহায্যই লাভ হয় না; বরং সময়ে সেই সকল শুষ্ক আলোচনাগুলি ভীষণ বাধারই সৃষ্টি করে। সেই প্রকার শুষ্ক তর্কপন্থা অবলম্বন না করিয়া, সাধুশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া বৃথা সন্দেহ বা প্রশ্ন না করাই বিধেয়। *তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া*। প্রণিপাত ও সেবাকে আশ্রয় করিয়া যে পরিপ্রশ্ন হয় তদ্দ্বারাই সেই সকল অচিন্ত্য বিষয় জানা যায়। ইহাই শ্রৌত পন্থা—বেদানুগ পথ। সেই পথাবলম্বনে যাহা আমাদের অনুভূতির মধ্যে অবতরণ করে, তাহাই অবলম্বন করিয়া আরও অগ্রগামী হওয়া আবশ্যক। পরে পরে আমরা যে আলোক দেখিতে পাই তজ্জন্য ধীর ও স্থিরভাবে অপেক্ষা করা আবশ্যক। যে সমস্ত অপ্রাকৃত বিষয় আমাদের অনুভূতির মধ্যে আসে তজ্জন্য আমাদের গর্ব্বানুভব করা উচিত নহে, বরং উত্তরোত্তর সাধুগুরুর নিকট উত্তরোত্তর বিষয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকা ভাল। মনকে সংকীর্ণ করিয়া আর কিছু জানিবার নাই এরূপ সিদ্ধান্ত করা কদাচিৎ কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, আমার চৈত্যগুরুর কৃপার উপর সর্ব্বদাই নির্ভর করা একান্ত আবশ্যক।

আজকাল মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ নামক দুইটি শব্দ গগন ভেদ করিয়া শব্দিত হইতে শুনা যায়। সুতরাং সে বিষয়ে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ যুক্তি ব্রাহ্মণ



মূর্ত্তিতে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় অব্রাহ্মণোচিত যুক্তিবাদ এবং জড়বাদকে আশ্রয় করিয়া আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদের যে দুর্দ্দশা করা হইয়াছে তাহা দেখিলে স্বয়ং শঙ্করাচার্যিই স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ব্রাহ্মণোচিত আচরণ এবং জড়বাদকে ধ্বংস করিবার অকাট্য যুক্তি সমূহ অপিচ তাঁহার জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আদর্শকে কাটছাঁট করিয়া লোকে যখন জড়বাদকেই আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করে তখন আমরা এককালে হাসি ও কাঁদি। ভগবান্ যে-ভাবে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র ন্যায়ের ফাঁকি দিয়া বুঝিবার উপায় নাই। আসুরিক চিন্তার ধারাই *'অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্'* সুতরাং তদ্দ্বারা বিশেষ লাভের সম্ভাবনা নাই। যে মস্তিষ্ক হইতে এই প্রকার শুষ্ক ন্যায়ের আবির্ভাব হয় তাহাও ভগবানের সৃষ্টির একটি নগণ্য দৃষ্টান্ত মাত্র। সেই প্রকার নগণ্য মস্তিষ্কের চালনা করিয়া সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের কার্য্য কৌশল বুঝা বামনের চন্দ্র স্পর্শরূপ বাতুলতা মাত্র। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তৎকালীন অবস্থা বিচারে মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদকেই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাই সর্ব্বশেষ কথা নহে। তারপরের কথাও আছে। তাহা শঙ্করাচার্য্য *'ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে'* বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দ ভজন অর্থেই শ্রীভগবানের নামরূপলীলা পরিকরবৈশিষ্ট্য কথাই বুঝা যায়। এই অপ্রাকৃত লীলাভূমি মায়াবাদ উদ্দিষ্ট প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক গুরুতর। শ্রীমথুরা বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি সর্ব্বোচ্চক।

ভগবান্ একতত্ত্ব হইলেও তাঁহার প্রাভব বৈভব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের, সমস্ত শক্তির, সমস্ত শ্রীর, সমস্ত জ্ঞানের, সমস্ত যশের এবং সমস্ত বৈরাগ্যের পরিচয় শ্রীঅনন্তদেব অনন্তকাল বর্ণনা করিয়াও অনন্ত মুখে শেষ করিতে পারে নাই। সুতরাং তিনি অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত বলিয়াই চির পরিচিত।

উপনিষদ তাঁহাকে *একমেবাদ্বিতীয়ম্* বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও যেমন প্রতিপাদ্য বিষয়, সেই প্রকার গীতোপনিষদে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, তিনি অশ্বত্থ, তিনিই অগ্নি, তিনিই ব্যাস, তিনিই বাসুদেব, তিনিই অর্জ্জুন ইত্যাকার তাহাও প্রতিপাদ্য বিষয়। পূর্ণ চেতনের পূর্ণ লীলা বুঝিবার জন্য সন্দেহবাদ, যুক্তিবাদ, জড়বাদ, মায়াবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, পুণ্যবাদ ইত্যাকার কোন বাদ দ্বারাই সম্ভব হইবে না। ভগবৎ কৃপাই ভগবানকে বুঝিবার একমাত্র উপায়। সেই ভগবানই স্বয়ং কৃপা করিয়া তাঁহার নিজতত্ত্ব সমস্ত বেদ-বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারাংশ শ্রীগীতোপদেশ করিয়াছেন। তাহাই সমস্ত বাদের এবং বিরুদ্ধবাদের সমন্বয়। শ্রীচৈতন্যদেব গীতোপদিষ্ট শেষ কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাগতি সিদ্ধান্তের স্বাভাবিক প্রচারক এবং তাঁহারই পদাঙ্কানুসারিগণ সেই শরণাগতি যোগের বাস্তবযোগী। ভগবানের অনন্ত লীলা সমস্তই নিত্য এবং শাশ্বত। সেই নিত্য লীলাময়ে যাহার বিশ্বাস নাই সে-ই মায়াবাদী। সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে যখন আমার খণ্ডমাপকাঠিতে মাপিয়া লইবার চেষ্টা হয়, তখনই মায়াবাদের উৎপত্তি হয়। সেই প্রকার সর্বনাশী মায়াবাদের হস্ত হইতে আমাদের পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। শ্রীনারদ মুনি যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে একই মূর্ত্তিতে বহু গোপীর সহিত দেখিয়াছিলেন, তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র রাধারাণী সেবিত বিগ্রহ হইয়াও সর্ব্বত্রই নিজেকে প্রকট করিতে পারেন। এক প্রদীপ যেমন শত শত প্রদীপ প্রজ্বলিত করিবার পরও পূর্ণই থাকে সেই প্রকার ভগবান্ *'একমেবাদ্বিতীয়ম্'* হইয়াও তিনি অখিলাত্মভূত হইয়া বিরাজ করিতে পারেন, তাহাই ভগবানের ভগবত্তা। তিনি সকলের সহিত এক না হইয়াও এক, আবার এক হইয়াও এক নহেন। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্যভেদাভেদ যোগৈশ্বর্য্য। ভগবানের এই অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে



সাধুগুরুর মুখে শ্রবণ না করিয়া তিনি সবিশেষ তত্ত্ব না নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয়ই। অর্দ্ধকুক্কুটি ন্যায়ানুসারে একটিকে বাদ দিয়া অপরটি গ্রহণ করিলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়। এই সহজ কথাটি যাঁহারা গুরু ও কৃষ্ণকৃপায় বুঝিতে পারেন তাঁহারা আর বৃথা তর্ক করিয়া জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করেন না। ভগবানের শরণাগতির দ্বারা বা তাঁহারই কৃপালেশ মাত্র সম্বল দ্বারা তাঁহার মহিমা কিছু কিছু অবগত হওয়া যায়। মনুষ্য চেষ্টাদ্বারা চিরকাল বিচার করিলেও তাঁহার তত্ত্ব বুঝিবার উপায় নাই। আমাদের সেবোন্মুখবৃত্তি বা শরণাগতির দ্বারাই তিনি স্বয়ং প্রকটিত হন। তর্ক ও যুক্তি দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব জানিবার উপায় নাই।

আমাদের লক্ষ্য বস্তু কেবল তর্ক করিবার জন্য নহে। সেই পরাৎপর বস্তুকে উপলব্ধি করাই আমাদের জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। শ্রীভগবানের অদ্বয়জ্ঞান সত্তায় একীভূত হইয়া তাঁহারই নাম রূপ লীলা গুণ পরিকর বৈশিষ্ট্যের সেবা করিয়া, তাঁহারই সত্তায় বাস করিয়া তাঁহারই যন্ত্রের মত তাঁহার লীলা পরিপুষ্ট করাই আমাদের বুদ্ধিযোগ বা বাস্তবযোগসিদ্ধি। তাঁহারই চিচ্ছক্তিবলে বলীয়ান হইয়া তাঁহার চিদ্বিলাসের কথা প্রচার করাই আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। সেই প্রকার চেতনাময় প্রচার দ্বারাই আমাদের চতুর্দ্দিকে শত সহস্র জীব চিদানন্দ আস্বাদন করিতে পারিবে। মঠ-মন্দির, গির্জ্জা, মস্‌জিদ্, কর্ম্ম জ্ঞানযোগ এবং শুষ্ক দার্শনিক বিচার অথবা প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের মিছাভক্তির ছলনা এই সমস্তই মনুষ্যজাতিকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছে; কারণ এই সকল ব্যাপার কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক আচার ও ব্যবহার, চিত্তশুদ্ধির উপায় এবং শুষ্কদর্শন লইয়াই মনুষ্যকে ব্যস্ত করিয়াছে। আত্মমঙ্গলের আচরণ ও প্রচার সুষ্ঠুভাবে হয় নাই। তাই আমাদের এখন কর্ত্তব্য হইয়াছে যে, সকল প্রচারকের

সারাংশগুলি একত্রিত করিয়া যথা—যীশুখৃষ্টের আত্মশোধনের কথা, মহম্মদের শরণাগতির কথা, শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবৎপ্রেমের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের কথা—এই সমস্তকেই একটি বিরাট স্রোতস্বিনী নদীতে পরিণত করিয়া, ভগীরথ যেমন গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়া নিজ বংশকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইপ্রকার ভগবৎ প্রেমবন্যারূপ এক গঙ্গাকে প্রবাহিত করাইয়া মুহ্যমান মনুষ্যকে জড়বাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আবার সত্যযুগকে ফিরাইয়া আনা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ ভগবৎ প্রেমবন্যা আনয়ন করিলেই এই মহান কার্য্য সহজেই সম্পাদিত হইবে। কলিহত মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর জীবগণকে ভগবৎপ্রেমরূপ বন্যায় ভাসাইতে হইবে। বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ পড়িয়া যে চিত্তশুদ্ধিশরণাগতি এবং চিৎ সম্বন্ধের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা কলিহত জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য কার্য্য। কলিকালে জীবগণ প্রায়ই মন্দভাগ্য, মন্দমতি, মন্দস্বভাব, অল্পায়ুবিশিষ্ট এবং সর্ব্বোপরি রোগশোক চিন্তাধারা সর্ব্বদাই উপদ্রুত। এই প্রকার বহু দোষদুষ্ট ব্যক্তিগণ কেহই বেদ-বেদান্ত পড়িবে না। তাহাদের নিকট বেদান্ত প্রচার অর্থেই কিছু সময় নষ্ট। শ্রীচৈতন্যদেব এই প্রকার কলিহত জীবকেই পরিত্রাণ করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্বাশ্রমে 'নিমাই পণ্ডিত' মহানৈয়ায়িক বলিয়া খ্যাত হইয়াও কলিহত জীবের পক্ষপাতিত্ব করিয়া তিনি নিজেকে মূর্খ বিচার করিয়াছিলেন। এই প্রকার লীলা একমাত্র ভগবানেই সম্ভবপর হয়। কাশীতে প্রসিদ্ধ মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

*"সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।*
*ভাবুকসব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন॥*
*বেদান্ত পঠন, ধ্যান সন্ন্যাসীর কর্ম্ম।*



*তাহা ছাড়ি কর কেনে ভাবুকের কর্ম্ম॥*
*প্রভাবে দেখিয়া তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।*
*হীনাচার কর কেনে ইথে কি কারণ?" ॥*

সন্ন্যাসী বেদান্ত পাঠ করিয়া নিজের মোক্ষ সাধন করিবে, এই প্রকার ক্ষুদ্র স্বার্থমূলক উপকার করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের অবতরণ নহে। তাঁহার ভগবদ্ভক্তিযোগ এবং সংকীর্ত্তন লীলা প্রচারের প্রধানতম উদ্দেশ্য যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করা এবং তদ্দ্বারা সমস্ত জীবকে পরিত্রাণ করা। তিনি সাধারণ জীবের পক্ষ হইতে প্রকাশানন্দকে উত্তর দিয়াছিলেন। —

*প্রভু কহে,— "শুন, শ্রীপাদ ইহার কারণ।*
*গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন॥*
*মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।*
*কৃষ্ণমন্ত্র জপ' সদা, এই মন্ত্র সার॥*
*কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।*
*কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥*
*নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।*
*সর্ব্বমন্ত্রসার নাম, —এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥*
*এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।*
*কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে॥*
*হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।*
*কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥*

এই কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচারের দ্বারাই চেতোদর্পণ মার্জ্জিত হইয়া যাইবে। ভবমহাদাবাগ্নি অর্থাৎ জড়সভ্যতার যে তীব্র কষাঘাত মনুষ্যজাতির উপর পড়িতেছে তাহা এবং অশান্তিরূপ দাবাগ্নি যাহা প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা সবই মুহূর্ত্তেই নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। সেই প্রকার মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়াই কৃষ্ণকীর্ত্তনের শেষ ফল নহে। তাহা আনুষঙ্গিক

ভাবেই হইয়া যায়। তাহার পর মনুষ্যজন্মের পরমশ্রেয়ঃ ভগবৎ প্রেম লাভ করা আবশ্যক তাহা ক্রমশঃ কিরণ বিকাশ করিবে এবং জীবের সকল অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া পরাবিদ্যার সন্ধান পাওয়া যাইবে। সেই প্রকার পরাবিদ্যার অনুভূতির দ্বারাই আনন্দ-সমুদ্রের বৃদ্ধি হইবে এবং প্রতি পদেই পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন পাইবে। সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলকারী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক! যাঁহারা ক্ষুদ্র স্বার্থ অন্বেষণ করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধির জন্য যোগসাধনায় বসিয়াছেন, তাঁহারা অনেক বড়। যাঁহারা নিজ স্বার্থের জন্য যোগসাধনায় ব্যস্ত তাঁহাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করিলেও ক্ষুদ্র পর্য্যায়ে থাকিবে। কিন্তু যাঁহারা সকলের মঙ্গলের জন্য যোগসাধনায় বসিয়াছেন, তাঁহাদের যোগসাধনা পূর্ণ না হইলেও তাঁহাদের সাধনা অনেক উচ্চাঙ্গের। ভগবদ্ভক্তগণের যোগসাধনা যাহা, তাহাই বুদ্ধিযোগ; জগন্মঙ্গলের উদ্দেশ্যে এবং যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করাই বুদ্ধিযোগ, বা বাস্তবযোগ। —এই প্রকার যোগসিদ্ধির বা অসিদ্ধির ফলাফল আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

*ত্যক্ত্বাস্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-*
*র্ভজন্নপকোহথ পতেত্ততো যদি ।*
*যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং*
*কো ব্যর্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্মতঃ ॥*

(ভাঃ ১/৫/১৭)

---

# গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯২২ সালে কলিকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘের) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজে হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ' তাঁকে "ভক্তিবেদান্ত" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য ও তাৎপর্যসহ আঠার হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং 'অন্য লোকে সুগম যাত্রা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম

করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হল তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্যসহ ইংরাজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পনের শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচার-সূচির পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য